শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

তৃতীয় ভাগ

36
3/283
...shram
BANARAS

লীলা-কথা

[পূর্ব্বার্দ্ধ]

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

তৃতীয় ভাগ

লীলা-কথা

[পূর্ব্বার্দ্ধ]

Y 3/283
... Ashram
৭।১১

বেনারস গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম, এ,

প্রণীত

প্রকাশক ঃ—

শ্রীদুর্গাকান্ত রায়, বি, এ, বি, এল,

পেন্সন প্রাপ্ত সব-জজ ;

'বিশুদ্ধানন্দ-কানন'—মালদহিয়া,

৺কাশীধাম।

সন ১৩৩৭ সাল।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত] * [মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়,—
বিশুদ্ধাশ্রম—বর্দ্ধমান।

২। শ্রীগণপতিলাল ঝা, এম, এ,—
বিশুদ্ধানন্দ-কানন—বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।

৩। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ,—
১৫।১, এলগিন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৪। রায়-সাহেব শ্রীননীলাল মুখোপাধ্যায়,—
১, লভলক্ ষ্ট্রীট্, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু,—
৭, কুণ্ডুরোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৬। শ্রীসত্যগোপাল দত্ত,—
২, আনন্দ চাটার্জ্জি লেন, অমৃতবাজার-পত্রিকা-আফিস, বাগবাজার, কলিকাতা।

৭। শ্রীকেদার নাথ ভৌমিক,—
১৩২।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৮। শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—
৬, নীলাম্বর মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীট্, শ্যাম বাজার, কলিকাতা।

কাপি-রাইট—শ্রীশ্রীমদ্‌বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব
বিশুদ্ধানন্দ-কানন—বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।

প্রিণ্টার :—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, বেনারস-ব্রাঞ্চ।

LIBRARY 3/283
Ashram
BANARAS

নিবেদন

এই খণ্ডে যাঁহাদের স্বলিখিত কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বাবাজীর শিষ্য। একমাত্র শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিষ্য নহেন। গ্রন্থমধ্যে মুদ্রাকর প্রমাদ ও অন্যান্য অশুদ্ধি যাহা দৃষ্টিপথে পতিত হইল এখানে পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করিয়া দিলাম—আশা করি, পাঠকগণ সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র দাদার বর্ণনা মধ্যে কয়েকটি কথা স্মৃতিভ্রম বশতঃ অশুদ্ধরূপে বিবৃত হইয়াছে—এখানে তাহার উল্লেখ আবশ্যক মনে হইতেছে। ২৩ পৃষ্ঠায় আছে যে, আউসগ্রামের বৈদ্যনাথ গোস্বামী মহাশয় বাবাজীর শিষ্য হইয়াছিলেন—ইহা সত্য নহে। ১০১ পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীমৎ অভয়ানন্দ স্বামীকে শ্রীশ্রীমদ্ ভৃগুরাম পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহাও অমূলক। কারণ তিনি গুরুদেব ও ভৃগুরাম স্বামীর সতীর্থ ছিলেন। ১১০ পৃষ্ঠায় আছে যে রাধাবল্লভ বাবু বর্মায় ঠিকাদারী করিয়াছিলেন—বস্তুতঃ রাধাবল্লভ বাবু ঠিকাদার ছিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু তিনি মণিপুরের সৈন্যবিভাগে রসদের ঠিকাদার ছিলেন, ব্রহ্মদেশের নহে। সম্ভবতঃ এইরূপ আরও ক্ষুদ্র প্রমাদ স্মৃতি-ভ্রংশাদি কারণ হইতে হইয়া থাকিবে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে সে সব জানিতে পারিলে শোধিত করিয়া দেওয়া যাইবে।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৭	৯,১০	মোহন বাবা	রতন ক্ষেপা
১৭	১১	মোহন মেলা	রতন মেলা
১৮	১৮	বঙ্ক ঘোষ	বঙ্ক সাধু
১৮	১৯	জলডাঙ্গা	বালডাঙ্গা
৪০	৪	স্বামার	আমার
৪৩	১৮	দক্ষিণারঞ্জন	দক্ষিণাপ্রসাদ
৪৬	৩	করিত্তেন	করিতে
৪৮	১৭	দাঁড়ইবার	দাঁড়াইবার
৫৩	৮,১৩	নন্দী	নগ্‌দী
৮৩	১৫,১৭	রতনবিহারী	বঙ্কবিহারী
১০০	২২	বেড়াইব।	বেড়াইব।"
১১০	৪	কাটোয়্যার	কাটোয়ায়
১১১	৪	করটীয়া	কড়্‌ডে
১২১	১৪	শশ্মান	শ্মশান
১৩০	২১	গ্রামবাসী।	গ্রামবাসী

ভূমিকা

শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্য প্রসঙ্গের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে তাঁহার শিষ্যগণের স্বমুখ-বর্ণিত বর্ণনা যথাবৎ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার কঠোর সাধনা, নির্ম্মল বৈরাগ্য, অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য, গভীর করুণা ও শিষ্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার কিঞ্চিৎ আভাস ইহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাঁহার বহু শিষ্য। প্রতি শিষ্যের জীবনে ও সমক্ষে এমত কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহা সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিলে একটি বৃহৎ গ্রন্থের আকার ধারণ করিবে। সকল শিষ্যের সমস্ত ঘটনার সমষ্টি ত অতি-বিরাট্ ব্যাপার-বিশেষ, তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পাদন করা এক প্রকার অসম্ভব কার্য্য।

অসম্ভব হইলেও যথাশক্তি তাহা করিতে হইবে। যিনি ভবিষ্যতে মহাপুরুষের প্রকৃত জীবনচরিত রচনা করিবেন, তাঁহার কার্য্যের সহায়তার জন্য এখন হইতেই উপাদান সংগ্রহ আবশ্যক। আমি অগ্রণী হইয়া কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছি। আশা করি, আরও যোগ্যতর ব্যক্তি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অধিকতর শ্রম ও অনুসন্ধানের পরিচয় প্রদান করিবেন।

এই লীলা-কথা-প্রসঙ্গে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই অমূলক নহে। সকলগুলিই প্রত্যক্ষদর্শীর স্বলিখিত বিবরণ। পক্ষপাতশূন্যচিত্তে এইগুলি আলোচনা করিলে যে-কোন চিন্তাশীল

ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে, সিদ্ধ মহাপুরুষের লোকোত্তর বিভূতি ও অসীম চরিত্র-মাধুর্য্য ইহার সর্ব্বত্র স্পষ্ট দেদীপ্যমান। অন্যের কথা বলিতে চাই না—আমি নিজের জীবনে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবে বাবাজীর যে সকল অলৌকিক ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা বিশ্লেষণপূর্ব্বক বিচার করিলে বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যায়। অনেক সময়ে মনে হয়, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও প্রেম যুগপৎ সমভাবে মিলিত হইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় মহাভাবের প্রকাশ হইয়াছে। তাহা অন্যকে বুঝাইয়া বলিবার বিষয় নহে। শুধু নিজে নিজে আস্বাদন করিবার সামগ্রী।

গত ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি সর্ব্বপ্রথম বাবাজীর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করি। সে আজ ত্রয়োদশ বর্ষের পুরাতন কথা। কিন্তু এখনও সেদিনটি আমার স্মৃতি-ফলকে উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। তখন অপরাহ্ণ হইয়াছে, বেলা বোধ হয় চারিটা হইবে। একটি বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী যুবকের সহিত হনূমান্ ঘাটের সমীপস্থ আশ্রমে (দিলীপগঞ্জ, বিশুদ্ধানন্দ কুটীর) দ্বিতল গৃহে আমি মহাপুরুষের সাক্ষাৎকারের জন্য গমন করি। যাইয়া দেখি, সমস্ত গৃহটি লোকে পরিপূর্ণ, একপ্রান্তে একখানা তক্তাপোষের উপর ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনে মহাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন। সুন্দর সদানন্দ মূর্ত্তি, প্রসন্ন বদন, উজ্জ্বল চক্ষুঃ, দীর্ঘ-বিলম্বিত শ্মশ্রু, প্রশস্ত ললাট, পরিধানে গৈরিক কৌষেয় বসন,—দেখিলেই মনে হয়, যেন প্রজ্ঞা ও করুণা মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ত্রিতাপ-তাপিত মর্ত্ত্যধামের উদ্ধার সাধনের জন্য অবতীর্ণ। তিনি কাহাকেও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন, কাহাকেও বা বিজ্ঞান-তত্ত্বের দুই একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইতেছিলেন। দেখিয়া ও শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। কারণ, ঐ প্রকার জোরের

সহিত আমি কাহাকেও তত্ত্বোপদেশ দিতে দেখি নাই। ঐ প্রথম দর্শনেই আমার মন তাঁহার শ্রীচরণে নত হইয়া পড়িল। বুঝিলাম, আমি যাহা এতদিন অন্বেষণ করিতেছিলাম, এখানে তাহা পাইব। কবি বলিয়াছেন—"মনো হি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্"। জন্মান্তরের সম্বন্ধ-মূলক সংস্কার সকল চিত্তক্ষেত্রে সুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে, পরে বিশিষ্ট উদ্দীপক কারণের যোগাযোগ হইলে ঐ সকল সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। তখন পূর্ব্বজন্মের অনুভূত সম্বন্ধ প্রভৃতি চিত্তের আপেক্ষিক বিশুদ্ধি অনুসারে স্পষ্ট অথবা অস্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠে। বাবাজীকে দর্শন করিবামাত্রই আমার যেন বোধ হইতে লাগিল—'ইনি আমার চিরদিনের পরিচিত, যেন কত দিনের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আজ অৰ্দ্ধ-স্বচ্ছ আবরণের ব্যবধান ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।' তিনিও আমাকে প্রথম দর্শনের মুহূর্ত্ত হইতেই অতি-পরিচিতের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

ইহার পর প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে যাইতে লাগিলাম। বেলা পড়িয়া আসিলেই মন উচাটন হইয়া পড়িত, কোন লৌকিক কার্য্য ভাল লাগিত না, আশ্রমে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতাম। তখন বৈকাল বেলা বাবাজী বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমিও প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে যাইতাম। কখনও গঙ্গাতটে হনুমান্ ঘাট হইতে অসিসঙ্গম পর্য্যন্ত, কখনও বা নৌকা-যোগে গঙ্গাবক্ষে পঞ্চগঙ্গা ঘাট হইতে অসি বা নাগোয়া পর্য্যন্ত, আবার কোন কোন দিন আদিকেশব পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিতেন। এক এক দিন কুরুক্ষেত্র ও দুর্গাবাড়ীর পার্শ্ব দিয়া সঙ্কটমোচনের দিকে যাওয়া হইত। সঙ্গে অনেক লোক থাকিত। ঠিক সূর্য্যাস্তের সময় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। সূর্য্যাস্তের পরে তিনি কখনই বাহিরে থাকিতেন না।

একদিন সাংখ্য দর্শনের কথা-প্রসঙ্গে প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। বাবাজী সরল ভাষায় সৃষ্টি-রহস্য বুঝাইয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে—জগতের প্রতি বস্তুই যে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনে গঠিত, তাহা দৃষ্টান্তরূপে একটি গোলাপ ফুলের সাহায্যে দেখাইয়া দিলেন। নিকটে একটি গোলাপ ছিল, হাতে লইয়া বলিলেন, "দেখ, এই ফুলটি মেয়ে। একটি পুরুষ ফুল (গোলাপ) হইলেই ইহাতে গর্ভ সঞ্চার করাইয়া একটি নূতন গোলাপের সৃষ্টি করা যায়।" বলিয়া পুষ্পের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতির লক্ষণ কি প্রকার, তাহা দেখাইয়া দিলেন ও গোলাপের পাঁপড়িগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নিকটে পুরুষ-জাতীয় গোলাপ না থাকায় সূর্য্যরশ্মি হইতেই উহার বীজ আকর্ষণ করিয়া উহাতে সঞ্চার পূর্ব্বক সৃষ্টি-প্রণালী দেখাইয়া দিলেন। তখন শীতকাল ছিল। তিনি আমাকে ঐ পাঁপড়িশূন্য গোলাপটি হাতে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলিলেন। যাহাতে শীতের সংস্পর্শ না লাগে, তাহার জন্য বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই মুষ্টি কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দেখিতে পাইলাম একটি পাঁপড়ি-বিশিষ্ট গোলাপফুল নির্ম্মিত হইতেছে। ক্রমশঃ তাহার আয়তন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—পরে যে গোলাপটির পাঁপড়ি খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ একটি পুষ্প তৈয়ার হইয়াছে, দেখিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, "এই প্রকারে স্বভাবের নিয়মে সর্ব্বত্রই প্রকৃতি-পুরুষের যোগে সৃষ্টি হইতেছে। যিনি বিজ্ঞানবিৎ, যিনি স্বভাবের উপাসক, স্বভাবের আরাধনা করিয়া তিনিও ঐ প্রকার সৃষ্টি সাধন করিতে সমর্থ। ঊর্দ্ধতম স্তর হইতে সর্ব্বনিম্নতম ভূমি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাঁহার শক্তি অব্যাহত।"

তখনও আমার দীক্ষা হয় নাই। একদিন সন্ধ্যাবেলা আহ্নিক

LIBRARY 3/283

করিতে উঠিবার কিছু পূর্ব্বে আমি বাবার তক্তাপোষের পার্শ্বদেশে বসিয়া আছি। শাস্ত্রালাপ হইতেছিল। হঠাৎ বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হার্টের অসুখ হইয়াছিল? এখনও তোমার হার্ট দুর্ব্বল দেখিতেছি।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "হাঁ, বাবা, ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমার অসুখ হইয়াছিল। তাহার জন্য প্রায় এক বৎসর কাল আমাকে ভুগিতে হইয়াছে। অনেক কষ্ট পাইয়াছিলাম। তবে এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছি।" বাবা বলিলেন, "দীক্ষা হইলে সব সারিয়া যাইবে, কোন চিন্তার কারণ নাই।" বলিয়া আমার খাদ্যক্রম সম্বন্ধে কিছু কিছু নিয়ম বলিয়া দিলেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত করুণার নিদর্শন পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।

আমি অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে অল্প-বিস্তর প্রাণের আকর্ষণও যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। বিশেষতঃ, একজন মহাপুরুষের অপার্থিব কৃপা ও ভালবাসা আমি অযোগ্য হইয়াও প্রায় সাত বৎসর কাল অবিচ্ছিন্নভাবে ভোগ করিয়া আসিয়াছি। অনেক সময়ে তাঁহাকে আত্মজীবনের আদর্শস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়াছি ও নীরবে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছি। তেমন সাধনা, তেমন পাণ্ডিত্য (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নবীন ও প্রাচীন সর্ব্ববিষয়ে), তেমন শাস্ত্র-বিশ্বাস, সদাচার ও উদার হৃদয় আমি পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার নিকটেও আমি কখনই দীক্ষা প্রার্থনা করি নাই। করিলে তিনি দিতেন কি না, তাহা জানি না। তবে আমার মনে হইত, আমার কাল পূর্ণ হইলে, যোগ্যতা অর্জ্জিত হইলে, আমি না চাহিলেও আমার প্রাপ্য বস্তু পাইবই। ভগবানের রাজ্যে কেহ কদাপি বাস্তবিক পক্ষে বঞ্চিত হইয়া থাকে না। তাই বাবাজী যখন সেদিন সন্ধ্যাবেলা ইঙ্গিতে আমার নিকট

দীক্ষার কথা বলিলেন, হঠাৎ আমার মনে পূর্ব্বভাব ফুটিয়া উঠিল। ভাবিলাম, হয়ত বা এবার সময় হইয়া থাকিবে। যদিও তিনি স্পষ্টতঃ আমাকে কিছুই বলেন নাই, তথাপি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই আমি বুঝিয়া লইলাম যে, আমি একটু উন্মুখ হইলেই তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিবেন। বুঝিলাম বটে, কিন্তু তখনও কিছুই প্রকাশ করিলাম না।

এই ভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। কত উপদেশ শুনিতাম, কত অলৌকিক ব্যাপার মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতাম, ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন হরিশ্চন্দ্র ঘাটের নিকট দিয়া গঙ্গাতীরে সান্ধ্য ভ্রমণের সময় আমার মনে একটি প্রশ্ন উঠিল, আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা, যোগীর পরিচয় কি? যোগ সাধনা করিয়া কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায় যে, যোগ সম্যক্‌সিদ্ধ হইয়াছে? বাহিরের লোকই বা যোগীকে চিনিবে কি করিয়া?" শুনিয়া বাবা একটু হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, সে সব অনেক কথা—পরে বুঝিতে পারিবে। তবে সংক্ষেপে ইহা জানিয়া রাখ যে, প্রকৃত যোগী সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ হন। যিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন, তিনিই যোগী। যোগীর নিকটে কিছুই অসম্ভব থাকিতে পারে না।" আমি বলিলাম, "এ ত ঈশ্বরের কথা আপনি বলিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা ঈশ্বরের ধর্ম্ম—মানুষের ধর্ম্ম নহে। অসম্ভবকে সম্ভব করা মায়ার ব্যাপার,—মায়া ঈশ্বরের অধীন শক্তি-বিশেষ।" বাবা বলিলেন, "যোগীও ত তাই। ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য্যের বিকাশ না হইলে মনুষ্য কদাপি যোগিপদবাচ্য হইতে পারে না। ঈশ্বরই যোগী, যোগীই ঈশ্বর।"

বুঝিলাম, কথাটি অতি-সত্য। আত্মার স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য অবিদ্যার আবরণে আচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া তাহার চিত্তে তৃষ্ণা ও বাসনা নিরন্তর

উত্থিত হইতেছে। অভাব না থাকিলে আকাঙ্ক্ষা জাগিবে কেন? কিন্তু অভাব ত কল্পিত—অজ্ঞান কাটিয়া গেলে কল্পনা থাকে না—কল্পিত অভাবও থাকে না। যাহা থাকে, তাহা নিত্য ও স্থির সত্য। যোগবলে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে অবিদ্যা নিবৃত্ত হয় ও আত্মার নিত্যৈশ্বর্য্যের বিকাশ হয়। *

একদিন কথা-প্রসঙ্গে পাতঞ্জল দর্শন ও তাহার ব্যাসভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আমি বলিয়াছিলাম, "যোগ সম্বন্ধে,—শুধু যোগ কেন, গভীর মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত,—এরূপ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরল।" বাবা বলিলেন, "বৎস, গ্রন্থ ভাল কি মন্দ, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থ হইতে জ্ঞান জন্মে না। চিত্তের সংস্কার ব্যতিরেকে জ্ঞানের উদয় হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। সদ্‌গুরুনির্দিষ্ট ক্রম ও প্রণালী অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে চিত্তের সংস্কার হইতে পারে না। অসংস্কৃত চিত্তে কি তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে? শুষ্কজ্ঞানের কোনই মূল্য নাই।" আমি জাত্যন্তর-পরিণামের কথা উঠাইলাম। বলিলাম, "দেখুন, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতে জাত্যন্তর-পরিণাম ও তাহার নিয়ামক কারণ সম্বন্ধে বহু প্রকার সমালোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। প্রাণিজগৎ, উদ্ভিজ্জগৎ, এমন কি, স্থাবর জগতেও প্রাকৃতিক নিয়মে জাত্যন্তর সংঘটিত হইয়া থাকে। কখন ও কি ভাবে এই প্রকার পরিণাম ঘটিয়া থাকে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহার আলোচনা করেন বটে, কিন্তু পরিণাম-রহস্য তাঁহারা ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। মূল কারণ তাঁহাদের দৃষ্টিতে

---

* ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—"ঐশ্বর্য্যমীশ্বরত্বং হি তস্য নাস্তি পৃথক্‌স্থিতিঃ। পুরুষে ধাবমানেঽপি ছায়া তমনুধাবতি॥ অনন্তশক্তিরৈশ্বর্য্যং নিত্যানন্দাশ্চণিমাদয়ঃ। স্বস্তেশ্বরত্বে সংসিদ্ধে সিধ্যন্তি স্বয়মেব হি॥"—মানসোল্লাসঃ ১০৪-৫।

গভীর কুহেলিকাচ্ছন্ন—সেই জন্যই এই পরিণামকে তাঁহারা স্বেচ্ছায়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনে ও ব্যাসভাষ্যে জাত্যন্তর-পরিণাম তত্ত্বের কারণ-রহস্যের উপপাদন আছে।" বাবা বলিলেন, "সত্য কথা, কিন্তু তাহাতেই বা লাভ কি? তুমি কি বলিতে চাও, পাতঞ্জল দর্শন পড়িয়া কেহ যোগী হইতে পারিবে? কেহ কি জাত্যন্তর-পরিণামের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শুনিয়া পরিণামক্রম স্বায়ত্ত করিতে পারিবে কিংবা প্রাকৃতিক রহস্য কিয়ৎ পরিমাণে উদ্ভিন্ন করিতে পারিবে? তাহা হইতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে কোন রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হইবার নহে। আচ্ছা, পাতঞ্জলে জাত্যন্তর সম্বন্ধে কি আছে, তাহা বল।" আমি বলিলাম, "এক জাতীয় বস্তুর অন্য জাতীয় বস্তুতে পরিণত হওয়াকে জাত্যন্তর পরিণাম বলে। প্রকৃতি বা উপাদানের আপূরণ হইতে এই প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সাংখ্য-মতে প্রকৃতি স্বভাবতঃ পরিণাম-শালিনী, কোন আগন্তুক কারণ হইতে তাহার পরিণাম হয় না। মূল প্রকৃতি জগতের যাবতীয় কার্য্যের আদি-কারণ। তাহা হইতেই নিমিত্ত-ভেদ নিবন্ধন বিভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয়। কিন্তু প্রকৃতি হইতে সকল কার্য্য হইতে পারিলেও বস্তুতঃ সকল কার্য্য হয় না। কারণ, যতক্ষণ পরিণাম-পথের প্রতিবন্ধক অপগত না হয় ততক্ষণ পরিণাম সিদ্ধ হয় না। নিমিত্ত বিশেষের দ্বারা প্রতিবন্ধক বা আবরণ-বিশেষ বিদূরিত হইলে প্রকৃতি অনুরূপ-কার্য্যরূপে আপনিই পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সুতরাং নিকৃষ্ট পদার্থ যেমন উৎকৃষ্ট পদার্থে পরিণত হইতে পারে, তেমনই উৎকৃষ্ট পদার্থও নিকৃষ্ট হইতে পারে। উভয়ত্রই প্রকৃতির আপূরণ বা অনুপ্রবেশ আবশ্যক। শাস্ত্রে আছে, নন্দী ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিল, আবার নহুষ ইন্দ্রপদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কর্ম্মানুসারে সবই সম্ভব। এই জাত্যন্তর-পরিণামবাদ কর্ম্মবিজ্ঞানের মূল সূত্র এবং

Shri Shri ... BANARAS

অকাট্য সত্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সত্যের এরূপ ব্যাপক রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।” বাবাজী বলিলেন, “তোমার কথা মানিয়া লইলাম। কিন্তু জাত্যন্তর-বিজ্ঞান পাতঞ্জল দর্শন পড়িয়া কেহ আয়ত্ত করিতে পারে কি? যোগাভ্যাস না করিলে যোগশাস্ত্রের কোন রহস্যই সম্যক্ প্রকারে বুঝিবার উপায় নাই।” এই বলিয়া বাবাজী আমাকে একটি ফুল লইতে বলিলেন। আমি নিকটস্থ একটি গোলাপফুল হাতে তুলিয়া লইলাম। তিনি ফুলটি আমার হাত হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, “দেখ, এই ফুলটি গোলাপ, কি অন্য কিছু?” আমি বলিলাম, “উহা গোলাপই বটে।” তিনি বলিলেন, “তুমি ইহাকে গোলাপ দেখিতেছ, কিন্তু আমি ইহাতে সবই দেখি। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথাও এমন কিছু নাই, যাহা ইহাতে নাই। ইহাতে সবই আছে।” এই বলিয়া তিনি ফুলটিকে হাতে লইয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সংযোগে টিপিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, গোলাপফুলটি জবাফুলে পরিণত হইয়াছে। ফুলটি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলাম, অতি সুন্দর জবাফুলই বটে।

এই প্রকার বহু সময়ে বহু প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়া শাস্ত্রের রহস্য বুঝাইয়া দিতেন। একবার একটি ফুটন্ত ফুলকে অস্ফুট কোরকে পরিণত করিয়া প্রতিলোম পরিণাম বিষয়ক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তিনি বলেন, কুঁড়িতে যেমন ফুল আছে, ফুলেও তেমনই কুঁড়ি আছে। বীজে যেমন বৃক্ষ আছে, তেমনই বৃক্ষেও বীজ আছে। প্রকাশ-কাল বা অভিব্যক্তির কারণ-সামগ্রী পাইলেই কুঁড়ি পুষ্পরূপে ও বীজ বৃক্ষরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। স্বভাবের নিয়মে সর্ব্বত্রই ইহা হইতেছে। ক্ষেত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের অনুকূলতা এই জন্যই বিকাশের পক্ষে আবশ্যক। আবার ঐ সকল বাহ্য কারণ যদি

পুষ্প হইতে আকর্ষণ করিয়া সরাইয়া দেওয়া যায় অথবা পুষ্প মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নিহিত কুঁড়ির সত্তা যদি তাহার সজাতীয় উপাদানের দ্বারা পুষ্ট করা যায়, তাহা হইলে ঐ পুষ্পটি দেখিতে দেখিতে পুনর্ব্বার কোরকে পরিণত হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে।” আমি বলিলাম, “তাহা হইলে দই হইতেও দুধ বাহির করা যায়?” বাবা বলিলেন, “নিশ্চয়ই। শুধু দই কেন, ঘৃত হইতেও ঘাস পর্য্যন্ত বা তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন কারণ পর্য্যন্ত বাহির করিয়া লওয়া যায়। কারণে যেমন কার্য্য অব্যক্তভাবে থাকে, সেই প্রকার কার্য্যেও কারণ অব্যক্ত-ভাবে থাকে।” আমি বলিলাম, “তাহা হইলে ঈশ্বরে যেমন জীবত্ব আছে, তদ্রূপ জীবেও ঈশ্বরত্ব নিহিত আছে, মানিতে হইবে?” বাবাজী বলিলেন, “তাহা ত সত্যই। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কি জীব চেষ্টা করিয়া ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারিত? যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা কদাপি আবির্ভূত হইতে পারে না।”

১৯১৮ সালের প্রারম্ভভাগে আমি দীক্ষা গ্রহণ করি। ইহার পর হইতে বাবাজীর লোকোত্তর শক্তি অন্তর্জগতেও অনুভব করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু সে সব কথা সাধন-রাজ্যের গুপ্ত ও গোপনীয় বিষয়—তাহা লোক-সমক্ষে প্রচারিত করা সর্ব্বথা অনুচিত মনে করিয়া সে-সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। তবে ইহা বলিতে পারা যায় যে, বাবাজীর উপস্থিতি ও প্রভাব বহুদূরে থাকিয়াও সদা সর্ব্বদাই অনুভব করিতাম। কখন কোথায় যাইতাম, কোথায় বসিতাম, কি কথা বলিতাম, কি ভাবে সময় যাপন করিতাম, বাবা সে সকল বিষয়ে প্রতিনিয়তই সন্ধান লন, তাহা দু-চার দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম। শুধু পদ্মগন্ধ বা অন্য কোন প্রকার দিব্যগন্ধ দ্বারা নহে, আরও বহু উপায়ে তাঁহার আবির্ভাব জানিতে পারিতাম। তিনি প্রায়ই

সূক্ষ্ম শরীরে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন—অনেক সময়ে অন্যান্য মহাপুরুষগণও আসিতেন। কখন কখন কেহ কেহ দেখাও দিতেন। যখন কোন গভীর বিষয়ের আলোচনা হইত, যোগ অথবা ধর্ম্মের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হইত, তখন প্রায়ই বাবা উপস্থিত হইতেন। স্বর্গীয় গন্ধে সকলকে মোহিত করিয়া ও নিজের সত্তা জ্ঞাপন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে অন্তর্হিত হইতেন। এই সব সম্বন্ধে এত অধিক-সংখ্যক ব্যাপার ঘটিয়াছে যে, তাহার উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক বোধ হইতেছে না। রাস্তায় চলিতে চলিতে, স্মরণ করিতে করিতে, প্রাসঙ্গিক ভাবে তাঁহার কথা আলোচনা করিতে করিতে, তাঁহার উপস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছি।

কত সময়ে বাড়ীতে কত ঘোর বিপৎপাত হইয়াছে—তিনি যেখানেই থাকুন আসিয়া বিপৎ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এমন কতবার হইয়াছে। ১৯২২ সালে যখন আমার পত্নী সিঁড়ী হইতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হন ও ভীষণ হিষ্টীরিয়া রোগে আক্রান্ত হন, তখন কোন চিকিৎসাতেই ফল হয় নাই; ইঞ্জেক্শন দিয়াও দৈহিক আক্ষেপের নিবৃত্তি ও নিদ্রার উদয় হয় নাই। নিরাশ হইয়া ৺পুরীধামে বাবাজীকে তার করিয়াছিলাম। তখন প্রায় ৩৬ ঘণ্টা কাল অশান্তিতে কাটিয়া গিয়াছিল—উপশমের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। আর কিছুক্ষণ ঐ ভাবে কাটিলে জীবন রক্ষা অসম্ভব হইবে মনে করিয়াই অনন্যগতি হইয়া তার করিয়াছিলাম। তার করিবার দেড় কিংবা দুই ঘণ্টার পরেই রোগিণীর গৃহ পদ্মগন্ধে ভরিয়া গেল। গৃহে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বুঝিলেন, বাবার শুভাগমন হইয়াছে। ফলেও তাহাই হইল। পদ্মগন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই রোগিণী শান্ত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর দেখা গেল, রোগ নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে,

প্রাণে স্ফূর্ত্তি আসিয়াছে, দেহে নবজীবন সঞ্চার হইয়াছে। আর একবার আমার স্ত্রীর পুনঃপুনঃ রক্ত বমন হয়—ক্রমশঃ অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। ঔষধে কোন ফল হয় না। অকস্মাৎ বাবার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বমন নিবৃত্ত হয় ও রোগশান্তি ঘটে। গত বৎসর পুনর্ব্বার তাঁহার ভয়ঙ্কর অবস্থা হইয়াছিল। নিরন্তর বমন, রেচন, হিক্কা, হৃৎপিণ্ডের কম্পন, ঘোরতর জ্বর, জ্ঞানলোপ, হিষ্টীরিয়া, আত্যন্তিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি অসংখ্য উপসর্গ যুগপৎ আক্রমণ করে। জীবনের আশা ত ছিলই না। এমন কি, রাত্রি যে কাটিবে, সে ভরসাও বিন্দুমাত্র ছিল না। তখন গুরুদেব সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে নিরাময় করেন। শুধু তাহাই নহে, রোগিণীর হস্তে কয়েকটি বটিকা দিয়া তাহার ব্যবহারবিধি বলিয়া অন্তর্হিত হন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগিণী যাবতীয় উপসর্গের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া শান্তিলাভ করেন। এইরূপ আরও বহু ঘটনা আছে। সদ্‌গুরু যে সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার জ্ঞানের অগোচর যে কিছুই থাকিতে পারে না, ইহা হইতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। আমি ত কোন প্রকার সংবাদ দিই নাই, দিবার সময় ও সুবিধা কিছুই ছিল না। এমন কি, তার দ্বারা জানাইবারও অবকাশ ছিল না—অথচ গুরুদেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আবির্ভূত হন ও অযাচিত ভাবে আসন্নমৃত্যু রোগীকে রোগের কবল হইতে ক্ষণেকের মধ্যেই উদ্ধার করেন। ইহাতে সদ্‌গুরুর সর্ব্বজ্ঞত্ব, করুণা এবং লোকোত্তর শক্তিমত্তা সমকালে প্রকাশিত হইতেছে।

একদিন এই বিষয়ের অবতারণা করিলে বাবাজী বলিয়াছিলেন, "বৎস, গুরু যে কি বস্তু তাহা তোমরা এখনও চিনিতে পার নাই। যোগী ভিন্ন কেহ গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। শিষ্যের ঐহিক

ও পারত্রিক সকল প্রকার কল্যাণের ভার গুরু স্বহস্তে গ্রহণ করেন। যোগী গুরু আপন ব্যাপক সত্তার প্রভাবে যুগপৎ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা-জাগ্রদ্‌ভাবে বিদ্যমান থাকেন। ভক্তের আর্ত্তধ্বনি তাঁহাকে আবির্ভূত করায়। আমি সর্ব্বদাই তোমাদের প্রত্যেকের নিকটে রহিয়াছি। তোমরা ক্রিয়াতে উন্নত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিবে।"

গত ১৯২৮ সালের জুন মাসে বাবাজী রূপনারায়ণ নন্দন লেনে অবস্থান কালে আমি সেখানে গিয়াছিলাম। একদিন (বোধ হয় ৭ই তারিখ) সকাল বেলা প্রাতভ্র্মণের পরে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। বাবা বলিতেছিলেন—"ষট্‌চক্রের কথা আমার 'প্রকৃতি-তত্ত্বে' কিছু আছে। তাহাও ভুল। সাধারণতঃ অন্যত্র যাহা দেখা যায়, তাহাও ভুল। উহা এমন জটিল যে, ভাষায় বুঝান যায় না। তবে কমলের দল সম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝা ও বোঝান যায়। দলের সংখ্যা ৪, ৬, ১০, ১২, ১৬ ও ২। কুণ্ডলিনী জাগিলেই একটি তেজোময় জিনিষ প্রকাশিত হয়। নাভিকুণ্ড হইতে নিম্নপর্য্যন্ত কুণ্ডলিনী সুপ্তাবস্থায় ছড়াইয়া আছে। সেই তেজোমধ্যে চারিটি স্তর বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহার তিনটি ইড়াদি তিন নাড়ীর তিন বর্ণ হইতে ও চতুর্থটি সমষ্টিবর্ণ হতে উদ্‌ভূত। সাধনবলে এই চারিটি উঠিতে থাকে—ইহার প্রতিবিম্ব তথায় বর্ত্তমান থাকে। উর্দ্ধস্তরে ইড়া ও পিঙ্গলা নিস্তেজ থাকে বলিয়া উভয়ের সাম্য-জনিত সুষুম্না উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশমান থাকে। ইহার সঙ্গে উর্দ্ধস্তরের একটি বর্ণ থাকে। মোট ছয়টি বর্ণ তখন ফুটিয়া উঠে। এই প্রকারে ক্রমশঃ বিকাশ হইতে থাকে। আজ্ঞাচক্রে শুধু দুইটি বর্ণ। পঞ্চ চক্রের ৪৮টি বর্ণ একাকার হইয়া গেলে তাহার সারাংশ এক হইয়া উর্দ্ধে যায়। ইহাই জ্ঞান-চক্ষুঃ। উর্দ্ধে যাইয়াই সেখানকার আবরণ সরাইয়া

ফেলে। তখন উপর হইতেও একটি তেজঃ নামিয়া আসে। আজ্ঞাচক্রে উভয় তেজের মিলন হয়। এই জন্য ইহা দ্বিদল। সহস্রারের তেজঃ নিরন্তর আসিতেছে, কিন্তু বিক্ষিপ্তচিত্ত জীব তাহা বুঝিতে পারে না। যখন জ্ঞানের উদয় হয়, তখন তাহা বুঝিতে পারে। ইহাই আজ্ঞা-চক্রের ব্যাপার। সমস্ত চক্রের শক্তির সার অংশই জ্ঞান—ক্রিয়া হইতেই ইহার বিকাশ হয়। তখন সকল বর্ণ একাকার হইয়া যায়, বৈচিত্র্য থাকে না; অর্থাৎ বৈচিত্র্যের অন্তরে অভেদ দেখা যায়। পরে ভেদ-বোধ কাটিয়া যায়। ক্রিয়া হইতে চক্র-ভেদ হইতে থাকে। নিম্ন নিম্ন স্তরের সারাংশ লইয়া উপরে উঠিতে হয়, সার বাহির করিতে না পারিলে উপরে উঠা যায় না। কেহ যদি জোর করিয়া উঠাইয়া দেয়, তাহা হইলেও উপরে থাকিতে পারে না। আজ্ঞাচক্রে না গেলে বোধ বা উপলব্ধি হয় না। সবই হয় বটে, কিন্তু উপলব্ধিতে আসে না। কুণ্ডলিনী জাগিলেই নাভিপদ্ম ফোটে। এই পদ্ম সকলের দেহেই আছে—কিন্তু মুদ্রিত হইয়া আছে। কুণ্ডলিনীর জাগরণ আর অন্তঃসূর্য্যের উদয় একই কথা। ইহাই জ্ঞান-সূর্য্য—ইহার উদয়ে পদ্ম আপনিই ফোটে।" এই বলিয়া তিনি বলিলেন, "আমরা প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষ ভিন্ন আমরা কিছু মানি না।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি নিজের নাভির চারিদিকে কয়েকবার হাত দিয়া টিপিলেন। দেখা গেল, নাভির গ্রন্থি খুলিয়া গিয়াছে—মধ্য হইতে অতি মনোহর কান্তিযুক্ত একটি লাল কমল বাহির হইতেছে। ক্রমশঃ উহা অধিকতর প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমরা শুঁকিয়া দেখিলাম, অতি মনোহর কমলের সৌরভ—আঘ্রাণ করিলাম। ব্রহ্মনালের উপর কমলটি ফুটিয়া ছিল, নীচে মৃণাল। বাবা বলিলেন, "বিষ্ণুর নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি—এ সব পৌরাণিক বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে

সত্য। কুণ্ডলিনী না জাগিলে এই কমল ফুটে না। নাভিতে গ্রন্থি-বন্ধন আছে, ইহার উন্মোচন ভিন্ন সিদ্ধিলাভের আশা দুরাশা মাত্র।"

কথাপ্রসঙ্গে একদিন সাক্ষী ও লীলা-তত্ত্ব বুঝাইতেছিলেন। আমি বলিলাম, "বাবা, আপনি যে মহাশক্তির কথা বলেন, তাঁহার সহিত গুণময়ী প্রকৃতির সম্বন্ধ কি?" বাবা বলিলেন, "বৎস, মহাশক্তিই ত প্রকৃতিকে লইয়া খেলিতেছেন, আবার তিনি নিজেই নিজের খেলা দেখিতেছেন। প্রকৃতিতে সুধাও আছে, বিষও আছে—আলো-আঁধার দুইই আছে। তবে যেদিকে আলো, সেদিকে আঁধার নাই, যেদিকে অন্ধকার, সেদিকে আলো নাই। কিন্তু আলোর এমনি প্রভাব যে, তাহার আঘাতে অন্ধকার সরিয়া যায়। কিন্তু অন্ধকার আলোককে অপসারিত করিতে পারে না। প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যিনি মহাশক্তির চরণতলে পৌছিয়াছেন, তিনি প্রকৃতির এই খেলা দেখিতে পারেন। প্রকৃতিকে লইয়া তিনি খেলিতেও পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দায়িত্ব নাই। তিনি মহাশক্তির নিমিত্ত-মাত্র হইয়া খেলা করেন। তিনি মায়াতীত ও পাপপুণ্যের অনধীন। যাহারা মায়ার অধীন, তাহারা এই খেলা দেখিয়া সত্য বলিয়া মোহিত হয়। কিন্তু যিনি যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত, তিনি খেলা দেখেন মাত্র, তিনি খেলাকে খেলা বলিয়াই জানেন। এই জন্য তিনি নিজে মোহিত না হইয়া অজ্ঞানীকে খেলা দেখাইতে পারেন। অজ্ঞানীর চোখে আবরণ আছে বলিয়া তাহার নিকটে এক বস্তুতে আবরণ দিয়া অন্য বস্তুর প্রকাশ করা চলে—অবশ্য ইচ্ছার প্রভাববশতঃ। কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টি নির্ম্মল, তাঁহাকে ঈশ্বরও ভুলাইতে কিংবা মোহিত করিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বদাই মূল সত্তাটি দেখিতে পান—তাই সেখানে আবরণ চলে না। তাঁহাকে

কেহই ফাঁকি দিতে পারে না।” আমি বলিলাম, “আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুইটি অজ্ঞানের ব্যাপার। আপনি যাহা বুঝাইলেন তাহাতে মনে হইতেছে যে, উভয় বস্তুই সমভাবে মিথ্যা বলিয়া একটিকে অন্যটির মতন দেখান সম্ভবপর হয়। গোলাপফুলকে জবাফুল করিয়া দেখান যায়—জবাফুল করিতেও পারা যায়, কারণ গোলাপ ও জবা উভয়ই ফাঁকি। গোলাপকে আবৃত করিয়া সেখানে বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে জবার প্রস্ফুরণ করা চলে। কিন্তু যিনি মহাসত্তাকে দেখিতে পান, যিনি গোলাপ ও জবা উভয়ই প্রাতিভাসিক বলিয়া জানেন, তাঁহাকে ভুলান যায় না। সে অবস্থায় সবই প্রাতিভাসিক। প্রতিভাস স্বভাবের অধীন—কাহারও ইচ্ছা সেখানে কার্য্যকরী হয় না। তাই এ অবস্থাতে স্বাধীনতার আভাস কিছু কিছু পাওয়া যায়। এখানকার নিয়ামক একমাত্র স্বভাব—এমন কি, স্বেচ্ছাও নিয়ামক নহে। আমার ত এইরূপই মনে হয়।” বাবা বলিলেন, “হাঁ, কতকটা ঐরূপই বটে।”

একদিন মন্ত্রতত্ত্বের আলোচনা হইতেছিল। প্রসঙ্গতঃ, গায়ত্রীর বিষয়ে কথা উঠিল। বাবা বলিলেন, “গায়ত্রী উপাসনা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য-রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। আজ-কাল ব্রাহ্মণের ছেলে সন্ধ্যা-গায়ত্রী ছাড়িয়া দিতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ নহে। ব্রাহ্মণ যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার অভাব কি? সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণের অধীন।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “গায়ত্রী মন্ত্র বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। মন্ত্রমাত্রই শব্দসমষ্টি বলিয়া লৌকিক বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই—গায়ত্রী মন্ত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি?” বাবা উত্তরে বলিলেন, “সকল মন্ত্রেই বৈশিষ্ট্য আছে, তবে গায়ত্রীর বৈশিষ্ট্য কিছু বেশী।” তিনি আরও বলিলেন, “আমি গায়ত্রীর তেজঃ ঘনীভূত করিয়া আবরণের দ্বারা পুটিত করিয়া শিশিতে রাখিয়াছি।

তুমি তাহার কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করিয়া একটি তাম্রপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপর গায়ত্রী মন্ত্র মনে মনে জপ করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, গায়ত্রী-মন্ত্রগত শব্দের কি প্রভাব। তাম্রপাত্রটি গঙ্গাজল দ্বারা ধৌত করিয়া লইও এবং ঐ পদার্থের চারিদিকে তূলার দ্বারা বেষ্টন করিয়া দিও।" এই বলিয়া তিনি আমাকে একটি শিশি হইতে কৃষ্ণাভ একটি বস্তু দিলেন—আমি উহা লইয়া তাঁহার আদেশানুযায়ী একটি তাম্রকুণ্ড ধুইয়া উহার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিলাম ও চারিদিকে তূলা দিয়া ঘেরিয়া গায়ত্রী মন্ত্র উহার উপর মনে মনে জপ করিলাম। হস্ত দ্বারা বস্তুটিকে স্পর্শ করি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, জপ সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুটিতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। প্রদীপ্ত অগ্নি তূলারাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

এইরূপ কত সময় যে কত বিষয় দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, তাহার গণনা নাই। অণিমা ও মহিমা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন আঙ্গুল মোটা করিয়া দেখাইয়াছিলেন। আধলা হইতে গিনি তৈয়ার করা, টাকা বা অন্য কোন বস্তু উড়াইয়া দেওয়া অর্থাৎ পরমাণুরূপে অব্যক্ত করিয়া ফেলা, ইড়া-পিঙ্গলা ও সুষুম্নার এবং লিঙ্গদেহের পৃথক্ পৃথক্ গন্ধ আকর্ষণ করিয়া দেখান, প্রেতাকর্ষণ, শরীরাভ্যন্তরে স্ফটিকাদি ঢুকাইয়া দেওয়া ও বাহির করা, নারিকেল তৈল, পুরাতন ঘৃত, সদ্যোনির্ম্মিত গব্য ঘৃত, চাটনী, নানাপ্রকারের সন্দেশ, রসগোল্লা, চমচম, পানের উৎকৃষ্ট মসলা, জাফরান, কারবোলিক এসিড্, ফিনাইল, কুইনাইন চূর্ণ, কুইনাইন টেবলেট, ধূপ, বেদানা, মহাশঙ্খবটী, চ্যবনপ্রাশ, মকরধ্বজ, লৌহময়ী সূচী, বোতলের মধ্যে ভায়লেট গাছ, হীরক, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি শত শত প্রকারের বস্তুর নির্ম্মাণ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জীবের মধ্যে মাছি, চামচিকা প্রভৃতি জীবজন্তু তৈয়ার করিতে দেখিয়াছি।

সকল বিষয় লিখিয়া বর্ণনা করা চলে না। বিশেষতঃ অন্তর্জগৎ ও সাধন রাজ্যের সম্বন্ধে কোন কথা ব্যক্ত করিয়া প্রচার করা যুক্তি-সঙ্গত নহে।

এই সব ব্যাপার নিরন্তর দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রকৃত যোগী অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। প্রত্যেক মনুষ্যই চেষ্টা করিলে ও ঠিক পথে অগ্রসর হইলে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে পরমানন্দ লাভ করিতে পারে, ইহাই তাঁহার উপদেশ। মানুষ যে কত মহৎ, কত বড়, তাহা আত্মবিস্মৃত হইয়া সে ভুলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুদিন সৎপথে চলিতে পারিলে আবার সব বুঝিতে পারিবে। তিনি এই জন্যই কিছু কিছু অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইয়া থাকেন। এই সব দেখিয়া যখন মনুষ্য বুঝিতে পারিবে যে, তাহার মধ্যে সর্ব্বশক্তি নিহিত আছে, শুধু কর্ষণের অভাবে তাহার বিকাশ হইতেছে না, তখন সে বহির্মুখতা ও বিষয়-লিপ্সা ত্যাগ করিয়া যথার্থ বৈরাগ্য ও বিবেককে সঙ্গে করিয়া অনাসক্ত কর্ম্মিরূপে পরমানন্দময় শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। যিনি সর্ব্বজগতের ও যাবতীয় ভাবের মূল উৎস, তাঁহাকে লাভ করিলে জীবের আর কোন্ অভাবই বা থাকিতে পারে? দেবদেবীতে অবিশ্বাস, শাস্ত্রে অবিশ্বাস, গুরু ও মহাজন বাক্যে অবিশ্বাস, ইহাই বর্ত্তমান সমাজের অবনতির কারণ। কিন্তু ইহাও অহেতুক নহে। দীর্ঘকাল তপঃসাধন পূর্ব্বক সত্যের উপলব্ধি এখন অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। তাই সত্যলাভের মহত্ত্ব প্রায় কেহই প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারে না। বহির্ভাবপ্রবণ মানব কিছু লোকোত্তর শক্তির প্রভাব দেখিতে না পারিলে শুধু বাক্‌প্রপঞ্চে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না।

কেহ কেহ মনে করেন, বিভূতি দেখান উচিত নহে, তাহাতে

সাধকের ক্ষতি হয়। কেহ মনে করেন, বিভূতি তুচ্ছ জিনিষ, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিবার কোন হেতু নাই। কেহ বলেন, বিভূতি অনিত্য ধর্ম্ম, নিত্য বস্তুই সাধ্য—অনিত্য ধর্ম্মের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ উচিত নহে। অন্য কোন কোন লোকের ধারণা, জ্ঞানী বা যোগী মায়াতীত ও নিস্ত্রৈগুণ্য পদে আরূঢ় হইলে বিভূতি অতিক্রম করিয়া যান—তিনি বিভূতি দেখাইবেন কি প্রকারে? এই সকল শঙ্কার সমাধান-চেষ্টা এখানে নিষ্প্রয়োজন হইলেও সংক্ষেপে দুই একটি প্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি।

যোগবিভূতি সম্বন্ধে এই সকল ধারণাই অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। লোকোত্তর ব্যাপার মাত্রই বিভূতির নিদর্শন বটে, কিন্তু উহা যোগবিভূতি নহে। পরম পদার্থের সহিত সংযোগ হইলে জীবভাব অভিভূত হইয়া তাহাতে যে ঐশ্বর্য্যভাবের উদয় হয় তাহাই যোগবিভূতি। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তিরূপে উহা ত্রিধা-বিভক্ত হইয়া জগতে আত্ম-প্রকাশ করে। সমবাহু ত্রিকোণের তিন বিন্দুই উন্মেষপ্রাপ্ত শক্তিত্রয়ের প্রকটিত রূপ। বিভাগের পূর্ব্বে ইচ্ছাদি শক্তিত্রয় মধ্যবিন্দুতে একাত্মভাবে পরাশক্তিরূপে বিলীন থাকে। এই মধ্যবিন্দুতে অবস্থিতিই যোগ—এখান হইতে যে স্ফুরণ হয়, তাহাই যোগবিভূতি। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে এই স্ফুরণ প্রকাশিত হয় বলিয়া ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে যোগবিভূতি বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মবিদ্যায় বিদ্বান্ না হইলে মধ্যবিন্দুতে স্থিতি হয় না, পরম সাম্য সংঘটিত হয় না, নিরঞ্জন সাক্ষিভাবের বিকাশ হয় না। যোগ হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়। সুতরাং যোগবিভূতি ব্রহ্মজ্ঞানেরই নিদর্শন। বস্তুতঃ চিন্ময়ী পরাশক্তির সহিত সম্বন্ধ হইলে যোগীর অসাধ্য কি থাকিতে পারে? তখন মহামায়ার কৃপায় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া বশীভূত

হয়—ইহাই ঐশ্বর্য্য। কারণ, মায়াকে অধীন করার নামই ঈশ্বরত্ব। ইহা অখণ্ডৈশ্বর্য্য। যাবতীয় খণ্ডৈশ্বর্য্য ইহারই ভিন্ন ভিন্ন আংশিক বিকাশ মাত্র। যোগী এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর তাঁহার চ্যুত হইবার ভয় থাকে না। আত্মবিস্মৃত জীবকে আপন স্বভাবে ফিরাইয়া লইবার জন্য যোগিগণ অধিকার ও যোগ্যতা বিচার করিয়া কাহাকেও কিছু কিছু ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া থাকেন—কিন্তু ইহাও তাঁহারা পরমেশ্বরের আদেশানুসারেই করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা কি? প্রকৃত যোগীর আসক্তি ও অহঙ্কার থাকে না—তাঁহার যোগ কখনই খণ্ডিত হইবার নহে। পাতঞ্জল দর্শনে মধুমতী অবস্থার কথা যে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নভূমির কথা। সিদ্ধযোগী পরমেশ্বরের সহিত যোগযুক্ত—তিনি পাতঞ্জল সম্প্রদায়ের চতুর্থ ভূমিরও অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। উপাদান ও নিমিত্ত অভিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত, অদ্বৈত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত, যোগিপদবাচ্য হওয়া যায় না। কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন নিবন্ধন প্রজ্ঞানেত্রের উন্মীলনের ক্রম-পরিণতিতে শিবত্বের বিকাশ পূর্ণতালাভ করিলে প্রকৃত যোগভাবের উপলব্ধি হয়। বিশুদ্ধ চৈতন্য নিত্য স্বপ্রকাশ হইলেও এই অবস্থাতেই আত্মপ্রকাশ করে। যোগী তখন শক্তিচক্রের নাভিতে অধিরূঢ় হইয়া অনন্ত শক্তি লইয়া খেলা করিতে পারেন, আবার নিজের খেলা নিজেই দেখিতেও পারেন। বস্তুতঃ মহাশক্তির সঙ্গে যোগ-যুক্ত বলিয়া তাঁহার পক্ষে খেলা করা ও খেলা দেখাতে কোন প্রভেদ নাই। যে অহঙ্কার-বিমূঢ় সে গুণাত্মিকা প্রকৃতির খেলাকে নিজকৃত মনে করিয়া নিজে কর্ত্তা সাজিয়া বসে, কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে অহঙ্কারবিহীন ও গুণাতীত শুদ্ধ চিদ্‌বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা হইয়াও সব কার্য্য করেন এবং অখিল কার্য্য করিয়াও নির্লিপ্ত সাক্ষীই থাকেন।

তিনি স্বভাবে আছেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে খেলা করা ও খেলা দেখা একই ব্যাপারের এ-পিঠ ও-পিঠ মাত্র।

অলৌকিক ব্যাপার মাত্রই যোগবিভূতির নিদর্শন নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাহ্য উপাদান অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া-কৌশলে তাহাকে ইচ্ছানুরূপ নিয়ন্ত্রিত করা যায়। নিমিত্ত ও উপাদানের ভেদ থাকে বটে, কিন্তু জ্ঞানোৎকর্ষ বশতঃ উপাদানকে আয়ত্ত করিয়া তাহার দ্বারা অভীষ্ট কার্য্য সংসাধন করা চলে। ইহাই বিজ্ঞান। মূল সূত্রের ভেদে বিজ্ঞানের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। সূর্য্য-বিজ্ঞান বিজ্ঞান-জগতের শিরোমণি। চন্দ্র, নক্ষত্র, বায়ু ও ক্ষণ অবলম্বন করিয়াও এক এক প্রকার বৈজ্ঞানিক পন্থার আবিষ্কার হইয়াছে। সূর্য্য-বিজ্ঞানের কথা চরিত-কথায় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য বিজ্ঞানের রহস্যও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার ইহা স্থান নহে। যদি গুরুদেবের কৃপা হয়, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এখানে শুধু ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, সাধারণতঃ লোকে যাহাকে বিভূতি বলে তাহা বিজ্ঞানেরই ব্যাপার—তাহা যোগবিভূতি নহে। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতি পাদে যে সকল বিভূতির বর্ণনা আছে তাহার অধিকাংশ বিজ্ঞানেরই অন্তর্গত। বিজ্ঞান মতে কার্য্যোৎপত্তি তৎ তৎ কারণ-সাপেক্ষ, কিন্তু যোগী নিখিল কার্য্য স্বাত্মভাব হইতেই প্রাদুর্ভূত করিতে পারেন। এখানে পৃথক্ কার্য্যকারণভাবের স্বীকার আবশ্যক হয় না। ইহার কারণ এই, বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা সমগ্র কারণ-চক্রকে স্বায়ত্ত না করিলে যোগ ও জ্ঞানের উদয় হয় না, কিন্তু বিজ্ঞানে কারণকে পৃথক্ রাখিয়াও তাহাকে বশীভূত করিয়া শক্তি প্রভাবে কার্য্যোৎপাদন করিতে পারা যায়। যোগে পূর্ণ-আত্মাতে স্বাত্মভাব প্রতিষ্ঠিত থাকে

বলিয়া ইচ্ছামাত্রই কার্য্যের স্ফুরণ হয়—উপাদানের অপেক্ষা থাকে না। যে মূল সত্তা হইতে যাবতীয় কার্য্যের সৃষ্টি হয় তাহা যোগীর আয়ত্ত—তাই ইচ্ছা করিবামাত্রই ঐ সত্তা হইতে ইচ্ছানুরূপ প্রতিভাসের আবির্ভাব হয়। যোগীর অপ্রাপ্ত কিছুই নাই—সেই জন্য উপাদেয়ও কিছুই নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

চিদাত্মা হি দেবোঽন্তঃস্থিতমিচ্ছাবশাদ্ বহিঃ।
যোগীব নিরুপাদানমর্থজাতং প্রকাশয়েৎ॥

ইহাই যোগিসৃষ্টির রহস্য। কিন্তু বিজ্ঞানের সৃষ্টিতে পৃথক্ উপাদানের আবশ্যকতা আছে। সাধারণ লোকে সূক্ষ্ম উপাদান দেখিতে পায় না বলিয়া যোগ ও বিজ্ঞানের পরস্পর ভেদ বুঝিতে পারে না।

যাঁহারা বিভূতিকে তুচ্ছ মনে করেন, তাঁহারা যদি বিভূতির অধীশ্বর হইয়া বিভূতির তত্ত্বজ্ঞ হন, তাহা হইলে কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহারা বিভূতিকে তুচ্ছ মনে করিবেন না। যে সকল লোক বিভূতির স্বরূপ অবগত নহে, তাহারা যদি আত্মমাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্য অনধিগত ও অনধিগম্য বস্তুর নিন্দাবাদ করে, তাহা হইলে উহা অমূলক ভাষণ বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য। যে নিঃসম্বল দরিদ্র সামান্য দুইটি পয়সার জন্য চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, তাহার মুখে কোটি-পরিমিত স্বর্ণমুদ্রার নিন্দা শোভা পায় না। পূর্ণ অর্থ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াও যদি তাহাতে চিত্ত অবিকৃত থাকে, তবে ধনী হইয়া ধনের নিন্দাবাদ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। অর্থ স্বভাবতঃ অপকারক বস্তু নহে, অর্থের ব্যবহার হইতেই উপকার বা অপকার ঘটিয়া থাকে। অর্থের দ্বারা উপকার করা যায়, অপকারও করা যায়—অর্থবানের মানসিক ভাবের উৎকর্ষ বা অপকর্ষই অর্থের বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগের মূল কারণ। তদ্রূপ বিভূতি স্বভাবতঃ খারাপ জিনিষ নহে।

যোগাভ্যাস ও সূক্ষ্মবিজ্ঞান তত্ত্বের অভ্যাস করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে বিভূতি আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়। তাহাকে পৃথগ্‌ভাবে আবাহন করিবার প্রয়োজন হয় না। আগুন জ্বালিয়া যেমন তাপকে আমন্ত্রণ করিতে হয় না, সেই প্রকার সাধন-পথে প্রবিষ্ট হইয়া অধিকারী হইলে সিদ্ধিকে আকর্ষণ করিতে হয় না। সিদ্ধি আপনিই আসে।

বুদ্ধদেব, মুসা, এলিসা, যীশু খ্রীষ্ট, এপলোনিয়স, নাগার্জ্জুন, গোরক্ষনাথ, জলন্ধরনাথ, শঙ্করাচার্য্য, কবীর, নানক, চৈতন্যদেব প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মগণ সকলেই শক্তিশালী ছিলেন। প্রাচীন যুগের অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণের অলোকসামান্য ক্ষমতার কথা ত আলোচনা করাই অনাবশ্যক। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের মধ্যে মৌদ্‌গলায়ন, সারিপুত্র প্রভৃতি, গোরক্ষের সম্প্রদায়মধ্যে চর্পটি, চতুরঙ্গী প্রভৃতি, যীশুর মতানুসরণকারিগণের মধ্যে পলা ও আসিসির সেণ্টফ্রান্সিস্‌, ডায়োসপলিসের সেণ্ট জর্জ্জ প্রভৃতি সকলেই বিভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অবসর বুঝিয়া ও প্রয়োজনানুসারে যোগ-বিভূতি প্রভৃতির প্রয়োগ করিতেন—এ কথা যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহাদিগের অবিদিত নাই। বিভূতিকে তুচ্ছ কহিয়া যাঁহারা নিজেদের মহত্ত্ব খ্যাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা জ্ঞানী এবং শ্রদ্ধেয় নহেন, ইহা নিঃসন্দেহ। তবে শাস্ত্রে যে কোন কোন স্থানে বিভূতিকে উপেক্ষা করিতে বলা হইয়াছে, তাহা প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য করিয়া। অবশ্য, ইহা মার্গস্থ সাধকের জন্যই বুঝিতে হইবে। মার্গের অবসানে পরা সিদ্ধি যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, শাস্ত্রের শাসন-বাক্য তাঁহার জন্য নহে। সাধক অবস্থায় খণ্ড সিদ্ধির উদয় হইলে উহাকে সংযত করিয়া রাখিতে হয়, তাহাতে একপক্ষে যেমন সংযম বশতঃ সিদ্ধির উৎকর্ষ হয়, অপরপক্ষে তেমনই উর্দ্ধভূমিতে আরোহণ করিবার সৌকর্য্য জন্মে। জ্ঞানের

প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ না করিয়া অন্যকে উপদেশ দিতে যাওয়া যেমন ধৃষ্টতা মাত্র, তেমনই সিদ্ধির পূর্ণতালাভ না করিয়া তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য যত্ন করাও মূঢ়তা। সিদ্ধিকে অন্তরায় বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য। রোগনিবৃত্তি হইলে যেমন বলাধান হইবেই, তেমনই আত্মার মলনিবৃত্তি হইলে ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব হইবেই। বল যেমন সুস্থদেহের চিহ্ন, ঐশ্বর্য্যও তেমনি যোগের নিদর্শন। সুতরাং ইহা উপেক্ষনীয় হয়।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, অধ্যাত্মপথে সিদ্ধির কোন সার্থকতা আছে কি? অবশ্য অন্যকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তাহার বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সিদ্ধির উপযোগিতা আছে বটে, কিন্তু সিদ্ধিলাভে নিজের কোনও কল্যাণ সাধিত হয় কি? ইহার উত্তর এই—নিশ্চয়ই হয়। ভোগ না করিয়া যেমন ত্যাগ করা সম্ভবপর নহে, করিতে গেলেও উহা কপটাচার মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, সেই প্রকার ঐশ্বর্য্যলাভ না করিয়া প্রকৃত আত্মসমর্পণ হয় না। আত্মসমর্পণ ব্যতিরেকে পরম পদার্থে স্থিতি হওয়ারও উপায় নাই। আমার বিক্ষিপ্ত উপাদান সমগ্র জগতে ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেই জন্য চারিদিকে আমার প্রাণ আকৃষ্ট হইয়া জড়াইয়া পড়ে। আমার নিজের অংশ যদি জগতে বিক্ষিপ্ত না থাকিত, তাহা হইলে আমি আপনাতে আপনি নিমগ্ন হইয়া স্থির থাকিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা পারি না। সুতরাং আবার আমাকে ঐ সকল আপন উপাদানরাশি টানিয়া আনিতে হইবে, একত্র জমাইয়া ঘনীভূত করিতে হইবে, একাগ্র করিতে হইবে, তবে ত আমি সমগ্রতা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। এই একাগ্রতা বা সমগ্রতাই সিদ্ধি। এই অবস্থা আয়ত্ত হইলে কিছুরই অভাব থাকে না। তখন নিরোধ আপনিই অভিমুখ হয়, কারণ সিদ্ধি পরমার্থের বা পরম

চৈতন্যের মধ্যেই পূর্ণতালাভ করে। সিদ্ধ চিত্ত চৈতন্যসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেই আত্মসমর্পণ সম্পন্ন হয়, ইহার ফল মহাসিদ্ধি বা আত্মস্বরূপের আবির্ভাব—অর্থাৎ স্বভাবে স্থিতি। বলা বাহুল্য, বিক্ষিপ্ত চিত্ত আত্ম-সমর্পণের অধিকারী নহে।

বিভূতি অনিত্য কি নিত্য, সে আলোচনা নিষ্ফল। এক হিসাবে জগতে সবই অনিত্য হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে সবই নিত্য। অজ্ঞানীর চক্ষুতে যাহা জড়, জ্ঞানীর ব্রহ্মদৃষ্টিতে তাহা চৈতন্যস্বরূপ। বিভূতি বা সিদ্ধি শক্তিস্বরূপ। শক্তি বিভক্ত ও খণ্ডভাবে অনিত্য হইলেও অবিভক্ত ও অখণ্ডভাবে চিন্ময়ী এবং নিত্য। সুতরাং আত্মা যখন পরমাত্মায় যুক্ত হয়, তখন তাহার শক্তিও খণ্ডতা ও পরিচ্ছিন্নতা পরিহারপূর্ব্বক পরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। পরমেশ্বর যেমন নিত্য, তাঁহার এই পরাশক্তিও তেমনই নিত্য। উভয়ই চৈতন্যস্বরূপ। বাস্তবপক্ষে উভয়ে কোন ভেদ নাই। দ্রষ্টৃ ভাবে শিবত্বের ও দর্শন-দৃশ্য ভাবে শক্তিত্বের আরোপ হয় মাত্র—কিন্তু উভয়ে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। শক্তিই অনন্ত আকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন—পরমেশ্বর সকলের মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়াও সকল ভাব হইতে পৃথগ্‌রূপে উদাসীন ও সাক্ষী হইয়া নিরন্তর আপন শক্তির ক্রীড়া দেখিতেছেন। শুদ্ধ জগৎ, মিশ্র বা মায়িক জগৎ এবং অশুদ্ধ বা গুণাত্মক প্রাকৃত জগৎ—সর্ব্বত্র শক্তিরই সঙ্কোচ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তির অন্তর্লীনাবস্থা আছে বলিয়া বিভূতিকে অনিত্য বলা যাইতে পারে—কিন্তু মহাশক্তির লয় নাই বলিয়া চরমদৃষ্টিতে বিভূতিও নিত্য পদার্থ।

যোগী ত্রিগুণ ও মায়ার অতীত হইলে চিত্ত অব্যক্ত হইয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, মায়াতীত অবস্থায় বিভূতির স্ফুরণ হইতে পারে না। ইঁহাদের বিশ্বাস, প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইতে

বিভূতির উদয় হইতে পারে—গুণাতীত অবস্থায় সত্ত্বগুণ থাকে না বলিয়া এবং পুরুষ সত্ত্ব হইতে পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশমান হয় বলিয়া সিদ্ধি থাকিতে পারে না। বলা বাহুল্য, এই বিশ্বাস আপেক্ষিক সত্যের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্যের ব্যাপক রূপ দেখিলে ইহা নির্ম্মূল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সত্ত্বশুদ্ধি হইতে যে বিভূতির স্ফুরণ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং সত্ত্ব ও পুরুষের ভেদজ্ঞান পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরবৈরাগ্যের দ্বারা অতিক্রান্ত হইলে যে বিভূতি থাকে না, তাহাও সত্য। কিন্তু ইহা ঈশ্বরোপাসকের পক্ষে সত্য নহে। কারণ অপ্রাকৃত ও বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ উপাধির সহিত নিত্য সম্বন্ধ থাকাতে পরমেশ্বর নিত্যমুক্ত ও নিত্যৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন—জীব যখন তাঁহার কৃপায় এই অপ্রাকৃত সত্ত্বে অবস্থান করে, তখন তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহারই সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়। তখন সে মুক্ত হইয়া যায়, অথচ বিশুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে পরমমঙ্গলময় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। তখন প্রাকৃত সত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাকৃতিক বিভূতির তিরোধান হইলেও পরমেশ্বরসম্বন্ধনিবন্ধন মহাবিভূতির উন্মেষ হয়।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। পাতঞ্জলমতে চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলে। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক, ইহাতে সত্ত্বগুণ বা প্রকাশধর্ম্ম, রজোগুণ বা প্রবৃত্তিধর্ম্ম এবং তমোগুণ বা স্থিতি ধর্ম্ম আছে। কিন্তু তিন গুণ সকল চিত্তে সকল সময়ে সমভাগে থাকে না। কোন চিত্তে কখনও কোন গুণের আধিক্য থাকে, অন্যান্য গুণের ন্যূনতা থাকে। তবে প্রত্যেক চিত্তেই সব গুণ বর্ত্তমান থাকে। চিত্তের মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পঞ্চভূমি গুণভেদ-নিবন্ধন। ইহার মধ্যে প্রথম দুই ভূমি যথাক্রমে তমঃ ও রজোগুণের প্রাধান্য বশতঃ যোগ-সাধনার একান্ত অযোগ্য, কারণ ঐ ভূমিতে সমাধির উদয় হয় না। দৈত্যদানবগণের চিত্ত ও বিষয়-লোলুপ

মনুষ্যগণের চিত্ত ক্ষিপ্ত—সর্ব্বদাই রজোগুণের দ্বারা তৎতদ্‌বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয় বলিয়া অত্যন্ত অস্থির। রাক্ষস-পিশাচাদির চিত্ত ও মাদকাদি সেবামত্ত পামরগণের চিত্ত মূঢ়—তমোগুণের আধিক্যবশতঃ নিদ্রালু ও জড়ত্ববিশিষ্ট। বিক্ষিপ্ত ভূমিতে—যে ভূমিতে নিম্নস্তরের দেবগণ ও জিজ্ঞাসুগণ অবস্থিত—সমাধি হয় বটে, তবে উহা অপ্রধান, বিক্ষেপই উহাতে প্রধান। বিক্ষেপের প্রাধান্যবশতঃ তদঙ্গীভূত সমাধি যোগের অনুকূল হয় না। প্রবল বিরোধিবর্গের মধ্যে থাকিলে স্বকীয় কার্য্য-সাধনে সামর্থ্য জন্মে না। একাগ্র ও নিরুদ্ধভূমিই প্রকৃত যোগভূমি। ইহার মধ্যে আবার নিরোধই মুখ্যযোগরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য, তবে একাগ্র ভূমিতে ধ্যেয় ভিন্ন অপর সকল ভাব তিরোহিত হয় বলিয়া উহাকেও গৌণযোগ বলা যাইতে পারে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাতাবস্থা—এই অবস্থায় সত্য পদার্থের প্রকাশ হয়, অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ ক্ষীণ হইতে থাকে, কর্ম্মবন্ধন শিথিল হয়, এবং নিরোধ অভিমুখ হয়। ইহার পর যাবতীয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে পতঞ্জলিসম্মত যথার্থ যোগের আবির্ভাব হয়। তখন দ্রষ্টা পুরুষ আপন শক্তিস্বরূপে স্থিতিলাভ করে।

যখন চিত্তসত্ত্বে রজঃ ও তমোগুণের সংসর্গ থাকে—অর্থাৎ চিত্তাকারে পরিণত সত্ত্বে যখন তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ও পরস্পর সমভাগে রজঃ ও তমোগুণ অনুবিদ্ধ থাকে—তখন চিত্তে ঐশ্বর্য্য ও বিষয় প্রীতিকর বোধ হয়। তখন চিত্ত সত্ত্বপ্রধান বলিয়া যদিও তত্ত্ব প্রণিধান করিতে অভিলাষী হয়, তথাপি তত্ত্ব তমোগুণের আবরণে আবৃত থাকিবার দরুণ ভ্রমবশতঃ বিভূতিকেই তত্ত্ব মনে করিয়া উহারই প্রণিধান করিতে ইচ্ছা করে। ক্ষণমাত্র প্রণিধান করেও বটে। কিন্তু তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। কারণ, রজোগুণ তখনই তাহাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আইসে। সুতরাং ফলে বিভূতির অনুরাগ

মাত্রই তাহাতে থাকে, বিভুতিলাভ হয় না। শব্দাদি বিষয়ের প্রতি এই প্রকার চিত্ত স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়। যখন তমোগুণ রজোগুণকে জয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখন রজঃ চিত্তসত্ত্বের আবরক তমঃকে উৎসারিত করিতে না পারার দরুণ তামসিক চিত্ত অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য-যুক্ত হয়। যখন ঐ চিত্তসত্ত্বে সত্ত্বের আধিক্য হয়, তখন উহা সর্ব্বতঃ দ্যোতমান হয় ও উহার মোহাবরণ ক্ষীণ হয়। যখন রজোগুণ সত্ত্বের দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়, তখন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তি হয়। আর যখন ঐ চিত্তসত্ত্বে রজোগুণের লেশরূপ মলও থাকে না, তখন উহা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তসত্ত্বের মল বিদূরিত হয়। চিত্তের স্বরূপপ্রতিষ্ঠা হইলে বিষয় ও ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাহার হয়। কিন্তু তখনও চিত্তের কর্ত্তব্যরূপ অধিকার সমাপ্ত হয় না। তখন তাহার একমাত্র কার্য্য অবশিষ্ট থাকে—তাহা সত্ত্ব ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতি বা বিবেকখ্যাতি। এই অবস্থায় ধর্ম্মমেঘসমাধি বা পরম প্রসংখ্যান উদিত হয়। এই সমাধির অবস্থায় চিত্ত অত্যন্ত নির্ম্মল ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু নির্ম্মল হইলেও ইহা প্রকৃতির বিকার বলিয়া পরিণামশালী ও পুরুষের সহিত তুলনায় মলিন। পুরুষ অথবা চিৎশক্তি পরিণামশূন্য, বিষয়েতে সঙ্গহীন, শুদ্ধ এবং অনন্ত। বিবেকজ্ঞানের অবস্থায় চিত্ত অত্যন্ত শুদ্ধ হইলেও গুণাত্মক বলিয়া পুরুষের বিপরীতভাবাপন্ন। কাজেই, একবার পুরুষের সাক্ষাৎকার হইলে চিত্তের এই স্বাভাবিক মলিনতা অনুভূত হয় বলিয়া ইহারও পরিহার হইয়া যায়। চিত্ত বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ বিষয়াকারে পরিণত হয়। কিন্তু চৈতন্যে ধর্ম্ম, লক্ষণ অথবা অবস্থা কোন প্রকার পরিণাম নাই বলিয়া ইহা ক্রিয়ারূপ ধারণ করে না এবং চিত্তের সংযোগেও অপরিণামী স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই চিত্তস্থ বিষয়কে প্রকাশিত

করে। এই জন্যই চৈতন্যের সংক্রমণ এবং বিষয়াকারপ্রাপ্ত বুদ্ধিতে আরোহণ কখনই সম্ভবপর হয় না, অথচ চিদালোকে বিষয়ের প্রকাশ হইতে বাধা জন্মে না। পুরুষ বা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিলে বিবেক-জ্ঞানের উপরও এইজন্য বিতৃষ্ণা জন্মে। এই বৈরাগ্যই শাস্ত্রে পরবৈরাগ্য অথবা জ্ঞান-প্রসাদ নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। যে বৈরাগ্যে ঐহিক ও পারত্রিক যাবতীয় ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহা নিম্ন ভূমির বৈরাগ্য। পরবৈরাগ্য হইতে গুণমাত্রের প্রতিই পরাঙ্মুখ-ভাব উৎপন্ন হয়। ইহার ফলে বিবেকজ্ঞানও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন চিত্ত শুদ্ধ সংস্কাররূপে পর্য্যবসিত হয়। ইহাই নির্বীজ সমাধি। এই অবস্থায় কিছুরই বোধাবোধ (সম্প্রজ্ঞান) থাকে না বলিয়া ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। পতঞ্জলির মতে ইহাই প্রকৃত যোগ। অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ, শুভ ও অশুভ কর্ম্মাশয় এবং জন্ম আয়ু ও সুখদুঃখভোগ—এই সকল বীজ, যোগ লাভ করিলে, বিনষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থায় বৃত্তিহীন সংস্কারমাত্রাবশেষ চিত্ত পুরুষের বিষয়ীভূত হয় না। কারণ বিবেকজ্ঞান (নিবৃত্তিমার্গীর পক্ষে) ও বিষয়ভোগ (প্রবৃত্তিমার্গীর পক্ষে), এই উভয় প্রকার পুরুষার্থ নিরুদ্ধচিত্তে বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া চিত্ত বিষয়হীন ও অব্যক্ত হইয়া পড়ে ও চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টা পুরুষ আপন ভাবে স্থিতিলাভ করেন।

এবার পতঞ্জলির নির্দ্দিষ্ট যোগভূমিগুলি আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব। সম্প্রজ্ঞাত যোগের চারিটি ভূমি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম ভূমিতে আরূঢ় অভ্যাসশীল যোগী প্রথম-কল্পিক নামে অভিহিত হন। ইহার জ্ঞানজ্যোতিঃ কেবলমাত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও বশীভূত হয় নাই। যাঁহারা যোগশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে চিত্তস্থৈর্য্যের সাধক দুই প্রকার প্রবৃত্তি মনে উদিত হইয়া

থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম বিষয়বতী প্রবৃত্তি ও দ্বিতীয়টির নাম বিশোকা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি। প্রথমাবস্থায় নানাপ্রকার দিব্য গন্ধ, দিব্য রস, দিব্য রূপ প্রভৃতির অনুভব হইতে থাকে—ক্রমশঃ চিত্ত স্থির হইতে থাকে, সংশয় দূর হয় ও প্রজ্ঞার উদয় হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, মণি, রত্ন প্রভৃতির আভারূপেও সাত্ত্বিক জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিষয়বতী বলিয়া প্রথম প্রকার প্রবৃত্তির অন্তর্গত হইলেও কিয়দংশে বিশোকা জ্যোতিষ্মতীর প্রকার বিশেষ। জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি দুই প্রকার—তন্মধ্যে একটি বিষয়বতী, যাহা ভাস্বর আকাশকল্প ব্যাপক বুদ্ধিসত্ত্বে স্থিতি-বৈশারদ্য হইতে চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রভারূপে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি অস্মিতা মাত্র, যাহা অস্মিতা ভাবে সমাধান বশতঃ নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের ন্যায় শান্ত ও অনন্ত। এই দ্বিতীয় প্রকার প্রবৃত্তিতে বিষয়বতী প্রবৃত্তির ন্যায় নানা প্রভা খেলে না। অস্মিতা রজঃ ও তমোগুণশূন্য সাত্ত্বিক জ্যোতিঃ। উভয় প্রকার বিশোকাকেই জ্যোতিষ্মতী বলা হইয়া থাকে। মনের জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোক যে কোন দূরবর্ত্তী, ব্যবহিত এবং সূক্ষ্ম পদার্থে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে দৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুটরূপে উদ্ভাসিত করা যায়। যোগের প্রথম ভূমিতে এই জ্যোতির উদয় হয় বটে, কিন্তু ইহা আয়ত্ত থাকে না বলিয়া ইহা দ্বারা সাধক অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না।

ক্রমশঃ প্রথমকল্পিক যোগী মধুমতী নামক দ্বিতীয় ভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ হন। এই অবস্থায় নির্ব্বিচার সমাধির পরিপক্কতা হয়, চিত্ত অধিকতর নির্ম্মলতা লাভ করে এবং ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয় হয়। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা উদিত হইলে সকল বিষয়েই যথার্থ জ্ঞান অধিগত হয়—তখন যোগী স্বয়ং অজ্ঞানজনিত তাপ হইতে মুক্ত হইয়া দুঃখনিমগ্ন সমগ্র জগতের সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ অনুভব করেন ও ঐ সকল দুঃখের কবল

হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য ইচ্ছা করেন। এই প্রজ্ঞাই আনন্দের উৎপাদক বলিয়া মধুপদবাচ্য। দ্বিতীয় ভূমিতে ইহার উদয় হয় বলিয়া এই ভুমিকে মধুমতী ভূমি বলা হইয়া থাকে। যোগী এই ভূমিতে আরোহণ করিলে দেবতাগণ নানা প্রকার প্রলোভনের জিনিষ দেখাইয়া তাঁহাকে যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। তখন সাধকের অন্তরে আসক্তি অথবা অহঙ্কার না জাগিলেই ঐ সকল প্রলোভন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যে প্রজ্ঞালোক দ্বিতীয় ভূমিতে উপলব্ধ হয়, উহা বিবেকজ-জ্ঞানের আংশিক বিকাশ মাত্র। ইহাকে যোগিগণ যোগ-প্রদীপ নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই প্রদীপের আলোকেই অবিদ্যাদি যাবতীয় ক্লেশের আবরণ তিরোহিত হয় এবং প্রাতিভজ্ঞানরূপে সর্ব্বজ্ঞত্বের উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় যোগীকে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে হয়। কারণ, বিষয়সম্বন্ধবশতঃ আসক্তি অথবা গর্ব্ব জাগিলেই পতিত হওয়ার আশঙ্কা। এই অবস্থায়ও ভূত ও ইন্দ্রিয় যোগীর বশীভূত হয় না। তবে তাহার স্থচনা হয় মাত্র। চিত্তসত্ত্ব প্রকাশস্বভাব বলিয়া সকল পদার্থদর্শনে সমর্থ। তথাপি তমোদ্বারা আবৃত থাকিলে দর্শন করিতে পারে না। যখন রজঃ চিত্তসত্ত্বকে উদ্‌ঘাটিত করে, তখন জ্ঞানের উদয় হয়—যেখানে বা যে বিষয়ে উদ্‌ঘাটিত করে, সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। রজঃ ও তমঃ—এই গুণদ্বয়ের উপচয়ই অশুদ্ধি, ইহাই আবরণাত্মক চিত্ত-মল। যখন অভ্যাস ও বৈরাগ্যবশতঃ এই মল দূরীভূত হয়, যখন চিত্তের অনভিভূত স্বচ্ছ স্থিতিপ্রবাহ (বৈশারদ্য) ঘটিয়া থাকে, তখন যোগীর অধ্যাত্মপ্রসাদ হয় ও সর্ব্বার্থবিষয়ক ক্রমানন্থরোধী শুদ্ধ ও পরিস্ফুট প্রজ্ঞালোক উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রাজ্ঞ অবস্থা। এই সময়ে প্রজ্ঞালোকে নিজেকে সর্ব্বোপরি দেখা যায় ও দুঃখমগ্ন সর্ব্বজগৎএর প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। ইহা সত্যময়ী বলিয়া

ঋতম্ভরা নামে অভিহিত হয়। এই প্রজ্ঞা বিশেষগ্রাহক বলিয়া শ্রুত ও অনুমানপ্রজ্ঞা হইতে বিশিষ্ট। কারণ, আগম ও অনুমান হইতে বস্তুর সামান্যধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, বিশেষ ধর্ম্ম জানা যায় না। লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশেষ জ্ঞান হয় বটে, তবে তাহাতে ভ্রম সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া, লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। এই সমাধিপ্রজ্ঞা হইতেই ভূতসূক্ষ্মগত ও পুরুষগত উভয় প্রকার বিশেষ জানা যায়। কারণ, পরমাণুতে পরমাণুতে স্বাভাবিক ভেদ আছে, পুরুষে পুরুষেও আছে। এই ভেদ সমাধিপ্রজ্ঞা ভিন্ন জানিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা নির্ব্বিচার সমাধির উৎকর্ষ হইতেই জন্মিয়া থাকে।

তৃতীয় ভূমিতে ভূত ও ইন্দ্রিয় উভয়ই জিত হইয়া যায়। পঞ্চভূতের প্রত্যেকটির স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব, এই পাঁচ প্রকার রূপ আছে। ইহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারিলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি আয়ত্ত হয়, দেহ বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় হয় এবং পঞ্চভূতের কোনটিই আপনাপন গুণ ও ক্রিয়া দ্বারা যোগীর গতিতে বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। আকার, গুরুত্ব, আবরণ, স্থৈর্য্য, কাঠিন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম এবং শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চবিশেষ—ইহাদের সমষ্টিকে স্থূল পৃথিবী বলে। স্নেহ, শৈত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম এবং শব্দ প্রভৃতি চারিটি বিশেষ (গন্ধহীন)—ইহাদিগকে স্থূল জল বলে। এই প্রকার শব্দাদি তিনটি বিশেষ এবং উর্দ্ধগতি, দাহকতা, লঘুত্ব, ভাস্বরতা প্রভৃতি ধর্ম্ম একসঙ্গে স্থূল অগ্নিরূপে বর্ণিত হয়। স্থূল বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এবং বক্রগতি, চাঞ্চল্য প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। শুদ্ধ শব্দ এবং সর্ব্বব্যাপকতা, অব্যূহ ও অবিষ্টম্ভ—ইহাদের সমষ্টি স্থূল আকাশ। ভূতগণের দ্বিতীয় রূপ স্থূলরূপের সামান্য ভাব। স্থূলভাবসকল এই সামান্য ভাব বা স্বরূপেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা

No. ... BANARAS

মাত্র। মূর্ত্ততা, স্নিগ্ধতা, উষ্ণতা, পরিণামিতা ও অবকাশদান—ইহারা যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হয়। এই স্বরূপ ও স্থূলভাবের সমষ্টিকে সাধারণতঃ দ্রব্য বলা হয়। ভূতগণের তৃতীয় বা সূক্ষ্মরূপ তন্মাত্র। তন্মাত্রসকল পরস্পর মিলিত হইয়া পরমাণুরূপে পরিণত হয়। পরমাণু হইতেই দ্রব্য গণনা হইয়া থাকে—কিন্তু ভূতগণের সূক্ষ্মরূপ দ্রব্যাত্মক নহে। প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতিশীল সত্ত্বাদি গুণত্রয় ভূতগণের চতুর্থরূপ। যোগিগণ ইহাকে অন্বয়নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ত্রিগুণের মধ্যে যে ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থতা রহিয়াছে, তাহাই ভূতগণের পঞ্চমরূপ, ইহার নামান্তর অর্থবত্তা। পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত এবং যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ সর্ব্বত্রই ত্রিগুণ অনুস্যূতরূপে বর্ত্তমান বলিয়া অর্থবত্তা না আছে এমন কোন পদার্থই নাই। যোগিগণ সংযমের দ্বারা ভূতগণের প্রত্যেকটি রূপকে পৃথগ্‌ভাবে সাক্ষাৎকার করেন এবং আয়ত্ত করেন। ইহারই নাম ভূতজয়। ইহার ফলে ভূতপ্রকৃতি সকল বশীভূত হইয়া যোগীর সঙ্কল্পের অনুসরণ করে। অণিমাদি সিদ্ধি ও কায়সিদ্ধি প্রভৃতি ভূতজয়ের ফলমাত্র। নিজের দেহাদিকে অণুরূপে সঙ্কুচিত করিবার সামর্থ্যের নাম অণিমা। দেহাদিকে ইচ্ছানুরূপ লঘু অথবা বৃহৎ করিবার সামর্থ্যকে যথাক্রমে লঘিমা এবং মহিমা বলা হয়। লঘিমা দ্বারা শরীর প্রভৃতি এত হাল্কা হয় যে, অনায়াসে আকাশে বিচরণ করা যায়। যে কোন জিনিষ যত দূরেই থাকুক না কেন, তাহা সর্ব্বদাই যোগীর সন্নিহিত—ইচ্ছামাত্রই যোগী তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহার শাস্ত্রীয় নাম প্রাপ্তি। পঞ্চভূতের স্থূল রূপকে সংযম দ্বারা জয় করিলে এই চারিটি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়। ভূতগণের দ্বিতীয়রূপ আয়ত্ত হইলে প্রাকাম্য নামক সিদ্ধির উদয় হয়। এই অবস্থায় যোগীর রূপকে

ভূতগণের স্বরূপ বাধা দিতে পারে না। যেমন মূর্ত্তি অথবা কাঠিন্য পৃথিবীর স্বরূপ, কিন্তু যোগী ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে ঠিক জলের মতন ডুবিতে এবং উঠিতে পারেন—পৃথিবীর কাঠিন্য বশতঃ তাঁহার কোন প্রকার বাধা উৎপন্ন হইবে না। এই প্রকার অন্যান্য ভূত সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। * ভূতগণের সূক্ষ্মরূপ সংযমের দ্বারা অধীন করিতে পারিলে বশিত্ব নামক সিদ্ধির উদয় হয়। এই সিদ্ধি লাভ করিয়া যোগী পঞ্চভূত ও সকল প্রকার ভৌতিক পদার্থের অধীশ্বর হইতে পারেন, অথচ নিজে কাহারও বশীভূত হন না। তন্মাত্র ও পৃথিব্যাদি পরমাণুর বশীকরণ নিবন্ধন সকল কার্য্যই বশীভূত হয়। যে কোন বস্তুকে যে কোন ভাবে রাখিতে ইচ্ছা করা যায়, তাহা তেমনি ভাবেই থাকে। ভূতগণের চতুর্থরূপ আয়ত্ত করিতে পারিলে ঈশিতৃত্ব নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত হাওয়া যায়। এই অবস্থায় ভূত ও ভৌতিক পদার্থের মূল প্রকৃতি আয়ত্ত হয় বলিয়া তাহাদিগকে ইচ্ছানুরূপ সৃষ্টি ও বিনাশ করিতে সামর্থ্য জন্মে এবং তাহাদের সংস্থান ও আকারাদির পরিবর্ত্তনও করিতে পারা যায়। ভূতগণের অর্থবত্তারূপ পঞ্চমরূপ স্বায়ত্ত হইলে যোগিগণ যত্রকামাবসায়ী অথবা সত্যসঙ্কল্প অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পাদন করিবার সামর্থ্য জন্মে—ইহাকেই জৈবিক ইচ্ছাশক্তি বলে। এই অবস্থায় যোগী যে কোন বস্তুকে যে কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য সঙ্কল্প দ্বারা নিয়োগ করিতে পারেন—বিষয় তখন অমৃতের কার্য্য করে, অমৃতও বিষের কার্য্য করে। যোগীর সঙ্কল্প অনুসারে সকল বস্তুরই শক্তির বিপর্য্যয় হইতে পারে। শক্তির পরিবর্ত্তন করিতে

---

* যোগিদেহ প্রস্তরে ঢুকিয়া যাইতে পারে, জলে ক্লিন্ন হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, বায়ুতে চালিত হয় না, অনাবৃত আকাশেও অদৃশ্য থাকিতে পারে। এমন কি, সিদ্ধগণও যোগীর দেহ দেখিতে পান না। এই সবই দ্বিতীয় ভূতরূপজয়ের ফল।

পারিলেও যোগিগণ পদার্থের বিপর্য্যয় করেন না। জাতি, দেশ, কাল ও অবস্থার ভেদবশতঃ শক্তি সকলের স্বভাব নিয়ত নয় বলিয়া যোগী ইচ্ছামাত্রে শক্তির বিপর্য্যয় সাধন করিলেও বিশেষ কোন হানি হয় না। কারণ তাহাতে পরমেশ্বরের আজ্ঞা বা আদি-সঙ্কল্প লজ্ঘিত হয় না। কিন্তু পদার্থের বিপর্য্যয় সাধনে আদি-সঙ্কল্প খণ্ডিত হয় বলিয়া যোগী কখনও তাহা করেন না অথবা করিতে চেষ্টা করেন না।

এবার ইন্দ্রিয় জয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। ভূতের যেমন পাঁচটি অবস্থা আছে, ইন্দ্রিয়েরও তেমনই পাঁচটি অবস্থা আছে—যথা গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্তা। গ্রাহ্যবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বিষয়াকার পরিণামকে আলোচন বা গ্রহণ বলে। সামান্যবিশেষাত্মক দ্রব্যই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারের বিষয়ীভূত বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়। অবশ্য বৌদ্ধ যোগিগণ এ মত স্বীকার করেন না—তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয় সামান্য-ভাবকে আর মনঃ বিশেষ ভাবকে গ্রহণ করে। কিন্তু পাতঞ্জল যোগিগণ বলেন যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিশেষ ভাবের গ্রহণ না হইলে মনঃ দ্বারা তাহার অনুব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ মনঃ বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বিতীয় রূপকে স্বরূপ বলে। অহঙ্কারের সাত্ত্বিকাংশ হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ইন্দ্রিয়ের সামান্য ও বিশেষ উভয় ভাবেই প্রকাশাত্মকতা রহিয়াছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে যে করণত্ব আছে তাহাই ইন্দ্রিয়ের সামান্য ভাব। এক এক ইন্দ্রিয় এক এক প্রকার বিষয়কে গ্রহণ করে—ইহাই তাহার বিশেষ ভাব। অতএব প্রকাশাত্মক চিত্তসত্ত্বের যে সামান্য ও বিশেষ ভাবের সমষ্টি—যাহা অযুতসিদ্ধ ভেদানুগত সমূহ বা দ্রব্যরূপে পরিচিত—তাহাই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ। অস্মিতা অথবা অহঙ্কার ইন্দ্রিয়ের তৃতীয়-রূপ। ইহা সামান্য—প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ইহার বিশেষ অভিব্যক্তি।

অন্বয় বা প্রকাশাদিশীল গুণত্রয় ইন্দ্রিয়ের চতুর্থরূপ। এই গুণত্রয় ভূতেরও চতুর্থরূপ—একথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ত্রিগুণ গ্রাহ্য ও গ্রহণভেদে দ্বিবিধ রূপবিশিষ্ট—তন্মধ্যে গ্রাহ্যাংশ হইতে পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চভূত ও ভৌতিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, আর উহার গ্রহণাংশ হইতে অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। অর্থবত্তা ভূতসকলের ন্যায় ইন্দ্রিয়েরও পঞ্চমরূপ। সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের পঞ্চরূপ বশীভূত হইলে যোগী মধুপ্রতীক নামক তিন প্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার দেহও মনের ন্যায় ক্ষণকালের মধ্যে সুদূর দেশে গমন করিতে সমর্থ হয়। ইহাকে মনোজবিত্ব বলে। ইন্দ্রিয় সকল দেহকে আশ্রয় না করিয়াও যোগীর অভীষ্ট দেশে, কালে ও বিষয়ে বৃত্তিলাভ করে বা কার্য্য করে। তখন বহুদূরস্থ বস্তুর দর্শন ও আঘ্রাণাদি এবং শব্দাদির শ্রবণ প্রভৃতি হইয়া থাকে, দূরবর্ত্তী অতীত ও অনাগত কালের বিষয়ও সাক্ষাৎকৃত হয় এবং অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বস্তুসকলের দর্শন হয়। তৃতীয় সিদ্ধি প্রধান-জয় বা প্রকৃতির যাবতীয় বিকারের বশীকরণ। আমরা সংক্ষেপে তৃতীয় যোগভূমির বর্ণনা করিলাম। এই ভূমিতে ভূত ও ইন্দ্রিয় জয়ের ফলে পরিচিত্তজ্ঞান প্রভৃতি অসংখ্য-প্রকার অবান্তর সিদ্ধিও আয়ত্ত হয়। বিশোকা হইতে পরবৈরাগ্য পর্য্যন্ত অবস্থা এই ভূমিতে অধিকৃত হয় না।

চতুর্থ ভূমিতে চিত্তসত্ত্ব হইতে রজঃ ও তমোমল অপগত হয় বলিয়া চিত্ত শান্তির আলয় হয় ও যোগীর বশীভূত হয়। তখন উহা সত্ত্ব ও পুরুষের বিবেকখ্যাতিতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ব্বভাবের অধিষ্ঠাতৃত্ব জন্মে। ইহা বিশোকানাম্নী সিদ্ধি। যোগী তখন স্বামিত্বলাভ করেন—সর্ব্বাত্মক গুণ সকল জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপে স্বামীর নিকট অশেষ দৃশ্য ভাবে সাজিয়া উপস্থিত হয়। ইহা ক্রিয়ৈশ্বর্য্য।

তদ্বৎ ঐ সকল গুণ শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া তখন যোগীর নিকটে বিবেকজজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই জ্ঞানে ক্রম থাকে না—সকল ভাবই যুগপৎ প্রকাশিত হয়। ইহা জ্ঞানৈশ্বর্য্য। বিশোকা সিদ্ধির অধিকারী যোগী সর্ব্বজ্ঞ ও বশিরূপে জগতে বিহার করিয়া থাকেন।

পরে এই সিদ্ধির প্রতিও বৈরাগ্য হইলে বৈরাগ্যের পূর্ণতা হয়। তখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়।

এখন সহজেই বুঝা যাইবে যে প্রাকৃতিক সিদ্ধি প্রকৃতিবিযুক্ত স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ পুরুষের থাকে না। ঐ সকল সিদ্ধি চিত্তসত্ত্বের ধর্ম্ম—চিত্ত অব্যক্ত হইয়া গেলে উহারা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ঈশ্বরের উপাধি বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃতির অতীত—উহা কখনও অব্যক্ত হয় না। ঈশ্বরোপাসক ভক্ত যোগী পরমেশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হইলে পারমৈশ্বর্য্যরূপা মঙ্গল্য শক্তির অধিকারী হন—উহা মহাবিভূতি ও অবিনশ্বর।

সুতরাং পাতঞ্জল দর্শনোক্ত বিভূতি যোগের চরম বিভূতি নহে। পূর্ণৈশ্বর্য্যই মহাবিভূতি, তাহা আরও ঊর্দ্ধে। আগমে সাংখ্যোক্ত পুরুষের উপরে একাদশ তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে—এই সকল তত্ত্ব ক্রম-সাধনায় জয় করিতে পারিলে তবে পূর্ণতায় উপনীত হইতে পারা যায়। পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী আপন স্বাতন্ত্র্য বশতঃ আণবমল, মায়ামল ও কর্ম্মমল—ক্রমশঃ এই ত্রিবিধ মল পরিগ্রহ করিয়া পশু সাজিয়া থাকেন, আবার এই সকল মল অপগত করিয়া স্বরূপে উপস্থিত হন। আণবমল দ্বারা তাঁহার সঙ্কোচ হয়, তিনি অণুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পরে মায়াপ্রভাবে অণু আত্মবিস্মৃত হইয়া মায়াবৃত হইয়া পড়ে। তখন কর্ম্মমল তাহাতে সংলগ্ন হয়—সে কর্ত্তা সাজে, ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া

কার্য্য করে। প্রথম মলমাত্র আবরণে বিজ্ঞানাকল অবস্থা, প্রথম ও দ্বিতীয় মলে প্রলয়াকল অবস্থা এবং মলত্রয়ে সকল অবস্থার উদয় হয়। সাংখ্যের কৈবল্য এক জাতীয় বিজ্ঞানাকল অবস্থামাত্র—তখনও আণবমল থাকে, তাই প্রকৃত যোগ-সিদ্ধি হয় না।

কৈবল্য হইলেই যে জীব পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হইবে, তাহা বলা যায় না। কৈবল্যে পুরুষ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রাকৃতিক গুণসম্বন্ধ হইতে নির্মুক্ত হয়—তাহাই সাংখ্যভূমিতে যোগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যে ঈশ্বরের সহিত যথার্থ যোগ, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। শ্রদ্ধা হইতে ক্রমশঃ সমাধি ও প্রজ্ঞার উদয় হয়—পরে প্রজ্ঞার নিরোধ হইয়া পুরুষ স্বরূপস্থিতি লাভ করে। ঈশ্বরের সহিত পুরুষের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ বা ঐ প্রকার অন্য কোন সম্বন্ধ পাতঞ্জলে অঙ্গীকৃত হয় নাই। সুতরাং পুরুষের আত্মস্থিতি ঠিক ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বর-যোগ নহে।

এই জন্যই পাশুপত যোগিগণ চিত্তদ্বারা আত্মা ও ঈশ্বরের সম্বন্ধকেই যোগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যোগ ক্রিয়া ও ক্রিয়োপরম ভেদে দুই প্রকার। পতঞ্জলির মুক্তি কেবলমাত্র দুঃখ-নিবৃত্তি। পাশুপত যোগিগণ বলেন যে পরমৈশ্বর্য্য-যোগরূপ মুক্তি উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ ঐ অবস্থায় সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ ত হয়ই, উপরন্তু জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়। জ্ঞানরূপা শক্তি এক হইলেও বিষয় ভেদে পাঁচ প্রকার বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ক্রিয়াশক্তি তিন প্রকার—মনোজবিত্ব, কামরূপিত্ব ও বিকরণধর্ম্মত্ব। যে কোন কার্য্য ইচ্ছামাত্র সম্পাদন করিবার সামর্থ্য মনোজবিত্ব। কর্ম্মের সহকারিতা ব্যতিরেকে কেবল মাত্র ইচ্ছা বশতঃ যে কোন প্রকার রূপনির্ম্মাণ করিয়া তাহার অধিষ্ঠান করার সামর্থ্য কামরূপিত্ব। দেহেন্দ্রিয় ব্যতীত নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য লাভই বিকরণধর্ম্মত্ব। এই জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরই নামান্তর মাহেশ্বর্য্য—ইহা

পরমেশ্বরে স্বাভাবিক ভাবে সর্ব্বদাই আছে। ইহা হইতে অবশ্যত্ব, অনাবেশ্যত্ব, অবধ্যত্ব, অভয়ত্ব, অক্ষয়ত্ব, অজরত্ব, অমরত্ব, অপ্রতীঘাত, মহত্ত্ব ও পতিত্ব, এই দশ প্রকার সিদ্ধির আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হইলে যোগী স্বাধীনতা লাভ করেন, কাহারও অধীন থাকেন না—ইহাই অবশ্যতা। যোগীর জ্ঞানকে অন্য কেহ অভিভূত করিতে পারে না—ইহার নাম অনাবেশ্যতা। যোগীকে কেহ বধ করিতে পারে না (অবধ্যত্ব), কোন ভয় আক্রমণ করিতে পারে না (অভয়ত্ব), যোগীর ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধ কখনও ছিন্ন হয় না (অক্ষয়ত্ব), তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য কখনও হয় না (অজরত্ব), তাঁহার মৃত্যু নাই (অমরত্ব), যোগীর ইচ্ছাকে স্বয়ং মহেশ্বরও প্রতিহত করেন না (অপ্রতীঘাত), যাবতীয় জীবের ঐশ্বর্য্য হইতে যোগী অধিক ঐশ্বর্য্য লাভ করেন (মহত্ত্ব), ও তিনি স্বামিত্ব প্রভাবে যে কোন জীবকে যে কোন কার্য্যে পরিচালিত করিতে সমর্থ হন (পতিত্ব)।

বলা বাহুল্য, পুরুষের কৈবল্যাবস্থায় পতঞ্জলির মতে কোন ঐশ্বর্য্য থাকে না। সত্ত্বশুদ্ধি হইতেই ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়। সত্ত্ব হইতে পুরুষের বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান প্রভৃতি সবই নিবৃত্ত হয়। সুতরাং পাতঞ্জল যোগী ও পাশুপত যোগীর অবস্থা অত্যন্ত বিলক্ষণ। বস্তুতঃ কৈবল্যাবস্থাতেও জীবের পরমেশ্বরসম্বন্ধের অভাব বশতঃ ঐশ্বর্য্যের উদয় হয় না। তবে নিরঞ্জন ভাবের উপলব্ধি হয় বটে। * পাতঞ্জল শাস্ত্রে

* পশু সাঞ্জন ও নিরঞ্জন এই দুই প্রকার। যাহার শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাকে সাঞ্জন পশু বলে। সাঞ্জন পশুই সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করে। আট প্রকার দেবতা, পাঁচ প্রকার তির্য্যগ্‌যোনি ও মনুষ্য, এই চতুর্দ্দশপ্রকার জীব সাঞ্জন বলিয়া অভিহিত হয়। নিরঞ্জন পশু তিন প্রকার—যথা, সংহৃত, কৈবল্যগত ও নিষ্ঠাযোগযুক্ত। সুতরাং কৈবল্যলাভ করিলেই যে ঐশ্বর্য্য হয়, তাহা নহে। দীক্ষা দ্বারা পাশ বিনাশ না হইলে পরমেশ্বরসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ-নিষ্ঠা-যোগ হয় না।

পুরুষ প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া কি প্রকারে পুরুষ-বিশেষ বা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগলাভ করিতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত পরিস্ফুটভাবে বর্ণিত হয় নাই। পাশুপত যোগিগণ ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ লাভ করিবার উপায় ও তৎফল বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাদের মতে পশু তত্ত্বতঃ পরমেশ্বর বা পতি হইতে পৃথক্। এমন কি পশুত্বের হানি—অর্থাৎ মহেশ্বরের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধ বা যোগ বশতঃ পশুত্বের অত্যন্ত নিরোধ—হইলেও পশুর ধ্বংস হয় না। কারণ পরমেশ্বরের ন্যায় পশুও নিত্য। মূলাজ্ঞান কাটিয়া গেলে চিত্ত নিশ্চলভাবে ঈশ্বরে স্থিতিলাভ করে। ইহাই নিষ্ঠাযোগ বা প্রকৃত যোগিভাব। তখন তাঁহার নয়টি লক্ষণ প্রকাশ পায়—তিনি অসঙ্গী, যোগী, নিত্য, অজ, মৈত্র, এক, ক্ষেমী, নিষ্ক্রিয় ও বীতশোক হন। তিনি মুক্ত হন ও সমস্তদুঃখবীজ রহিত হইয়া ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণৈশ্বর্য্যযুক্ত হন।

প্রত্যভিজ্ঞা ও স্পন্দ শাস্ত্রের দিক্ হইতে আমরা আগমের আলোচনা এখানে স্থানাভাব বশতঃ করিতে পারিলাম না। পাঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণবাগম ও শাক্ত আগমের এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাধনশাস্ত্রের আলোচনাও এখানে করা সম্ভবপর হইল না। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের উদয় মায়ার অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত হয় না। যোগিগণ পরমপদার্থে যুক্ত হইয়া জগতের কল্যাণার্থ এবং স্বেচ্ছাক্রমে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলাকথা উত্তরার্দ্ধ সমাপ্ত হইলে আমরা উপসংহার কালে একবার আলোচনা করিয়া এই উপক্রমস্থ বিবৃতির সহিত সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার অসংখ্য বিভূতি নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত বিভূতির সঙ্গে তাহার সঙ্গতিস্থাপন যথাসম্ভব সংক্ষেপে করিবার জন্য যত্ন করা যাইবে।

কিন্তু লীলাকথার পাঠক শুধু বিভূতি দেখিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না। যাঁহার এই প্রকার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার অসাধারণ মাধুর্য্য—দয়া, প্রেম, সহৃদয়তা, ক্ষমাদি কোমল ভাবনিচয়—দেখিয়াও মোহিত হইবেন। তিনি একাধারে সর্ব্বভাবের সমন্বয় দেখিতে পাইবেন। অধিক লেখা আমার পক্ষে বাহুল্য মাত্র।

আমি নিজের কথা অতি অল্পই বলিয়াছি—দুই চারিটি ব্যাপারের কথা প্রসঙ্গতঃ ব্যাখ্যানবৈশদ্যের জন্য উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। গুরু-শক্তি এই অকিঞ্চন মলিন হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব ও অলৌকিক আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছে, তাহার রহস্য বাহিরে প্রকাশনীয় নহে। যে আমার মতন ক্ষুদ্র ও মলিন, সেও যে করুণাময়ের বিশ্বপাবনী শক্তির অধিকারবহির্ভূত নহে, ইহা আমি আজ স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে স্পর্দ্ধা করিয়াই বলিতে পারি। ইহার অধিক বলিবার ইচ্ছা করা আমার পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে প্রগল্‌ভতা মনে করি।

আমার শত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া বিজ্ঞগণ গ্রন্থনায়কের ঐশ্বরিক চরিত্রে মনোনিবেশ করিয়া লাভবান্‌ হইবেন, ইহাই সকলের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা।

"বিশুদ্ধানন্দ কানন"
৺কাশীধাম
১৫ই পৌষ, ১৩৩৭।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

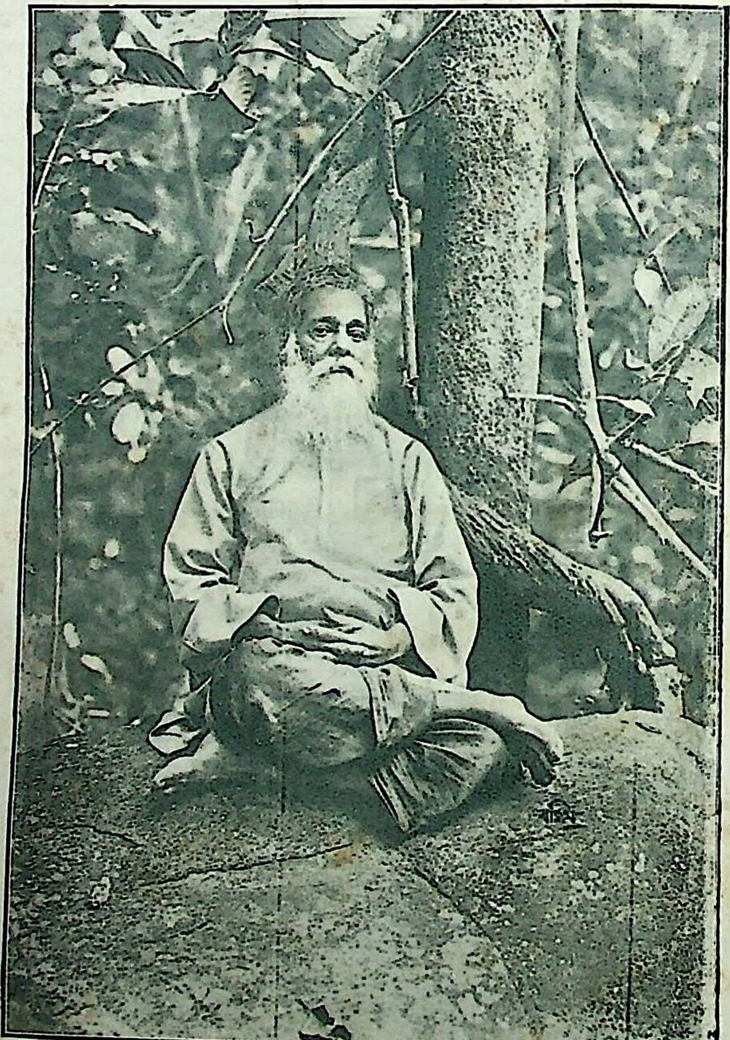

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেব।

3/283

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

লীলা-কথা

(পূর্ব্বার্দ্ধ)

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী

অবসর-প্রাপ্ত পুলিস ইন্‌স্পেক্টর—

পোঃ দামোদরবাটি, জেলা বাঁকুড়া

আমি ইং ১৮৮৯ সালে পুলিস বিভাগে অনিচ্ছার সহিত প্রবিষ্ট হইয়া ২৬ বৎসর কাল চাকরি করিয়া পরমহংসদেবের আদেশে পেন্সন গ্রহণ করি। ১৯০০ সালে আমি ইঁহার সন্ধান পাইয়াছিলাম। যদিও ইঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অনেক কথা শুনিয়াছিলাম, তথাপি এতদিন দর্শন লাভের অবসর ঘটে নাই। ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি শুভক্ষণে মেমারির নিকট জামালপুর থানা হইতে আউসগ্রাম থানায় বদলি হই। তখন গুষ্করা স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। তিনি ধর্ম্ম-চর্চ্চাতেই প্রায় অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। সেই সময় পরমহংসদেব গুষ্করায় ৺হরিশ্চন্দ্র চোঙ্গদার মহাশয়ের কাছারি বাড়ীতে থাকিতেন। সেখানে থাকিয়া সর্ব্বজনের সমক্ষে কি প্রকার কঠোর তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেন,

তাহা অনেকেই জানিত না। এমন কি, রাখাল বাবুও তাঁহার নিকট যাতায়াত করিয়াও কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। আমি তখন সাধু-সন্ন্যাসীর অন্বেষণ করিয়া পাগল। আমার সন্তানাদি না হওয়ায় আমি অনেক প্রকার দৈব কর্ম্ম করিয়াছিলাম ও ঐ উপলক্ষে বহু সাধুর কৃপা-ভিখারী হইয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া একদিন রাখাল বাবু বলেন— "গুস্করায় একজন ভাল লোক আছেন—তিনি কবচ দেন, কোষ্ঠীর বিচার করেন। যাহাকে যাহা দেন, বা বলেন, সফল হয়। আমি তাঁহাকে তোমার কথা বলিব।" তিনি তাঁহাকে আমার কথা বলিয়াছিলেন। বাবাজী ঈষৎ হাসিয়াছিলেন। ইহার ১০।১৫ দিন পর একদিন আমি গুস্করা ষ্টেশনে রেলে চড়িয়া বর্দ্ধমান যাইতেছি,—এমন সময় গুস্করার দফাদার আমাকে বলিল—"ডাক্তার বাবু (বাবাজী তখন গুস্করায় ডাক্তারী করিতেন) আপনাকে অনেকক্ষণ দেখিতেছিলেন। বলিলেন—এই দারগাটি আমার বহু দিনের পরিচিত—এখন সব ভুলিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম—দারগা বাবুকে ডাকিব কি? তাহাতে তিনি বলিলেন—না না, সময়ে হবে।"

ইহার কিছুদিন পরে আমি একদিন বর্দ্ধমানে যাইতেছি— গাড়ীতে গুস্করা-নিবাসী কালীপদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "ডাক্তার বাবু প্রায় আপনার কথা বলেন। তাঁহার সঙ্গে কি আপনার জানা-শোনা আছে?" আমি বলিলাম—"আমার মনে হয় না।" এই প্রকারে কিছু দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু

তখনও দর্শনের সুযোগ হয় নাই। অথচ মনে হইত, যেন তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

এই সময় হঠাৎ আমি সাতগেছে থানায় বদলি হই। তখন আর দর্শন পাইতাম না। ৩।৪ মাস পরে আমি পুনরায় অল্প দিনের জন্য আউসগ্রাম থানায় আসি। ইহা ১৯০২ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসের কথা।

এই সময় আউসগ্রাম থানার অন্তর্গত দীর্ঘনগর গ্রামের শ্মশানে জগদানন্দ ও তাঁহার শিষ্য শিবানন্দ নামক দুইজন ব্রহ্মচারী আশ্রম করিয়া সাধনা করিতেন। আমাকে উভয়ে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমি তখন অসুখে অত্যন্ত ভুগিতেছিলাম।

এই দুই মহাত্মার অপরূপ রূপ ও আশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং গুণ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

শিষ্য শিবানন্দ যেন গুরু অপেক্ষা উন্নত ও কঠোর তপস্বী ছিলেন। আমি প্রায় তাঁহাদের আশ্রমে যাইয়া আনন্দ করিতাম। তাঁহাদের আশ্রম এখনও আছে। ৺শিবানন্দের পত্নী আশ্রমে থাকিতেন। জগদানন্দ ঐ আশ্রমেই দেহ রাখেন। শিবানন্দ কিছুদিন একাই থাকেন। এই সময় আমি শিষ্য হইবার জন্য তাঁহার আশ্রমে ঘটনাচক্রে দুই তিন দিন অবস্থান করি। সেই সময় তিনি আমাকে সস্নেহে বলেন, "উপেন্দ্র বাবা, আমি তোমার গুরু নই। তোমার গুরু ভোলানাথ। বাবা, রত্ন কাপড়ে ঢাকা আছে। গুহ্বরার

বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামী তোমার গুরু হইবেন। তিনি প্রস্তুত আছেন। শীঘ্র তুমি তাঁহার দর্শন লাভ করিবে।”

এই সময়ের দুইটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি— একদিন আমি ও কালনার ইন্‌স্পেক্টর বাবু যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উভয়ে শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে যাই। উক্ত ইন্‌স্পেক্টর বাবু প্রত্যহ পদ্মফুল আনাইয়া রাত্রে মা ভবতারিণীর পূজা করিতেন। আমরা আশ্রমে পৌঁছিলে ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া প্রসাদ খাইতে বলেন। একটি ছোট ঘরের মধ্যে আহার করিতেছি, হঠাৎ দুইটি বৃহৎ সর্প (শ্বেত খরিশ) ঘরের কোণ হইতে বাহির হইয়া আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। দেখিয়া আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। শিবানন্দ ব্রহ্মচারী দরজার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। আমাদিগকে উঠিতে দেখিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন, “বস বস, তোমরা খাও, ওরা এখন আস্থক।” বলিয়া হাতে করিয়া সর্প দুইটিকে ঠেলিয়া দিলেন। বলিলেন, “যাও যাও, তোমরা আবার কেন এমন সময় এলে?” তাহারা হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

আর একটি ঘটনা এই। শিবানন্দ প্রভুর সহিত ঐ আমার শেষ দেখা। তাহার পর তিনি ৺কাশীধামে গিয়া, পরিব্রাজকাচার্য্য শিবানন্দ পরমহংস উপাধি পাইয়া কিছুদিন পরে স্ব-ইচ্ছায় ৺কাশীলাভ করেন। গুরুদেবের মুখে

শুনিয়াছি, তিনিও তখন শিবানন্দের নিকট ছিলেন। দিন স্থির করিয়া সেই দিন দেহত্যাগ করেন।

কার্য্যগতিকে আমি একদিন তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে আশ্রমে প্রসাদ পাইতে বলেন। আমি বলিলাম—"নিকটবর্ত্তী আলগ্রাম দেয়াসা গ্রামে একটু কাজ আছে। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে শেষ করিয়া আসিয়া প্রসাদ লইব।" তিনি বলিলেন—"আর আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।" তাহাই ঘটিল। এ জীবনে তাঁহার সহিত আর দেখা হইল না। আমার কাজ সারিতে প্রায় বৈকাল হইয়া গেল। ফেরত আসিয়া খোঁজ করিয়া শুনিলাম, তিনি এড়াল-বাহাদুরপুরে বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী গিয়াছেন। আমার জেদ চাপিল—ঘোড়ায় চড়িয়া এড়াল গ্রামে গেলাম। যাইয়া শুনিলাম, তিনি শুয়াতাগ্রামে সাতু বাবুর বাড়ী গিয়াছেন। তখন রাত্রি হইয়াছে—তথায় না গিয়া থানায় ফিরিয়া আসিলাম। মনে করিলাম, আবার একদিন আসিয়া সাক্ষাৎ করিব। ইতিমধ্যে ৺কাশীধামে যাইয়া তিনি দেহ রাখিলেন। অন্তরের দুঃখ অন্তরেই রহিয়া গেল।

ইনি আশ্রম ছাড়িয়া যাওয়ার পর আমি একদিন বন পার হইয়া গুষ্করায় ট্রেণ ধরিবার জন্য যাইতেছি। দেখিলাম, জঙ্গলের দক্ষিণ দিক্ হইতে একটি সাধু বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন। আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"উপেন্দ্র, ভাল আছ?" আমি দেখিয়া চমকিয়া

গেলাম। কোথায় দেখিয়াছি, ঠিক মনে হইতেছে না, অথচ বেশ মুখ-চেনা, যেন যাঁহাকে এতদিন ধরিয়া খুঁজিতেছিলাম, ইনি তিনিই। তিনি বেশি কথা না কহিয়া উত্তর দিকের জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। আমি অশ্বপৃষ্ঠে ভাবিতে ভাবিতে গুষ্করা চলিয়া গেলাম। মনে করিলাম, এখানকার বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। কিন্তু বিধি না ঘটাইলে ঘটিবার নহে। তাই বিলম্ব ঘটিতে লাগিল।

তবে বুঝিলাম, শুভদিন আমার অতি-নিকট।

১৯০২ সালের মে মাসে কোন সরকারি কার্য্য উপলক্ষে বেলা ৯।১০ টার সময় শুভদিনে মাহেন্দ্রক্ষণে আমি গুষ্করায় পৌঁছি। তথাকার জমিদার তারাপ্রসন্ন চোঙ্গদার মহাশয়ের বাড়ীতেই কাজ ছিল। আমার থাকিবার স্থান কোথায় হইবে, সেই কথা হইতেছে, এমন সময় গুষ্করা গ্রামের ৺কালীপদ ঘোষের ভ্রাতা মাহাতাব ঘোষ আমাকে সঙ্গে করিয়া কাছারি বাড়ীতে লইয়া গেল। তখন আমার মস্তকোপরি মা শুভ-শঙ্করী উড়িতেছেন—ভগবান্ লাভ হইবে। আমার হৃদয়ের ধন, আমার হারানিধি, মা আজ আমাকে দিবেন—তারই আয়োজন। চারিদিকে শুভলক্ষণ দেখিতে দেখিতে আমি পশ্চিম মুখে কাছারির সদর দরজা পার হইলাম। দেখিলাম—সম্মুখে পুষ্পোদ্যান, নানাজাতীয় ফুল ফুটিয়াছে। নিকটে একটি বৃহৎ বাদাম বৃক্ষ। বারান্দায় একটি কৌপীন শুকাইতেছে। সেই শুভক্ষণে বারান্দায়

পদার্পণ করিতেই হঠাৎ একটি সুঘ্রাণ আমার নাকে প্রবেশ করিল। মাহাতাব পাইল কিনা, জানি না। আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তখন জানি না, যে আমার ভবপারের কাণ্ডারী তরী লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

আমি দেখিলাম দুইটি কুঠরী—একটি পূর্ব্বদ্বারী ও অপরটি পশ্চিমদ্বারী, মধ্যে বৃহৎ চাতাল। চাতালের মধ্যে দুইটি তক্তাপোষ। দক্ষিণদিকে বারান্দা। উত্তর দেওয়ালে দুইটি বড় বড় জানালা তক্তাপোষের সঙ্গে মেশামেশি হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদ্বারী ঘরের উত্তরদিকের কোলঙ্গায় তাম্রকুণ্ডে বিল্বপত্র ও স্নান-জল রহিয়াছে। পূর্ব্বদ্বারী ঘরের দরজার নিকটবর্ত্তী তক্তাপোষে আমি বসিলাম। যেমন বসিয়াছি, অমনি সেই ঘরের নৈঋর্ত কোণে একটি মহাপুরুষ আমার দিকে ঈষৎ হাস্য করিয়া কৃপা ও স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন—"ভাল আছেন ?" দীর্ঘ ও উন্নত ললাট, কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রু, উজ্জ্বল নেত্রযুগল—আমি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বুঝিলাম, ইনিই সেদিন জঙ্গল মধ্যে "উপেন্দ্র, ভাল আছ" বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন, ইনিই আজ আবার "ভাল আছেন, ভিতরে আসুন" বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। আমার চক্ষু তাঁহার উপর পতিত হইল—ক্ষণকাল বাহিরে আর তিষ্ঠিতে পারিলাম না। যেন লোহাতে চুম্বক টানিতে লাগিল। লাফাইয়া ঘরের মধ্যে গেলাম। ঐ ঘরের পশ্চিম ধারের পাইখানা ঠাকুর ব্যবহার করিতেন। ঘরের উত্তরে

একটি বড় পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর উত্তরে কিছু মাঠ পার হইয়া নদী। নদীর ধারে শ্মশানে ঠাকুর সাধনা করিতেন। ঐ স্থান তিনি আমাকে দেখাইয়াছিলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া কি স্বর্গীয় গন্ধ—কি অপরূপ পদ্ম-গন্ধ, আমাকে মোহিত করিয়া ফেলিল! আমি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছি যে, বাহ্যজ্ঞান নাই বলিলেই হয়। তিনি যে কত কথা, কি কি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কানে একটিও গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। বলিলেন, "পাগল আর কি।" যেন ভাব চাপিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া তক্তাপোষের উপর বসিলেন। ভাবিলেন, উপেন্দ্র বুঝি এখনই অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। বাহিরে আসিয়া মাহাতাবকে ডাক দিয়া বলিলেন—"দারগা বাবুর জন্য শীঘ্র জল্ খাবার আন। হুঁকা কোথা? এই খানেই মাগুর মৎস্যের ঝোল ভাত সকাল করিয়া বন্দোবস্ত কর।"

হায়রে হায়, দুর্ব্বল কি মহাভাব সহ্য করিতে পারে? উপেন্দ্রকে কি তিনি সে-ভাবে বক্ষে নিয়া থাকিতে পারেন? তাই ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ভাবে অভাব দেখাইলেন। কিন্তু তখন কি তাই বুঝি? তাহা হইলে ভাবে বিভোর হইয়া ভাবের সমুদ্রে ডুবিয়া ভাব-রস পান করিয়া জীবন সার্থক করিতাম।

সব যেন কোথায় সরাইয়া দিলেন। খাটী দারগা বাবু সাজাইলেন—"তামাক খান" "বসুন" ইত্যাদি আহ্বানে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

মনে ভাবিলাম, এ কি? কি একটা স্বপ্নাবেশ হইতে দারগা-বেশে কে আনিল? ঘরে প্রবেশ করিয়া যে নেশা আসিয়াছিল, তাহা কোথায় গেল!

আহারান্তে বসিয়া অনেক প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পার্শ্ব ছাড়িয়া যাইতে এক দণ্ডের জন্য ইচ্ছা হয় না। সরকারি কাজ কোথায় রহিল! সে চাহনি, সে ভালবাসার কথা, আর সে কৌতূহল-পূর্ণ গল্প কখন শুনি নাই। মন-মাতান প্রাণ-জুড়ান কথা হৃদয়ে আজ পর্য্যন্ত দীপ্যমান। সরকারি কাজ সারিলাম। নিকটে বসিয়া সব দেখিলেন। প্রাণের স্রোত, জীবনের হারান ধন, অল্প সময়ের মধ্যে মিলিয়া গেল। আর এ জীবনে কি তাহা পাইব না?

সন্ধ্যা হয়-হয়, তাঁহার নিকট হইতে উঠিলাম। কে যেন মাথা নুয়াইয়া দিয়া শীতল চরণে লুটাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। স্নেহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"আবার আসিবেন।" মনে করিলাম 'আসিবেন' না বলিয়া 'আসিবে' বলিলেন না কেন?" বুঝিলাম, আমি দারগা কিনা, তাই লৌকিক ব্যবহার বজায় রাখিলেন—অন্তরঙ্গের ভাব গোপন করিলেন।

মনে মনে নানা চিন্তা করিতে করিতে থানায় ফিরিলাম। মনে শান্তি নাই। কিছুই ভাল লাগে না। বাসায় ফিরিয়া তাঁহার চিন্তা করিতেছি, এমন সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিল।

রাগের বশে একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিলাম। মনে গ্লানি আসিল।

প্রাতঃকালে থানার বারাণ্ডায় বসিয়া আছি, এমন সময় একটি লোক আসিয়া একটি পত্র দিল। দেখিলাম, লিখিয়াছেন "রাত্রে রাগের বশে যে কাজ করিয়াছ, তাহা ঠিক হয় নাই। ওরূপ ভাবে রাগ প্রকাশ করিলে গুরুতর কার্য্য কি প্রকারে সুসম্পন্ন করিবে ?"

মনে মনে ভাবিলাম, রাত্রের ঘটনা আমি ভিন্ন কেহ জানে না, এত প্রত্যূষে তিনি কি করিয়া জানিলেন !

অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া রোমাঞ্চ হইল।

সরকারি কার্য্য ছাড়া প্রায় সকল সময় তাঁহার বিষয় চিন্তা করিয়া কাটাইতাম। সুযোগ পাইলেই শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া প্রাণ শীতল করিতাম। তেমন ভালবাসা, সে প্রকার নানা দ্রব্য দিয়া ভোজন করান, জীবনে বিধাতা এই প্রথম দেখাইলেন।

জীবনের স্রোত তীরবেগে পরিবর্ত্তনের দিকে ছুটিতে লাগিল। ক্ষুদ্র নদীপ্রবাহ আজ সাগরাভিমুখে ছুটিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রাণের হা-হুতাশ জাগিয়া উঠিল। মন-প্রাণ মাতিয়া গেল।

একদিন বর্দ্ধমান হইতে ফিরিবার সময় আমি ও আমার অধীনস্থ একটি কর্ম্মচারী (বামাপদ বিশ্বাস) তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য কাছারি বাড়িতে হাজির হইলাম।

দেখিলাম, সেই ঘরের সেই কোণে একটি সামান্য কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়া আছেন সেই মহাপুরুষ। সহাস্য-বদনে "কি গো কেমন আছ" বলিয়া নিকটে ডাকিলেন। এখন আর "আপনি আসুন, বসুন" বলা প্রায় শেষ হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে সঙ্গে বসিয়া দাবা-বড়ে খেলিতেন। ভাবিতেন, এখন দারগা—যত প্রকার অসৎ বৃত্তি জাগিয়া রহিয়াছে। গায়ে হাত বুলাইয়া, ধূলা পড়া দিয়া সাপের বিষ তাড়ানর মত, যেন জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার নষ্ট করিয়া আপনার মনের মতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

আমি তামাক সাজিয়া দিলাম। "খাওয়া হউক" বলিয়া কলিকা দিলেন। পূর্ব্বে নিকটে বসিয়াই তামাক খাইতাম, এখন যেন একটু বাধ-বাধ ঠেকে। নিকটে বসিয়া তামাক খাইতে আর যেন মন চায় না—এখন কৃপা-ভিখারী হইয়াছি।

কথায় কথায় বলিলাম, আপনি খুব ভাল জ্যোতিষ জানেন। আমার কোষ্ঠী কি আনিব—একবার দেখিবেন? "কেন গো কোষ্ঠী আনতে কেন হবে? তোমার কোষ্ঠী আমার নিকটে আছে। তুমি কি আমার আজকার পরি-চিত?" আমি বলিলাম—"কৈ দেখি?" সঙ্গে সঙ্গে আমার নোট বহিতে আমার জন্ম বার তিথি নক্ষত্র সন তারিখ সহ গ্রহ-সংস্থান করিয়া কোষ্ঠী-চক্র লিখিয়া দিলেন। এ কি অপরূপ সম্মিলন! যা খুঁজি, তাই প্রস্তুত। ইনি আমার

কোষ্ঠী কোথায় পাইলেন! এ জীবনে ত আমার সঙ্গে আর পূর্ব্বে দেখা হয় নাই। তবে এ সকল কোথা পাইলেন! জিজ্ঞাসায় একটু হাসিয়া বলিলেন—“ভাবনা কি গো, সবই হয়। জল খাও”—বলিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন, আম, লিচু ও নানাজাতীয় ফল দিয়া নিজ হস্তে আহার করাইলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমাকে বিদায় দিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। মরা মন লইয়া আমি বাসায় ফিরিলাম। সঙ্গী বাবুটি দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলেন।

আমার অনেক জ্যোতিষীর সঙ্গে আলাপ ছিল। আমি সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—“মানুষ দেখিয়া আপনারা সঠিক কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে পারেন কি? অন্য দেশে যে লোক আছে তাহাকে না দেখিয়া তাহার জন্ম-বার, তিথি-নক্ষত্র, সন-তারিখ প্রভৃতি দিয়া জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিতে পারেন কি?” তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন,—“আপনার কোষ্ঠীচক্র কোন প্রকারে তিনি পাইয়া থাকিবেন।” আমি বলিলাম,—“যিনি জগৎশুদ্ধ লোকের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে পারেন, তিনি কি প্রকার? এ বিদ্যা এ জগতের নহে—দেব-লোকের।”

যখন যাই, দেখি, প্রায় বালক-বালিকারা ঘেরিয়া আছে, আর তিনি তাহাদিগকে নানাপ্রকার ফল ও মিষ্টান্ন দিয়া সন্তোষ করিতেছেন। সদাই আনন্দ—আমার চক্ষে বোধ হইতে লাগিল যেন গুরুরা আনন্দের হাট। ঘাটে, মাঠে,

বাজারে দোকানে, ফলে ফুলে যেন আনন্দ ছড়াছড়ি! তাঁহার থাকিবার ঘরে যেন পদ্ম-গন্ধ সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে। যেন তেত্রিশ কোটী দেবদেবী তথায় বিরাজ করিতেছেন—যেন ষড়্ ঋতু বর্ত্তমান।

বাবার অঙ্গ যেন সাধনা করিয়া লোকশিক্ষা দিবার জন্যই বিধি নিজে নিটোল করিয়া গড়িয়াছিলেন।

কোন কোন দিন দেখিতাম, রাত্রে দুই তিনবার ও দিবসে দুই তিনবার স্নান করিতেন। দারুণ শীতের মধ্যে হাতে লণ্ঠন লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। তিনি পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার উপর থাকিতেন। আমি শীতে জড়সড় হইয়া কাষ্ঠবৎ পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতাম।

যখন জল হইতে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তীরে উঠিতেন, দেখিতাম যেন স্বভাবের তালে তালে নাচিতে নাচিতে—ছন্দে ছন্দে নাচিতে নাচিতে—আমাকে শিক্ষা দিতেন যে, এমনি করিয়া স্ব-ভাবে থাকিয়া, স্ব-ছন্দে থাকিয়া, ছন্দে ছন্দে নৃত্য না করিলে যেন নিত্যানন্দ লাভ হয় না।

ঘরে আসিয়া সেই সাধনার ঘরে কপাট বন্ধ করিতেন। বাড়ী সুগন্ধে অপরূপ গন্ধে মাতিয়া উঠিত। আমি দরজার নিকট তক্তাপোষে বসিয়া থাকিতাম। রাত্রি একটা হইতে প্রাতঃকাল সাতটা সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত আর তাঁহার সঙ্গে প্রায় দেখা হইত না, কোন অজানা দেশে, কোন অজানা লোকের

রসে মজিয়া অজানা প্রেমে বিভোর হইয়া প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের রাজার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন।

প্রাতে যখন ঘরের কপাট খুলিয়া বাহির হইতেন তখন মনে হইত, হৃদয়ের কপাটও খোলা—যেন বালক ভাব, চক্ষু ঢুলু-ঢুলু, গাত্রময় গন্ধে ভরা, যেন এখনও ঘোর কাটে নাই, যেন এখনও প্রাণ হইতে প্রাণনাথ সরিয়া যান নাই। যেন পা এখন চলিতে চায় না, মুখ ফুটিতে লজ্জা বোধ করিতেছে—কথা বলিলে পাছে ব্যভিচার স্পর্শ করে। যেন এতক্ষণ মন মনে, প্রাণ প্রাণে, হাত হাতে, পা পায়ে, চক্ষু রূপ-সাগরে ডুবিয়া মিশিয়া গিয়াছিল। এই বাহ্য জগতের সহিত তাহারা সকলেই সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া প্রাণপতির—বিশ্বপতির সেবায় ও আরতির কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। শিক্ষা দিতেছিলেন, এমনি ভাবে পতিসেবা না করিলে পতি-সোহাগিনী হয় না। এমনি ভাবে শিক্ষা না করিলে প্রকৃতি পুরুষে, জীবাত্মা পরমাত্মায়, জ্ঞানী ব্রহ্ম-সমুদ্রে, ভক্ত ভগবানে মিলিতে মিশিতে পারে না। এমনি প্রেমে উন্মত্ত না হইলে রাধাকৃষ্ণের মিলন হয় না। এমনি করিয়াই নরত্ব শিবত্বে পরিণত হয়।

বাহিরে বসিলেন। কেহ পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল, কেহ তামাক সাজিয়া দিল। কিন্তু তখনও হুঁকার ডাক সতেজ নহে, তখনও যেন হুঁকার সঙ্গে মনের সম্বন্ধ ঠিক ঠিক হয় নাই, তখনও মন যেন অজানা রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া

আসে নাই। প্রায় দেখিতাম, বাহ্যভাব আসিতে বহু বিলম্ব হইত এবং কথা কহিতেও বিলম্ব হইত।

তখন কাছারির বারাণ্ডায় রোগী, সাধু, গৃহী, বালক, বৃদ্ধ, ভোগী, যোগীর সম্মিলন হইয়াছে। সকলের মন ও চক্ষু সেই এক মহাপুরুষের উপর পতিত—খণ্ড যেন অখণ্ডে মিশিতে চাহে। সকলেই একদৃষ্টে মুখপানে তাকাইয়া আছে। আজ সূর্য্যরশ্মিসমূহ বুঝি সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবার প্রয়াসী হইয়াছে!

তখন মধুর কণ্ঠে, সেই ঢল্‌ঢলে, ফ্যাল্‌ফ্যালে চাহনি চাহিয়া বালক-ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেন,—"কি গো, কেমন আছ সব।"

যেন ছায়ায় বসিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিবার জন্য বদ্ধ জীব, মায়িক জীব, বিষয়াসক্ত জীব ঝালাপালা হইয়া ত্রিতাপে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ক্ষণিক শীতলতা লাভ করিবার জন্য কল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

কেহ 'ঔষধ দাও', কেহ 'বাবা, আমার গতি কি হবে', কেহ বা পুত্র-শোকে কাতর হইয়া, কেহ বা 'বাবা, কাপড় দাও', কেহ বা 'বাবা, একটু নির্জ্জনে আসুন, গোটাকয়েক কথা বলিয়া ঠাণ্ডা হই' বলিয়া, কেহ বা 'যাহা দিয়াছিলেন সফল হইয়াছে' বলিয়া, আর কেহ কেহ বা ফল-ফুল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বালক-বালিকারা 'দিন, আমাদের প্রাপ্য দিন,' বলিয়া

প্রসাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত। যে যাহা চাহিত, তাহাকে তাহাই দিয়া ক্ষণিক শান্তি দিয়া নিস্তব্ধ করিতেন। বালক-বালিকা-দিগকে ফল দিয়া, মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া মিষ্টরসে তুষ্ট করিতেন। এই শ্রেণীর লোকে প্রায় কাছছাড়া হইত না।

"উপেন্দ্র, জল খাও" বলিয়া স্বহস্তে ফল দিয়া মিষ্টান্ন দিয়া খাওয়াইতেন। সর্ব্বপ্রথমে স্নান-জল দিয়া মা ভগবতীর নিকট উপেন্দ্রের মঙ্গল কামনা করিতেন, দীর্ঘ জীবনের জন্য মায়ের কাছে কাঁদিতেন।

সকলে বিদায় হইলে একটি হাত-কাটা জামা পরিয়া পরিভ্রমণে বাহির হইতেন। এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিতেন। আসিয়া সেই পূর্ব্বদ্বারী ঘরের ভিতর বায়ু কোণে নিজের কাষ্ঠাসনে বসিয়া অমৃত-বর্ষণ করিতেন। কত কত উপদেশ দিতেন—মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, চরিত্র-গঠন, পরোপকার, সাধু সেবা ইত্যাদি ব্রত অবলম্বন করিয়া, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, জগতে কিরূপে চলিতে হয়, এই সব শিক্ষা দিতেন।

মধ্যাহ্নে সেবা করিবার জন্য কীর্ত্তির মার বাড়ী যাইতেন। ধন্য কৃত্তিবাস আর ধন্যা তোমার মাতাঠাকুরাণী! প্রায় ত্রিশ বৎসর একভাবে নররূপী নারায়ণের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলে। নিজেকে ধন্য করিয়াছ, আর কি প্রকারে নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরের সেবা করিতে হয়, তাহা বিশদরূপে শিক্ষা দিয়াছ। কীর্ত্তির বাড়ী গুষ্করা গ্রামেই। মাতা-পুত্রে ঠাকুরের আশ্চর্য্য সেবা করিয়াছিল।

আহারান্তে তক্তাপোষে বসিয়া পাতঞ্জল, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। শাস্ত্রের গূঢ় ও জটিল রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতেন। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক তত্ত্ব বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভাব অবলম্বন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। সে মধুর রস আমার জীবনে পরিপাক করিতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ।

এই সময়ে মধ্যে মধ্যে করটীয়ার খাঁকি বাবা ও কুড়ুম্বার মোহন বাবা ইঁহার নিকট আসিতেন ও ভোলা ক্ষেপা বলিয়া আহ্বান করিতেন। মোহন বাবা দেহ রাখিবার পর গুষ্করায় প্রতি বৎসর মোহন মেলা হইত। এখনও বোধ হয় পৌষ মাসে হইয়া থাকে।

বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত গুষ্করা গ্রামের বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও প্রতিবাসী প্রায় আসিতেন—কেহ সদালাপ করিতেন, আর কেহ বা দাবা-পাশা খেলায় বৃথা আমোদে সময় কাটাইয়া যাইতেন। দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচলে পশ্চিমে নিজ পাটে বসিবার উপক্রম করিতেন। তাই দেখিয়া ঠাকুরও নিজ পাটে বসিবার উদ্‌যোগ করিতেন।

বৈকালে ঘরে ধূনা দেওয়া হইত। তিনি একবার মাত্র পাইখানায় যাইতেন—তাহা এই দিবা সাড়ে চারটার সময়। কানে পৈতা দিলেই বুঝা যাইত, এইবার উঠিবেন। পাইখানা হইতে পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া স্নান করিয়া

আসিয়া লেঙ্গট ও বস্ত্র বারাণ্ডায় শুকাইতে দিতেন, আর রাজরাজেশ্বরের দরবারে যাইবার জন্য দরবেশ ও ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া দিনকর অস্তাচলে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে দরজার কপাট বন্ধ করিয়া কাহার উদ্দেশ্যে, কি সাধনার জন্য, কোন্ হিংসা-দ্বেষ-শূন্য জরা-মরণ-শূন্য ধীর শান্তি-নিকেতনে, প্রকৃতির স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া মন মাতাইয়া প্রতি কম্পনে, প্রতি ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে নিজ-জন-সমক্ষে উপস্থিত হইতেন, তাহা তিনিই জানেন।

দরজায় প্রহরিরূপে কালীপদ ও আমি কতক্ষণে উঠিবেন এই প্রতীক্ষায় সতৃষ্ণনয়নে প্রায় দণ্ডায়মান থাকিতাম।

রাত্রি প্রায় ৮টা বা ৮৷৷৹টার সময় কপাট খুলিতেন। বাহিরে তক্তাপোষে বসিলে দেখিতাম, সমস্ত দেহ ঘামে:কাদা হইয়া গিয়াছে, প্রত্যেক অঙ্গ যেন খুলিয়া গিয়াছে, যেন অঙ্গের প্রতি কব্জার পেঁচ সব খুলিয়া গিয়াছে। বসিতেন, যেন এক খণ্ড বৃহৎ মাংসের স্তূপ। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার পর ধীরে ধীরে কথাবার্ত্তা বলিতেন। তখন রাত্রের জলখাবার প্রস্তুত থাকিত।

বঙ্ক ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি—বাড়ী মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত জলডাঙ্গা গ্রামে। কাছারি বাড়ীর সম্মুখে তাঁহার দোকান ছিল। তিনি নিজে ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ প্রাণপণে ঠাকুরের সেবা করিতেন। রাত্রে জলখাবার তাঁহার দোকানেই প্রস্তুত হইত।

রাত্রের আহার নাম মাত্র। পাঁচ খানি বা ছয় খানি ছোট ছোট লুচি, আলু ভাজা, অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ, দুই একটা ঘরে প্রস্তুত করা মিষ্টান্ন। লুচির মধ্যে তিন খানি সেবা করিতেন, বাকি প্রসাদ থাকিত—আমার জন্য একখানি, বঙ্কর জন্য একখানি ও একটি কুকুর ছিল তাহার জন্য একখানি। এই ছিল নিত্য বন্দোবস্ত। তা ছাড়া গুষ্করা গ্রামের জমিদার মহাবিষ্ণু চোঙ্গদার মহাশয়ের বাড়ী হইতে তাঁহার ছেলে যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার নানাপ্রকার উপাদেয় দ্রব্য আনিয়া প্রসাদ করাইতেন ও গুষ্করার পূজনীয় ৺ কালিদাস ঘটক ও কেদারনাথ মোদক মহাশয় নানা দ্রব্য আনিয়া প্রায় প্রসাদ করাইতেন।

রাত্রে জলযোগের পর প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে, ও কালীপদ ঘোষ আসিলে তাহার সঙ্গে, উল্লসিত মনে নানাবিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেন। কোন দিন গুষ্করার টোলের প্রধান অধ্যাপক আসিয়া যোগ দিতেন।

শাস্ত্রালাপ করিতেন। আমি একা থাকিলে গুহ্যতত্ত্ব প্রত্যক্ষ দেখাইতেন। রাত্রি ১১টার পর শয়ন। কখন কখন নিজের কাছে শোওয়াইতেন। একটু পরে উঠিয়া দেখিতাম, ঠাকুর নাই। কোথায় গেলেন বুঝিতাম না! এক এক দিন দেখি, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। তখন বুঝিতাম, ঘরে তপস্যা করিতেছেন। কোন কোন দিন দেখিতাম, ঘর অন্ধকার, বাড়ী অন্ধকার, কেউ কোথায় নাই। রামলাল নগদির ভাই মধ্যে মধ্যে থাকিত। কিন্তু সেও নাই। প্রথম প্রথম কোথায়

গেলেন, ভাবিয়া ভয় ও কষ্ট হইত। তাহার পর শুনিলাম, রাত্রে মহানিশায় নদীতীরে শ্মশানে গমন করেন। অল্প অল্প রাত্রি থাকিতে আসিয়া খাঁটী সরিষার তৈল শিশি হইতে লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেন। আমিও মধ্যে মধ্যে মাখাইয়া দিতাম। ৺কালীপদ ঘোষও দিতেন। স্নানান্তে পূর্ব্বমত পূর্ব্বদ্বারী ঘরে কপাট বন্ধ হইত।

এরূপ যথাসময়ে যথানিয়মে শাস্ত্রমত ঠিক ঠিক ভাবে কর্ত্তব্যপরায়ণ পুরুষ জীবনে আমার এই প্রথম দেখা। বাহ্যাড়ম্বরশূন্য, কাম-ক্রোধ-অভিমানশূন্য অপূর্ব্ব সাধক ও যোগিরাজ আমার এই প্রথম ও শেষ দেখা।

যদি কার্য্যগতিকে কোথাও যাইতে হইত, যথাসময়ে আসা চাই। গুষ্করার লোককে প্রথম প্রথম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সকলেই বলিতেন, ঐ একই নিয়মে আহার, শয়ন, নিদ্রা, ভজন বহুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি। ভিতরে প্রবেশ করে, কাহার সাধ্য।

সিংহের ন্যায় শক্তি, পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল কথা। কোন বিষয়ে কাহারও মুখাপেক্ষা নাই, কাহারও নিকট কোন বিষয়ের প্রত্যাশা নাই। খাঁটী খাঁটী কথা, খাঁটী খাঁটী ব্যবহার, খাঁটী খাঁটী ভজন—ভয় নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, মন-রাখা কথা নাই।

গুষ্করার ৺হরিশ্চন্দ্র চোঙ্গদার জমিদার মহাশয় বলিতেন, "ইনি একটি শালগ্রাম। কেহ কিছু ব'ল না, আমার সময়-গুণে

আসিয়াছেন।” শুনিয়াছি, তাঁহার কন্যা প্রমোদ বাবুর পত্নীর কঠিন পীড়া হয়। চোঙ্গদার মহাশয় বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হইতে বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইতেছিলেন। কথার ছলে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কি হবে বাবা!” উত্তরে গুরুদেব বলিয়াছিলেন, “কৰ্ত্তা, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিলেও আপনার কন্যা বাঁচিবেন না।” দিন-সময় নির্ঘণ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন, ঐ দিনে এত ঘণ্টা, এত মিনিটের সময় তাঁহার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল। কৰ্ত্তা ভয়ে ভয়ে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রায়ই সাহস করিতেন না।

গুষ্করার লোক প্রায় অনেকেই ব্যভিচারী ও অবিশ্বাসী। কাহাকেও নিজের অপেক্ষা কোন গুণে বড় দেখিতে চাহিত না। বলিত, “তিনি (গুরুদেব) যাহাকে যাহা বলেন, যদি তাই হয় তবে আরও দুই-চারিটা বলুন।” শুনিয়াছিলাম, সেই সময় ময়রাদের একটি লোক অসুস্থ হইয়া ভুগিতেছিল। তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর মুখে কিছু না বলিয়া একটি কাগজে লিখিয়া নিরপেক্ষ ভদ্রলোকের জিম্বায় বাক্সের মধ্যে তাহা রাখেন। ভাল-মন্দ মুখে কিছুই বলেন নাই। শুধু বলিয়াছিলেন, “অমুক দিনে কাগজ খুলিয়া দেখিবে, ভাল-মন্দ সবই উহাতে লেখা রহিল।” নির্দ্দিষ্ট দিনে কাগজ বাহির করিয়া দেখা গেল যে, মৃত্যুর দিন ও সময় লেখা রহিয়াছে। সেই দিনই তাহার মৃত্যু হয়।

দেরিয়াপুর গুস্করার নিকট। তথায় হুগলী জেলার অধীন বড়্তিপুরের জমিদার জগদ্বন্ধু ও দীনবন্ধু বাবুর কাছারি-বাড়ী ছিল। জগদ্বন্ধু বাবুই প্রায় তথায় থাকিতেন। জমিদার জগদ্বন্ধু বাবুর সহিত আমার দেখা হইত ও গুরুদেবের কথা লইয়া অনেক প্রসঙ্গ উত্থাপন হইত। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, গুস্করার ভোলানাথ সাধুর কথা তিনি দীর্ঘনগর আশ্রমের শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট শুনিয়াছিলেন।

জমিদার দীনবন্ধু বাবু ও বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ার শান্তিপুর-নিবাসী বাবু হরিদাস পালও সেই সময় বাবার নিকট আসিতেন। একদিন জমিদার দীনবন্ধু বাবু কাছারি-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি গায়ের শাল বিছাইয়া গুরুদেবকে তক্তাপোষে বসাইয়া বিনীতভাবে অনেক কথা জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "প্রভু, আপনার ৺শিবঠাকুরের পূজার কি কিছু পাকা বন্দোবস্ত আছে?" বাবাজী মৃদুস্বরে বলিলেন, "আতপ চাউল আর রম্ভা যখন যাহা জোটে, তাহাই দিয়া থাকি।"

এই কথার পর বড়্তিপুরের উক্ত জমিদার দীনবন্ধু বাবু অতি বিনীতভাবে বলেন, "অনুমতি করিলে ৺শিবঠাকুরের সেবার জন্য আমি একখানি মৌজা দানপত্র লিখিয়া দিই।" ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি দিবে গো? আমি যাঁর সেবা-পূজা করি তিনি মনে করিলে বহুরাজ্যের অধীশ্বর করিতে পারেন।" বলিয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া-

ছিলেন। দীনু বাবু ও অন্যান্য সকলেই নিস্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

একদিন অনেক মিনতি করিয়া গুষ্করা হইতে আউসগ্রামে আমার বাসায় যাইবার জন্য বলায় স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "কল্য প্রাতে ৺পূজা করিয়া যাইব। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিশ্চয় ফিরিব, থাকিতে বলিলে থাকিব না।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা তাহাই হইবে।"

১৯০২ খৃঃ শ্রাবণ মাসে বেলা প্রায় ৯টার সময় তিনি আউসগ্রাম থানায় প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন। সঙ্গে কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট উপাদেয় আম আনিয়া আমার মেয়ে বিজনবাসিনীকে দিয়া বলিলেন, "নাও, খাবে।" বিজনের বয়স তখন পাঁচ বৎসর। তাহাকে দেখিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন "এ মেয়েটি তোমার ভাবী গিন্নি হইবে। পিতৃ-মাতৃ সমান অংশ লইয়া ইহার জন্ম।" বাস্তবিকই বিবাহের পর সেই বৎসর বিধবা হইয়া সে আমার ঘরের গিন্নি হইয়া রহিয়াছে। ইহার রহস্য পরে বিশদভাবে লিখিব।

আউসগ্রামের গোস্বামী মহাশয়েরা অনেকে আসিয়া গুরুদেবের আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। পরে ইঁহাদের বংশের বৈদ্যনাথ গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত পরীক্ষায় পাশ হইয়া বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাবাজী কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে গুষ্করায় ফিরিয়া যান। আমার কন্যাটির পর পাঁচ ছয় বৎসর

পুত্রাদি না হওয়ায় এবং আমার পত্নীর গুরুতর পীড়া হওয়ায় সন্তানাদির আশাও ছিল না। বহু চিকিৎসায় দুরারোগ্য রোগ কিছুতেই সারিল না। আমার অগ্রজ দুর্গাদাস চৌধুরী আমার নিকট গিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার প্রস্তাব করেন। আমি অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলাম, "ভগবান্ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিব। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।" তিনিও সম্মত হইলেন। এদিকে দাদা বাঁকুড়ায় নিজ ওকালতী ব্যবসায়ে যোগ দিতে চলিয়া গেলেন। আমি প্রভুর নিকট ঐ কথা উত্থাপন করিলে, তিনি বলিলেন, "কেন গো, বিবাহ আবার কেন ? পুত্র চাও কি ? ও-সব ত বাবা বন্ধন।" আমি বলিলাম, "সংসারী হলে সবই দরকার হয়।" এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "তবে এই বৎসরেই তোমার পুত্র লাভ হইবে। রোগ সারিয়া যাইবে। এই ঔষধ দিবে আর এই কবচ ধারণ করাইবে।" বলিয়া ঔষধ ও কবচ দিলেন।

আমার পরিচিত একটি লোক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য জেদ করিয়া ধরিলে বাবাজী আমায় গোপনে বলিলেন, "ঐ ব্যক্তির ব্যভিচার দোষ আছে। ও ভেদিয়া গ্রামে একটি ছোট-লোকের স্ত্রীলোকের অবৈধ প্রেমে মাতিয়া রহিয়াছে। কি করিয়া কৃপা হয়, বল।" সেই লোকটিকে আমি গোপনে জিজ্ঞাসা করায় সে তাহা স্বীকার করিল। বাবাজী বলিয়াছিলেন, সে তাহার উপপত্নী ত্যাগ করিলে যাহা হয় দেখিবেন ও করিবেন।

কিছুদিন পরে আমি সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করি, "কি হে, ছাড়িয়াছ ?" উত্তরে বলিলেন, "হাঁ ভাই, ত্যাগ করিয়াছি।" সেই কথা ঠাকুরকে আমি বলিলে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কৈ, ছাড়ে নাই। সেদিন সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তবে ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছিল কেন ?" ইহা সঠিক কি না জানিবার জন্য আমি সেই লোকটিকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় সে স্বীকার করিল যে, একদিন সন্ধ্যার পর তাহার সহিত নির্জ্জনে কথা কহিয়াছিল। আমি বলিলাম, "ভাই, ইঁহার নিকট কোন বিষয় ছাপাবার নাই।" তাহাকে আর আশ্রয় দিলেন না।

আমি সেই সময় অত্যন্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলাম। এই ম্যালেরিয়ার জন্য ইহার পূর্ব্বে তিন মাসের ছুটি লইয়া নানা স্থানে জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাই, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ছুটি অন্তে হাজির হইলে আমাকে আউস-গ্রামে বদলি করিল।

এই বারেই বাবাজীর অনুগ্রহ লাভ করি। আমি জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি দেখিয়াও তিনি কিছুই বলেন নাই। অনেক লোক ঔষধ লইয়া আরোগ্য হইতেছে, আমি কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলি নাই।

একদিন বর্দ্ধমান হইতে গুস্করায় বাবাজীর নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি নাই,—প্রাতঃকালে যে প্রকার পূজান্তে বেড়াইতে যান, সেইরূপ গিয়াছেন। ৺কালীপদ ঘোষের

সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, "ডাক্তার বাবু বাহিরে গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন—উপেন্দ্র আসিলে আজ আউস-গ্রাম যাইতে দিবে না। আমি এখনই আসিতেছি। তাহাকে এই ঔষধটি খাওয়াইয়া দিবে।" আর একটি কথা বলি-বলি করিয়া চাপা দিবার উপক্রম করিতে লাগিল। জেদ করিয়া ধরায় বলিল, "ডাক্তার বাবু (গুরুদেব) বলিয়া গিয়াছেন, আজ তার কঠিন দিন। আউসগ্রাম যাইতে দিও না।" আমি ঔষধ সেবন করিয়া বসিয়া আছি। দেখিতে দেখিতে ঠাকুর আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "ঔষধ খাইয়াছ? আজ এই খানেই থাক, যেয়ে কাজ নাই।"

বেলা প্রায় ১০টার সময় জ্বর এরূপ কঠিনভাবে আক্রমণ করিল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। বেলা প্রায় ৪টার সময় একটু ঠিক হইলে বলিলেন, "তোমার আজ খুব যন্ত্রণা হইতেছে, আজ তোমার কঠিন দিন ছিল, তাই যাইতে দিই নাই। আজ একেবারে রোগের শেষ করিব"। বলিয়া নিজের দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি আমাকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে বলিলেন। বিছানায় বসিয়া রহিলেন। অঙ্গুলি স্পর্শমাত্র কি ভয়ঙ্কর রূপে ঘাম হইতে লাগিল। বিছানা ও দুই তিন খানা লেপ যাহা গায়ে ছিল, ভিজিয়া গেল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাত্র যেন বরফ আর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি। আমি তখন ক্ষিদেয় অস্থির। বলিলেন, "তোমার যা ইচ্ছা, তাই খাও।"

পেট ভরিয়া নানাপ্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিয়া রাত্রে গাঢ় নিদ্রাসুখ অনুভব করিলাম। সেইদিন হইতে আর একদিনও জ্বর হইল না। একটি বড় বোতলে লাল রঙ্গের ঔষধ দিয়াছিলেন। খাইয়া মোটা হইয়াছিলাম।

এমন ঘটনা কতবার হইয়াছে, আমার গুহ্করা যাইবার কোন কথাই নাই, কিন্তু কাছারির চাকর মহাদেবকে ও ৺কালীপদ ঘোষকে বলিতেন, "আজ রাত্রি ১১টার সময় উপেন্দ্র আসিবে, তাহার আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত রাখিবে।" ঠিক ১১টার সময় আমি হাজির। শীতকালের সমস্ত রাত্রি, কি আনন্দে কাটিয়া যাইত, কি তন্ময়ভাবে, কি একাগ্রভাবে, কি অপরূপ রূপ দর্শনে, কি সুন্দর সুন্দর গল্প ও শাস্ত্রালাপে ভোর হইয়া যাইত, তাহা সেই আনন্দময় মহাপুরুষই জানিতেন।

একদিন কথায় কথায় বলিলেন, "তোমার বদলি হইবে ও তোমাকে বহু ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হইবে। দাদা গুরুদেব ভৃগুরাম পরমহংস বলিয়াছিলেন, উপেন্দ্রের কেহ কিছু করিতে পারিবে না। তবে আমি তাহাকে তাহার কায়েতী বুদ্ধি ছাড়াইবার জন্য নিজে দণ্ড দিব।"

ইহার অল্পদিন পরেই ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে হঠাৎ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য সাহেব আমাকে আসানসোল থানায় বদলি করিলেন। আমি তথায় চলিয়া গেলাম। তিনি আমাকে কাছছাড়া করিলেন। কিন্তু

দৈনিক উপদেশ-পূর্ণ পত্র দিয়া সজাগ ও সতেজ রাখিতে লাগিলেন। যাইবার সময় তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সঙ্গত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে বলিয়া অনুতাপ করিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া ফেলিলাম। মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "দূর কোথা গো! অজ্ঞানেতেই নিকটের জিনিষকে দূরে দেখে। আমি তোমার কাছছাড়া নই। তথায় গিয়া পত্র দিবে।"

মাথা স্পর্শ করিবামাত্র আমার মন ও হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। ভাবিলাম, 'অন্তর্য্যামী কি আর অন্তর ছাড়িয়া থাকিতে পারেন!' বাস্তবিকই তিনি আমাকে ছাড়িলে আমার দেহ একদণ্ডও থাকিতে পারে না। আমি হৃষ্টমনে আসানসোল গমন করিলাম। আমি এই সময় ইদানীং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্তগণের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করিতাম। আমাদের দামোদরবাটী গ্রামের ৺রামানন্দ দাস নামক জনৈক ভগবদ্ভক্ত সুপণ্ডিত ব্যক্তির সহিত আমি প্রায় ধর্ম্মালোচনা করিতাম। আমি কুলগুরুর নিকট দীক্ষা ও বাহিরে বৈষ্ণবের আচরণ গ্রহণ করি। তখন আমি গলায় মালা ধারণ করিয়া লোক-দেখান সাধু ছিলাম। একদিন প্রভু আমায় বলিলেন, "উপেন্দ্র, তুমি বাহিরে তিলক, গলায় মালা, মস্তকে শিখা রাখিয়া বৈষ্ণব সাজিয়া আছ। কিন্তু ভিতরে কি তোমার যথার্থ বৈষ্ণবের ভাব আছে, না, ভিতর কুভাবে পরিপূর্ণ রাখিয়া বাহিরে লোক-দেখান বৈষ্ণব সাজিয়া লোকের

সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের পরকালের পথ পরিষ্কার করিতেছ? জান, বৈষ্ণব কাহাকে বলে? গুণ-বৈষম্য থাকিতে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। 'বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ,' তোমার এ-ভাব আমি নষ্ট করিব। অগ্রে চরিত্র রক্ষা কর, যাহাতে মনে কুবাসনা উদয় না হয়, পরস্ত্রী মাতৃবৎ বোধ হয়, তাহা কর। 'বশ কর মন প্রথম শশি'! তাহার পর সংযম! মনের মধ্যে যদি ২৪ ঘণ্টা রিপুর উদয় হয়, তবে তুমি কি প্রকারে হরিপাদ-পদ্মে মন নিবিষ্ট করিয়া হরিসাধনা করিবে? বৎস, অগ্রে যাহা যাহা করা ব্যবস্থা, তাহাই করা উচিত, পরের কর্ম্ম পূর্ব্বে ও পূর্ব্বের কর্ম্ম পরে করিলে কি কখন কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়? প্রস্তুত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে যজ্ঞ পণ্ড হয় না। আর অপ্রস্তুত হইয়া কর্ম্ম করিতে নামিলে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত হইতে হয়। কদাপি মনে কুভাব পোষণ করিও না। ভগবদ্ভক্ত হইতে হইলে গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই, সাধু ভাব, সাধু ব্যবহার, সাধুর চরিত্র গঠন করিতে হয়। ছল-চাতুরী ক্রমে ক্রমে ত্যাগ না করিলে কি বাবা, সাধু হওয়া যায়? এদেশের মানুষ সেদেশে যাইতে পারে না। সে দেশের মানুষ এদেশে আসে না। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। তুমি সর্ব্বদা সৎচিন্তা করিবে, কর্ম্ম কি এবং কি করিলে কর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে বুঝা যায়, তাহা পরে পরে তোমাকে শিক্ষা দিব। কোনকালে যাহা প্রকৃতপক্ষে তুমি নহ, তাহা ছল করিয়া ছদ্মবেশী হইও না। সত্য যাহা, তাহাই

থাকিতে চেষ্টা করিবে। সত্যের উপর দাঁড়াইয়া সত্যরক্ষা করিবে। ঠিকের উপর দাঁড়াইয়া ঠিকের ঘরে ঠিক দিবে, গোঁজা মিল দিও না, কালে মানুষ হইতে পারিবে।”

আমি আসানসোল গিয়া বাস্তবিকই বড়ই ঝঞ্ঝাটে পড়িলাম। এত কাজ ছিল যে, রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া কার্য্যের শেষ হয় না। সমস্ত দিন ও রাত্রি প্রায় ২।৩টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া ঝঞ্ঝাট শেষ করিতে পারি নাই।

সেই সময় প্রায় ২।১ দিন অন্তর তাঁহার পত্র আসিতে লাগিল। চিঠি পড়িতে পড়িতে গা শিহরিয়া উঠিত। অসাধারণ শক্তি আসিয়া মাতাইয়া দিত। রাশি রাশি কর্ম্ম আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত। নানা প্রকারের জটিল বিষয় আসিয়া জুটিলে তাহা অতি সহজেই সরল হইয়া যাইত। সকলেই আমার কার্য্য-কৌশল ও শীঘ্রগতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত। যে সময়ে মানসিক দুর্ব্বলতা আসিবার উপক্রম হইত, ঠিক সেই সময় উপর্য্যুপরি পত্র আসিয়া সেই দুর্ব্বলতার ভাবকে কোথায় চূর্ণ-বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত করিয়া দিত, প্রবল বেগে কর্ম্ম-স্রোত বহিতে থাকিত। এই ভাবে দুই এক মাস থাকার পর এক গুরুতর জটিল খুনের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দমার বিশেষ বিবরণ লিখিলে বহু বিস্তার হইয়া যাইবে, সুতরাং বিস্তারিত ভাবে লিখিলাম না। ফল কথা, এই মোকদ্দমা আমার উপরই ইন্‌স্পেক্টর পাঠাইলেন, তাঁহার

মাথায় কিছুই প্রবেশ করিল না। বহুবিচক্ষণ বহুদর্শী ইন্‌স্পেক্টর দিগম্বর অধিকারী প্রভৃতি উপরিস্থ কর্ম্মচারী আসিয়াই গোলে পড়িলেন ও কিছুক্ষণ থাকিয়া স্থানত্যাগ করিলেন। তাহার পর সবডিভিসনল অফিসর, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলা মাজিষ্ট্রেট, ডিভিসনল কমিশনর প্রভৃতি মোকদ্দমার অবস্থা দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা সকলেই চুপ করিয়া থাকিলেন, কেহ কোন কিছু স্থির করিয়া উপদেশ পর্য্যন্ত দিলেন না। তাহার পর সেই মোকদ্দমা দুইবার সেসন ও দুইবার হাইকোর্টে বিচার হয়। সকলেই আমার শত্রু, এমন কি লাট সাহেব পর্য্যন্ত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন।

এই সময়ে সকলেই আমাকে অকূল বিপদ-সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া আমার অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিপদের কাণ্ডারী মধুসূদনের নিকট আমি নিরপরাধ, তাই ভবপারের কর্ণধার আমার জন্য নৌকা লইয়া তীরে আসিলেন। মাভৈঃ রবে আমাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। বলিলেন, "উপেন্দ্র, দাদা গুরুদেব লিখিয়াছেন, পৃথিবীসুদ্ধ লোক বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে উপেন্দ্রের কিছুই করিতে পারিবে না। উপেন্দ্র যাহা করিয়াছে, তাহাই টিঁকিবে।" ঘটনার প্রায় তিন বৎসর শেষ হইতে না হইতে শ্রীগুরুদেবের কথাই সত্য হইল।

আলিপুরের সরকারী উকিল ৺আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয় ঐ মোকদ্দমা আলিপুর সেসনে বিচার হইবার সময়

বলিয়াছিলেন, 'এত লোক এই দারোগার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, কিন্তু এই ব্যক্তি যাহা লিখিয়াছে, তাহাই হইবে।' বিপক্ষের উকিল ছিলেন বাবু হেমেন্দ্রনাথ মিত্র। জজ্ রিচার্ডশন সাহেব একপ্রকার করিলেন, কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট আমার প্রস্তাবেই মত দিলেন। যাহা শ্রীগুরুর মুখে দুই বৎসর পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম আজ তাহাই ঠিক হইল।

এই সময় আমার আকস্মিক মৃত্যু হইবার কথা কোন কোন জ্যোতিষী পণ্ডিত নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। আমি সেই কথা প্রভুর নিকট উত্থাপন করিলে তিনি কোনই উত্তর দেন নাই। বুঝিলাম, বিপদ অতি-নিকট—অচিরেই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া আমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ করিবে।

সেই সময় মধ্যে মধ্যে প্রভুর নিকট গিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া অমূল্য নিধি সংগ্রহ করিতাম।

ইংরাজি ১৯০২ সালের ২২শে আশ্বিন হঠাৎ আমার দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কোথায় উড়িয়া গেল। পর দিবস প্রাতে এক পত্র পাইলাম। প্রভু লিখিয়াছেন, "২২শে আশ্বিন পার করিতে কি কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তুমি আসিলে দেখাইব। তুমি শীঘ্র আসিবে, তোমাকে দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।" আমি পত্র পাইয়া বাবার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিবামাত্রই বাবার চক্ষু দুইটি জলে ডব্-ডব্ করিতে লাগিল। বলিলেন, "উপেন্দ্র, আজ

আর তোমার অস্থি-মাংস-বিশিষ্ট দেহ-পুরে তোমাকে এই চক্ষে দেখিতে হইত না। অনন্ত জগৎ-সমুদ্রের কোন দেশে তলিয়ে যাইতে, কিনারা থাকিত না।" বলিয়া পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভৃগুরাম পরমহংস দেবের চিঠি দেখাইলেন। বলিলেন, "তোমার এই প্রকার বিপদ হইবার আশঙ্কা দেখিয়া আমি বিন্ধ্যাচলে পরমহংস নিমানন্দ স্বামীর নিকট যাই। তিনি বলিলেন, "এই অনাদি অনন্ত প্রকৃতির স্রোতে কত জীব স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলে অনন্তকাল হইতে ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, উঠিতেছে, তাহার গতি রোধ করা ঠিক নয়। উপেন্দ্র কর্ম্মফলে ভাসিয়া যায় যাক্, তুমি স্থির থাকিয়া প্রকৃতির খেলা দেখিতে থাক।"

স্বামী পূজ্যপাদ নিমানন্দ পরমহংস দেবের এইরূপ প্রস্তাবে আমি মর্ম্মাহত হই। ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করিয়া পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভাবিলাম, উপেন্দ্রকে এ-যাত্রা রক্ষা করিতেই হইবে। ক্রমে পাঞ্জাব পার হইয়া পাহাড়ের মধ্য দিয়া তিব্বতে রাজরাজেশ্বরের পাহাড়ে উপস্থিত হইলাম। আমার অভীষ্টদেবের চরণ বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ক্রমশঃ নানা কথার পর পূজ্যপাদ স্বামী ভৃগুরাম পরমহংস মহারাজের নিকট তোমার কথা আরম্ভ করি।

তিনি সমস্ত শুনিয়া গেলেন। কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। গুরুদেব মহাতপাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই নাই। পুনঃপুনঃ দাদা গুরুদেব ভৃগুরাম পরমহংস দেবের

কৃপা-ভিখারী হইলাম। তিনি বলিলেন, “যা হবার হইয়া যাক্, দেখিবার দরকার নাই।” তিন দিবস অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, “দাদা গুরুদেব, আমি আপনার যেরূপ প্রাণের জিনিষ, উপেন্দ্র কি আমার সেই প্রকার নহে? যদি আপনি না দেখিবেন, আমার কর্ম্ম ও আয়ু দিয়া আমি তাহাকে রক্ষা করিব।” এই কথা শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বিশুদ্ধানন্দ, তুমি যাও, আমি ব্যবস্থা করিব।” আমি আরও দুই দিন থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। আমি আসার পর তিনি কি কি করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন দেখ। দেখিলাম, —পত্রের শেষভাগে লেখা রহিয়াছে, “ব্রহ্মা, বিষ্ণু যদ্যপি চেষ্টা করেন, উপেন্দ্রের বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারিবেন না। যাহা করিব, আমিই করিব।” আজ তোমাকে দেখিয়া আমার আনন্দ ধরে না, ধন্য গুরুর কৃপা। পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামীর কথা-প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, “পরমহংস মহারাজ ভৃগুরাম স্বামী সর্ব্বসময়েই গুরুদেব মহাতপার নিকট থাকিয়া তাঁহার শরীর রক্ষা করেন। গুরুদেব অতি দীর্ঘজীবী। তাঁহার আহার নাই, বায়ু ও ভস্ম আহার করিয়া দেহ রক্ষা করেন। অস্থি চর্ম্ম থল্‌থলে। চক্ষুর ভ্রূর চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়া চক্ষু ঢাকা পড়িয়াছে। বক্ষঃস্থলের চর্ম্ম ঝুলিয়া পেটের সঙ্গ ধরিয়াছে। অতি সন্তর্পণে তাঁহার দেহরক্ষার ভার কেবল ভৃগুরাম স্বামীর উপর ন্যস্ত।”

ভৃগুরাম স্বামীর বয়সও কম নহে। তিনি ভয়ঙ্কর তেজস্বী

ও উগ্র তপস্বী। পৃথিবীর কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। চক্ষু বড় বড়, ঈষৎ খর্ব্ব, মুখ চুল দাড়ী যেন প্রাতঃকালীন সূর্য্যের রঙ, দীর্ঘ ললাট, তপস্যার শক্তি ও তেজঃ দেখিয়া যেন ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ সশঙ্ক। তিনি গুরুদেবের পরম আদরের ধন।

একবার পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী কোন একস্থানে (জ্বালা-মুখীর সন্নিকটে) ভৃগুর আশ্রম নামক আশ্রমে কোন ইংরাজ রাজপুরুষ ভৃগুরাম পরমহংস দেবের নিকট আসিয়া কিছু যোগ-বিভূতি দেখিবার প্রয়াসী হন। পরমহংস দেব বলিয়া-ছিলেন, "তোমরা কি আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে চাও?" সাহেব "আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাই দেখান" এই কথা বলিলেন। তৎক্ষণাৎ পরমহংস মহারাজকে আর সেই স্থানে দেখা গেল না। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ঐ সাহেবের একটি ১৯।২০ বৎসরের ছেলে সেখানে দাঁড়াইয়া-ছিল, সে হঠাৎ পড়িয়া গেল। অমনই পরমহংস দেব ঐ বালকের বক্ষঃস্থলে বসিয়া তাহার পেট চিরিয়া নাড়ী-ভুঁড়ি টানিয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। বালক মরিয়া গিয়াছে ও একজন সন্ন্যাসী তাহার নাড়ী-ভুঁড়ি বাহির করিতেছে, দেখিয়া সাহেব ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া ঐ সন্ন্যাসীর দিকে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একটি গুলিও তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিল না। কে যেন উহা হাতে করিয়া ঠেলিয়া দিতে

লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসিবর বাতাসে ভর দিয়া শূন্যমার্গে চলিতে চলিতে এক পর্ব্বত-শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। সাহেব ও মেম পুত্র-শোকে কাতর হইয়া অত্যন্ত কাঁদিতেছেন দেখিয়া স্বামীজী কোথা হইতে আসিয়া হাসিমুখে বালককে হস্ত ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিলেন। বালকও হাসিতে লাগিল। মেম ও সাহেব বুঝিলেন না, ইহা কি ব্যাপার। সন্ন্যাসিবর বলিলেন, ইহাই যোগ-বিভূতি। সাহেব সেই অবধি নানা উপচারে, স্বামীজী যতদিন সেইস্থানে ছিলেন, সেবা করিয়া যাইতেন।

আপন গুরুদেবের সঙ্গে থাকা কালে পরমহংস মহারাজ ভৃগুরাম স্বামী দেখিলেন, পর্ব্বত হইতে জলের স্রোতঃ তীব্র গতিতে বিকট শব্দ করিতে করিতে নীচে পতিত হইতেছে। সেই শব্দে গুরুদেবের কর্ণে আঘাত লাগিতেছে। দেখিতে দেখিতে পরমহংস মহারাজ পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া পতিত জলস্রোতকে হাতে ধরিয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে নামিয়া পড়িলেন। জলস্রোতও সেই সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গা বহিয়া নীচে নিঃশব্দে পতিত হইতে লাগিল। এইপ্রকার আরও অনেক ঘটনা শুনিয়াছিলাম।

আমার রাত্রি যাপন প্রায়ই বাবাজী গুরুমহারাজের সঙ্গেই হইতে লাগিল। কোথায় আসানসোল আর কোথায় গুষ্করা, যেন মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার নিকট গিয়া পড়িতাম। আমি সদর দরজার নিকট দাঁড়াইবামাত্র ভিতর হইতে কে সেই

করুণা-মাখা শব্দে "উপেন্দ্র আসিয়াছে" বলিয়া নিমেষের মধ্যে দরজার নিকট আসিয়া কপাট খুলিয়া দিতেন।

তিনি যে কুঠ্রীতে তপস্যা করিতেন, সেই কুঠ্রী হইতে সদর দরজা কিছুদূর। চীৎকার করিয়া ডাকিলে শুনা যায়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমি দরজার নিকট দাঁড়াইবা-মাত্র কে যেন দরজার অন্য দিক দিয়া "উপেন্দ্র আসিয়াছে" বলিয়া কপাট খুলিয়া দিতেন।

সমস্ত রাত্রি চক্ষে আমার ঘুম আসিত না, তিনি একাসনে একভাবে থাকিয়া কত কৌতূহলপূর্ণ গল্প ও কত সদুপদেশ দিয়া আনন্দ বর্ষণ করিতেন।

ক্রমশঃ ১৯০২ সাল গত হইয়া গেল। আসানসোলে নানাপ্রকার ঝন্ঝাটে আমাকে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করিল। বিপদের উপর বিপদ—যেন জীবন-সমস্যায় একটা ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। এই সুযোগে ইহাই আমার শুভদিন। ভাবিলাম, বিপদ না হইলে ভগবানের কৃপা, শ্রীগুরুর কৃপা ও ভালবাসা, অনুভব শক্তিতে আনিবার সুযোগ হয় না। ইহাই প্রকৃত সুবিধা।

আজ আমার ভবপারের কাণ্ডারীর কৃপায় আমি প্রায় সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে লাগিলাম। জানি না, অন্তর্য্যামিরূপে কে আমাকে বিপদ-সমুদ্র হইতে, সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গের ভিতর হইতে, 'ভয় নাই', 'ভয় নাই' বলিয়া টানিয়া আনিয়া তীরে তুলিতে লাগিলেন। আমি প্রত্যেক

বিপদের মধ্যেই আনন্দে ভাসিতে লাগিলাম। দেখাইলেন, জগতে এক আনন্দ ছাড়া কিছু নাই, ইহা আনন্দময়ের আনন্দের হাট। প্রকৃত কাণ্ডারী বিহনে জীব জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারাবদ্ধ হইয়া তুফানে পড়িয়া মায়ামরীচিকায় হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের ভাব মনে অঙ্কিত করিয়া ডুবিতেছে, উঠিতেছে; আর পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া পরস্পরকে পরস্পরের অদৃষ্টের কথা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সময়ে বণ্ডুলে হর-হরি প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া বাবা আমাকে সংবাদ দেন।

একদিন (২৯শে জানুয়ারী, ১৯০৩) আসানসোলের উত্তরে ২০।২২ মাইল দূরে আমি এক কঠিন বিপজ্জালে জড়িত হইয়া জাল ছিঁড়িয়া পলাইবার পন্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, যে-দিকে তাকাই সে দিকেই অসীম বিপদ-সমুদ্র আমাকে ঘিরিয়া আছে। অন্যদিকে দেখি, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড—অগ্নিশিখা লক্লক্ করিতে করিতে আমাকে তাহার মধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে বলিতেছে, যেন পুড়াইয়া ছারখার করিতে চায়। রাত্রি প্রায় তখন ২টা—নিদ্রা চক্ষে আসে নাই। চিন্তাবায়ু আমাকে উগ্রমূর্ত্তিতে তোলপাড় করিতে লাগিল। প্রাতঃকালেই উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ আসিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, কূল-কিনারা নাই। যে বাসায় থাকিতাম তাহার উত্তর ধারে একটি নদী আছে, সেই রাত্রে সেই নদী-তীরে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া কি

করিয়া এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব, তাহার প্রতিকারকল্পনায় চিন্তাকুল প্রাণে হা-হতাশ করিতেছি। জানি না, শ্রীগুরু-ভগবানের কি অচিন্তনীয় শক্তি,—বিদ্যুদ্‌গতিতে কি এক আলোক আমার নয়ন-পথে পতিত হইল। আলোর নিকটে যাইতেছি, এমন সময় অন্তর্য্যামিরূপে কে বলিল, 'উহা মায়িক আলোক, উহাই তোমার ধ্বংসের প্রতিমূর্ত্তি, যাইও না।' এখনও সেই শব্দ আমার কর্ণে বর্ত্তমান, আমি ক্ষিপ্রগতিতে ফিরিয়া পাথরের উপর বসিলাম। প্রায় ভোর হয়, একটি ব্রাহ্মণ নদীপার হইতেছে, দেখিলাম। তিনি বলিলেন, "চিন্তা কি? উপায় হবে।" বলিয়া তিনি নদীগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

আমি বাসায় ফিরিবার মুখে দেখি, বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার শত শত উপায় আমার সম্মুখে উপস্থিত। গ্রহণ করিলাম না। অশ্রুতে চক্ষু ও বক্ষ ভাসিতে লাগিল। কি অদ্ভুত একাগ্রতা আসিয়া চতুর্দ্দিকেই বিপদ-কাণ্ডারীকে দর্শন করিতে লাগিলাম।

বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম—সব স্থির, কে যেন কোথায় সমস্ত বিপদরাশি সরাইয়া দিয়াছেন। আনন্দে সেদিন আর আহার পর্য্যন্ত করি নাই। সকলেই আসিয়া কার্য্য দেখিয়া আনন্দে চলিয়া গেলেন। তাহার পরদিন পত্র পাইলাম। "চিন্তা কি? বৃথা চিন্তা করিও না, নির্ভর করিতে শিক্ষা কর, নির্ভর ভিন্ন জীবের গতি নাই।"

ক্রমশঃ শীত গত হইল। বসন্ত আসিয়া শীতের স্থান দখল করিয়া বসিল। কিন্তু তবুও আমার বিপদের শেষ নাই। উপরি উপরি বিপদ আসিয়া পড়িতে লাগিল।

গুরুজী আমার পত্নীকে কবচ ও ঔষধ দেওয়ার পর তাহার দুরারোগ্য রোগ কোথায় চলিয়া গেল। এখন সে অন্তঃসত্ত্বা। সেই সময় তাহার ভ্রূর মধ্যস্থলে এক ব্রণ উঠিয়া সমস্ত মুখ হাঁড়ির মত ফুলিয়া গেল। প্রাণের মধ্যে বড়ই ভয় হইল। প্রভুর নিকট চলিয়া গেলাম। স্নান-জল আনিয়া দিলাম। ক্রমশঃ সারিতে লাগিল। তাহার পর তাহাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম।

কিছুদিন পর আমি অত্যন্ত অসুখে পড়ি। ১৭ দিন জ্বর ত্যাগ হয় নাই। সেই সময় আমার শত্রুকুল আবার আমাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। তখন বাবাজীর সহিত আমার খুব শীঘ্র শীঘ্র সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। শত্রুদের মধ্যে অনেকেই এখন আমার গুরুভাই হইয়াছে। তাহারা আমার ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া নানা বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াও পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য্য হইতে থাকায় সন্ধানে জানিল, উপেন্দ্র প্রায় তাহার গুরুর নিকট যায়, তাহার গুরু বড়ই তেজস্বী ও উগ্রতপস্বী, সমস্ত বিপদ হইতে তিনিই উপেন্দ্রকে রক্ষা করিতেছেন। সেই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমার গুরুকে হস্তগত করিয়া আমাকে বিপদে ফেলিবে, এই প্রস্তাব আঁটিয়া তাহারা গুরুজীর সন্ধান

লইয়া তাঁহার নিকট গতিবিধি করিতে লাগিল। তাহারা যাইতে আরম্ভ করিলে অন্তর্য্যামী গুরুজী তাহাদের অন্তরের ভাব জানিতে পারিলেন। ভাব গোপন করিয়া তাহাদিগকে আদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাহারা যায়, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোন কথা সাহস করিয়া উত্থাপন করিতে পারে নাই। তাহারাও গুরুজীর সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু খল প্রকৃতি ছাড়ে নাই।

একদিন গুরুজীর নিকট আমার বিরুদ্ধে ২।৪ কথা আরম্ভ করিলে গুরুদেব বলিয়াছিলেন, "উপেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তোমরা আমার নিকট আসিও না, ইহা বিবাদ-কলহের স্থান নয়। ইহা আনন্দ-নিকেতন।" তাহাদের মুখ সেই দিন হইতে রুদ্ধ হইল। তাহারা যাওয়া-আসা কিছু-দিনের জন্য বন্ধ করিল। কিন্তু একজন আর বন্ধ করিল না। প্রায় যাওয়া-আসা করিতেছিল।

তাহার পর বিপক্ষগণ একে একে বিপজ্জালে জড়িত হইতে লাগিল, আর বিপদ-কাণ্ডারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল ও বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে লাগিল।

একদিন আমি শ্রীচরণ-প্রান্তে বসিয়া পদ-সেবা করিতেছি, এমন সময়ে গুরুজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার অনেক শত্রু। বাবা, তোমার গুণও যত, দোষও তত। দোষের ভাগ নষ্ট করিয়া উহা গুণে পরিণত করাই গুরুর কর্ত্তব্য।

দোষযুক্ত জীব কি কখন শিবত্ব প্রাপ্ত হয় ? সমস্ত সদ্‌গুণ যতদিন জীবকে আশ্রয় না করে, ততদিন কি ভগবান্ লাভ হয় ? ইহার মূল কারণ গুণ-বৈষম্য। গুণ-বৈষম্যেই সৃষ্টি চলিতেছে, সমগুণে সৃষ্টি হয় না। কল্পনায় চিত্ত কলুষিত হয়। তোমার অসৎ বৃত্তি ছাড়াইতে আমার অনেক সময় লাগে। তুমি এক মুহূর্ত্তে যে দূষিত বৃত্তি চিত্তে আন, সেই এক বৃত্তিকে নষ্ট করিতে কি কম পরিশ্রম করিতে হয় ? এখন তোমার ব্যভিচারী মনকে নষ্ট করিতে হইবে, তোমাকে কিছু দণ্ড দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। দণ্ড ভোগ ভিন্ন কি চিত্ত শুদ্ধ হয় ? যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে হইবে, আর সেই ছট্‌ফটানির তীব্র যন্ত্রণায় ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে ময়লা পরিষ্কার হইবে। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইবে।”

আমার ভারি দুশ্চিন্তা উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম, বড় কঠিন পথ, কিছু কুকাজ করা দূরে থাক্, মনে চিন্তা করিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। চিত্তে কোন কলুষিত বৃত্তি উদয় হইতে না হইতে, কিছু চিন্তা না করিতে করিতে, ইনি সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন। বুঝি আবার কি বিপদ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে অপেক্ষা করিতেছে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। গুরুজীর নিকট রাত্রে নানাভাবে আনন্দে কাটাইলাম, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক এক বিপদের ভাবনা ভাবিয়া চমকিয়া উঠিতাম।

কালীপদ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি সাহস দিলেন

যে, গুরুজী আছেন, ভাবনা কি? বলিলাম, "তিনি নিজেই যখন কঠোর দণ্ড দিবেন তখন দাঁড়াই কার কাছে? রাম নিজেই মারিতেছেন তো দোহাই দিব কাহার?" চিন্তা করিতে করিতে স্বস্থানে ফিরিলাম। অনুসন্ধান করিলাম, কিছুই বিপদের কথা জানিতে, কি শুনিতে পাইলাম না।

তবে পরে জানিলাম, যেদিন গুরুজী বলিয়াছেন ঠিক সেই দিনই গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র হইয়া গিয়াছে।

এই সময় আমার উপরিস্থ ইন্‌স্পেক্টর এক সাহেব প্রভুর শুভাগমন হইল। বাঙ্গালীর স্থানে ইংরাজ ইন্‌স্পেক্টর আসানসোলে আসিল। সাহেব প্রভু আসিয়া কথার মিষ্টতায় আমার সঙ্গে খুব মেশামেশি করিতে চাহেন কিন্তু আমি তফাৎ তফাৎ থাকি। তিনি বন্ধুভাব রাখিতে চান, আমি মনিব-প্রভুর যে সম্বন্ধ, তাহাই বজায় রাখিতে চাই। কি জানি কালসর্প কোন্ সময় দংশিবে—বিষে ছট্‌ফট্ করিব। পরিণামে প্রভুর কুদৃষ্টি আমার উপর পড়িল। ঘরের ২।১ জন শত্রু কুমীর হইয়া প্রভুর সঙ্গে যোগ দিয়া আমাকে বিপদে ফেলিবার চক্রান্ত আরম্ভ করিল।

এই সময় দক্ষিণারঞ্জন রায়-চৌধুরী (এখন আমার গুরুভাই) ঐ সাহেব প্রভুর কেরাণী হইয়া আসিলেন। ইহার সহিত আমার শুভক্ষণেই দেখা, বলিতে হইবে—ইনি আমার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। স্বভাব সুন্দর, ব্রাহ্মণ-পুত্র, আচারী ও নিষ্ঠাবান্। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা

৺রাধিকাপ্রসাদ রায়-চৌধুরী বি, এ, মহাশয় রাণীগঞ্জের নিকট উখরা-স্কুলে হেড্‌মাষ্টারী করিতেন। তিনিও কয়েকদিন পর আসা-যাওয়া করিতেন লাগিলেন।

চোখাচোখি হইবার পর হইতেই আত্মায় আত্মায় মিল হইয়া গেল। তিনি মধ্যে মধ্যে ২।৩ দিন আমার নিকট থাকিতেন। সদাই ভগবানের কথা, হাসি-হাসি মুখ, ডব্‌ডবে জল-ভরা চক্ষুদুটি। তাঁহার সহিত দেখা হবার পর গুরুজীর কথা উত্থাপন করি। তিনি বলিলেন, "সেই দীঘনগরের নিকট আদরা-কৈতারা আশ্রমের শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট আমি গুঙ্করার গুরুজীর নাম শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহার দর্শন পাই নাই। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার বড়ই ইচ্ছা।" আমাকে বলিলেন, "দাদা, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে?" আমি সম্মত হইলাম।

শুনিলাম, রাধিকার পিতা সরপি-নিবাসী ৺গিরিশচন্দ্র রায়-চৌধুরী খুব নিষ্ঠাবান্ সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন। দক্ষিণা ও রাধিকা এই সময় হইতেই প্রায় আমার সঙ্গে গিয়া রাত্রি বাস করিয়া আসিতেন। রাধিকা ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু, দক্ষিণা কিন্তু তখন তাহা নহেন। চাকুরির উন্নতি কিসে হইবে, সেই জন্যই দক্ষিণার যাওয়া। তবে উভয়ের আধার ভাল। দক্ষিণাও আমাকে বন্ধুভাবে দেখিতেন, এবং আমার বিপদকে নিজের বিপদ জ্ঞান করিতেন। কথায় কথায় বলিলেন,

"আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঠিক হইয়াছে।" একদিন থানার কার্য্য শেষ করিয়া বাসায় গিয়া শুইয়া আছি, একটু নিদ্রাও আসিয়াছে, এমন সময় এক সিপাই গিয়া বলিল, "বাবু, থানায় আস্থন, সাহেব আসিয়াছেন।" বলিয়া ডাক দিল। মনে করিলাম, আসানসোলে সাহেবের অভাব নাই, গার্ড ড্রাইভার প্রভৃতি কেহ আসিয়া থাকিবেন।

একটু পরে থানায় গিয়া দেখি, তিনটি উচ্চতর, উচ্চতম, বড় প্রভুরা আসিয়া বারাণ্ডায় কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। আমি উপস্থিত হইবামাত্র বড় প্রভু বলিলেন, "তোমার পোষাক কই, বিনা পোষাকে কেন আসিলে?" বলিলাম, "সাহেব, আমরা কি পোষাক পরিয়া খাইয়া বাসায় শুইয়া থাকি? তোমরা আসিয়াছ, আমি কি প্রকারে জানিব? কোন সংবাদ দাও নাই কেন?" এই সকল সাহেবের পার্শ্বে আমার ইন্‌স্পেক্টর সাহেব Mr. A. O. Toda দাঁড়াইয়া, বিষধর সর্পের ন্যায় ফোঁস্-ফোঁস্ করিতেছেন। শুনিলাম, ইনিই প্রভুদিগকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। অন্য সময় কোন উচ্চপদস্থ প্রভু আসিলে আনিবার ভার আমার উপরই থাকিত, এবারে সব গোপন। থানার আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ অনেকেই জানিত, কিন্তু আমার নিকট সবই গোপন রাখিয়াছিল। হায়রে বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালি! যাহাদের শত শত দোষ আমি নিজের মাথায় চাপাইয়া তাহাদিগকে কত শত বার বাঁচাইয়াছি,

যাহাদের জন্য ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে আমার বিরোধ, তাহারাই আজ ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের পক্ষ হইয়া আমাকে ধ্বংস করিবার অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

দাঁড়াইয়া বুঝিলাম, আমার বিরুদ্ধে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব গোপনে গোপনে রিপোর্ট করিয়াছেন। সেই রিপোর্টের তদন্ত জন্য বড় বড় সাহেব আসিয়াছেন।

আমাকে বলা হইল, "তুমি কি বলিতে চাও?" আমি বলিলাম, "কিছুই না।" তাহারা বলিল "কেন?" আমি বলিলাম, "তোমরা বিচার করিতে আস নাই। তোমরা পক্ষ সমর্থন করিতে আসিয়াছ, তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" আমার বিরুদ্ধে প্রসিডিং হইল। তাহাতে আমাকে ডিগ্রেড করা হইল। ভাবিলাম, অদ্ভুত বিচার, চাকৃরির হিসাব এই প্রকারই বটে। গুরুজীর পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন, "আমিই এ দণ্ড করিয়াছি। মায় সুদ ওয়াশীল আমিই করিয়া দিব।"

দেখিতে দেখিতে বর্ষার শেষ হইয়া আসিল। গুরুজীর পত্র পাইলাম—"উপেন্দ্র, অতঃপর বর্দ্ধমানে বদ্‌লি হইবে। প্রস্তুত হও। আর তুমি সংবাদ দাও নাই। বধূমাতা অন্তঃসত্ত্বা। এখন নির্দ্দোষ নহে, শান্তি ও প্রতীকার দরকার। শীঘ্র মধ্যে একটি লাল রঙের সাটি খরিদ করিয়া বিন্ধ্যাচলে পূজ্যপাদ নিমানন্দ পরমহংসের নিকট পাঠাইয়া দিবে, বিলম্ব করিবে না।" আমি পত্র পাইয়া কলিকাতায় গিয়া একটা লাল রঙের বেনারসী সাড়ী ৯০৲ টাকায় খরিদ

করিয়া বিন্ধ্যাচলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিলাম এবং গুরুজীকে সংবাদ দিলাম।

কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে কামরূপ-কামাখ্যা হইতে পত্র পাইলাম, "তোমার সাড়ির কার্য্য হইয়া গিয়াছে। কোন্ ঠিকানায় ঐ সাড়ি পাঠাইব, তাহা লিখিবে।" গুরুজীর আদেশ লইয়া আমি নিবেদন করিলাম যে, সাড়িতে আমার আবশ্যক নাই। যাহা ইচ্ছা, করিতে পারেন। ইহার কিছু দিন পরে বর্দ্ধমানে আমার বদলি হইল। আমি বর্দ্ধমানে রিজার্ভের দারগা হইয়া গেলাম। গেলাম বটে, কিন্তু মনে সুখ নাই। যে সাহেব (Mr. R. F. Guise) সম্প্রতি নূতন বদলি হইয়া আসিয়াছেন, ইনি খুব বিচারক বটেন, কিন্তু অদৃষ্টচক্রে তিনি আসানসোল পরিদর্শন করিতে আসিয়া কাগজে-কলমে আমার কোন দোষ পান নাই, কিন্তু লাগান-বাজানে কান ভারি করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, যতদূর পারি, কার্য্য সুস্থিরভাবে করিয়া যাই। আমার সুবিধা হইল। গুস্করা বর্দ্ধমানের নিকট, প্রায় রাত্রিবাস গুরুজীর সঙ্গে হইয়া থাকে। ছুটি পাইলে দিবসে, না পাইলে রাত্রে গিয়া পদসেবা করিতাম।

একদিন রাত্রে বলিলেন, "আমি তোমাকে যে কাজ করিতে নিষেধ করি, তুমি তাহা কেন কর। নিজে কষ্ট পাও, দেখিয়া আমার দুঃখ হয়।" আমি বলিলাম, "গুরুদেব, আমি এখন সততই বিপদ খুঁজিতেছি। যতই বিপদে পড়ি,

ততই আমি আপনার কৃপা উপলব্ধি করি।” তিনি যাহা নির্দ্দেশ করিতেন, আমি বিপদকে আহ্বান করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতাম। জলে ডুবিতাম, অগ্নিতে দগ্ধ হইতাম, তবু আদেশ পালন করিতাম না। উদ্দেশ্য, অনেকটা পরীক্ষা করাও ছিল। পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতাম, আর ভগবান্ গুরুদেবের অশেষ কৃপা ও অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করিতাম। কি অন্যায় কাজই করিয়াছি! গুরুদেব, আজ দন্তে তৃণ লইয়া আপনার নিকট শত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিতে গিয়া বিপদ্রূপ অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কতই কাঁদিয়াছি। আর আপনাকে আমার জন্য কতই কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে! আজ আর ঘৃণায় ও লজ্জায় মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। তাই ভাবি, কি দুর্ম্মতি আসিয়াছিল। তাই আপনাকে অযথা কষ্ট দিয়া নিজেকে কলুষিত করিয়াছি। আজ সকল অপরাধের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কৃপাময় গুরু রুষ্ট হইলে জীবের আর স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল মধ্যে দাঁড়ইবার স্থান নাই। আমি যত রকমে পরীক্ষা করিতে গিয়াছি, আপনি সদয় হইয়া প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে কৃপাবর্ষণ করিয়া আমার বিশ্বাস দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মায়িক আমি নীচকুলোদ্ভব, আমি আপনার গুণ কি বুঝিব, প্রভু! যতটুকু দয়া করিয়া দেখাইয়াছেন, বুঝাইয়াছেন, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যতটুকু প্রবেশ

করে এতটুকুই দিয়াছেন। অসীম কৃপা, অসীম ভালবাসা, ইহা জন্মজন্মান্তর হৃদয়ে অঙ্কিত-খোদিত থাকিবে। এ ভালবাসা এ-জগতের নয়, এ যে স্বর্গীয় ভালবাসা, এ যে দেবতার ভালবাসা, ইহা জীবনে যাবে না, মরণে যাবে না, প্রলয়ে যাবে না। হে দয়াময়, হে হৃদয়ের রাজা, আমায় ক্ষমা করুন। আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

এই সময় তাঁহার নিকট ৺শিবরাত্রি করি। তিনি সম্মুখে বসাইয়া ৺শিব ঠাকুরের পূজা দেখাইয়া দেন। তিনি আর আমি গুস্করার কাছারী বাড়ীর চাতালে বসিয়া পূজা করিলাম। চারি প্রহরে চারি বার পূজা সমাধা করা হইল। তাঁহার পদ-সেবায় সমস্ত রাত্রি কাটিল। তিনি কত রকমের উপদেশ-পূর্ণ কথা ও গল্প বলিতে লাগিলেন।

ভোর ভোর উঠিয়া স্নান করিয়া তিনি ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া নিত্য-কর্ম্ম সমাধা করিয়া বাহিরে আসিলেন। অদ্ভুত রকমের মিষ্টান্ন, মালপুয়া, কচুরি, ফল, ক্ষীর প্রভৃতি প্রসাদ স্বহস্তে বিতরণ করিলেন। বলিলেন, "এই বৎসর দুইজনায় শিবরাত্রি করিলাম। ইহার পর ক্রমশঃ কি সমারোহ হইবে, তাহা দেখিবে। দাদাগুরুদেব বণ্ডুলে ৺হরহরি প্রতিষ্ঠা ও আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য মহা জেদ করিতেছেন। আমি অনেক প্রতিবাদ করিয়া পত্র লিখিতেছি, কিন্তু কি তাহারা বুঝিয়াছেন, জানি না। আমার কথা শুনিতে চাহেন না।

আমার এই ৺হরহরির পূজা করিয়া অভীষ্ট লাভ হইয়াছে, এইবার উহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুমতি আসিতেছে।” তিনি আরও বলিলেন, “আমি লিখিয়াছিলাম, ‘হরহরি আমি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিব। আপনি কেন উহা প্রতিষ্ঠা করিতে ও শিষ্য করিতে আদেশ দিতেছেন? শিষ্য আবার করে! কে বাপু অত ঝঞ্ঝাট বাড়ায়? শিষ্য ভূতে করে, আমার কি দরকার।’ তাহাতে দাদাগুরুদেব ভৃগুরাম পরমহংস মহারাজ লিখিয়াছেন, ‘দেখ, তুমি নদীতে, পাহাড়ে, সমুদ্রে যে স্থানেই উহা রাখ, আমি উহা বাহির করিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠা করাইব। গুরুদেব মহাতপার আদেশ, তোমাকে করিতেই হইবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে জীবের মঙ্গল সাধনা কর’।”

আর একদিন বলিলেন, “দেখ, দেব-জ্যোতিষ তাঁহারা দিয়াছিলেন, উহা ব্যবহার করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া সদ্ব্যয় করিব বলিয়া রাখিয়াছিলাম, সে সমস্ত অর্থ আমার নিকট হইতে লইলেন, জ্যোতিষ-আলোচনা বারণ করিলেন। দাদাগুরুদেবের নিকট হইতে চিঠি আসে, তুমি আর জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করিবে না।” সেই সময় আমি দেখিয়াছি যে, গুরুজী কোষ্ঠী লিখিতেছিলেন। পত্র লেখা সত্ত্বেও বন্ধ করেন নাই। দ্বিতীয় বারের পত্র একটু উগ্র হাতে লিখিয়াছেন, “জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করিলে গুরুহত্যার পাতকী হইবে, আর তোমার তপঃ-প্রভাব নষ্ট

হইবে।” এই পত্র পাইবার পর আর কোষ্ঠী রচনা করিতেন না।

এই সময় আমাদের গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ গোস্বামী মহাশয় আমার নিকট বর্দ্ধমানে আসেন। এই ব্রাহ্মণ বড়ই সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান্ ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বহু শিষ্য করিয়া গিয়াছেন। ইনিও শিষ্য করিতেন। আমাকেও শিষ্য করিবার অভিপ্রায়ে ছিলেন। পরে গুরুজীর কথা আমার নিকট শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা আমার নিকট প্রকাশ করেন। আমিও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গুস্করায় যাই। সেখানে গুরুজীকে দর্শন করিলেন, কিন্তু মনে একটু অভিমান আসিল। ভাবিলেন, “আমারও অনেক শিষ্য, আমিও ত গুরু। সুতরাং আমিই বা কম কিসে ?”

বাহিরে বসিয়া বসিয়া তিনি এই রকম চিন্তা করিতেছেন, আর আমি গুরুজীর নিকট ঘরের ভিতর বসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছি। গুরুজী বলিলেন, “ওঁকে কোথায় পেলে ?” আমি বলিলাম, “আমাদের গ্রামে ওঁর শিষ্য-সেবক অনেক আছে।” তিনি বলিলেন, “এই ব্যক্তির অভিমান আসিয়াছে, তাই বাহিরে বসিয়া আছেন। এখনও ঠিক ঘরে দাঁড়াইতে উঁহার অনেক দেরি গো।” আমি বলিলাম, “ওঁকে একটু কৃপা করিবেন।” তাহাতে গুরুজী বলিলেন, “আমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তবে বিলম্ব আছে। আহা বেচারার বড়ই কষ্ট, সংসারে ঝালাপালা হইয়া

বেড়াইতেছে।” ইনি পরে ১৯০৯ সালে গুরুজীর শিষ্য হইয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে রাঁচিতে শিষ্যালয়ে দেহ রাখেন।

গুরুজী আদর্শ চরিত্রের সাধু ছিলেন। গুষ্করায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সমস্বরে তাঁহার আদর্শ চরিত্রের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। তাঁহারা তখন পর্য্যন্ত অনেকেই ভিতরের ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। তবে ইনি যে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, ইহা সকলেই জানিত।

একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের স্বামী অনেক দিন আইসে নাই। একদিন সে গুরুজীকে সামান্য মানুষ জ্ঞানে বলে, “তুমি আমার সঙ্গে থাকিবে?” গুরুজী বলিলেন, “তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? তিনি কি বলেন?” স্ত্রীলোকটি অধোবদনে দাঁড়াইয়া নীচুমুখে মাটি খুঁটিতেছিল। এমন সময় দৈবগতিকে তাহার পিতা সেই স্থানে উপস্থিত হন। তাহার পিতাকে দেখিয়া গুরুদেব বলেন, “হ্যাঁ গা, তোমার কন্যা আমার সঙ্গে থাকিতে চায় কেন? উহার বিবাহ দিয়াছ, উহার স্বামীকে আনিবার ব্যবস্থা কেন কর নাই? ওকে বাপু কিছু বোলো না। তোমার টাকা না থাকে, আমি কিছু দেব, উহার স্বামীকে আসিবার জন্য খবর পাঠাইয়া দেও।”

তিনি রাত্রিকালে কখন কখন কাছারী বাড়ীর পূর্ব্বদ্বারী ঘরের মধ্যে তপস্যা করিতেন, আর কখন কখন মহানিশায় নিকটবর্ত্তী নদী-তীরে শ্মশানে গমন করিতেন।

গ্রামের অনেক ছোক্‌রা সন্ধান নেয় যে, ইনি রাত্রে

কোথায় যান। তাহারা কয়েক রাত্রি কাছারী বাড়ীর বাহিরে লুকাইয়া থাকে। একদিন মহানিশায় পরম যোগিরাজ মহাশ্মশানে জগদম্বার আরাধনা করিতে যাইতেছেন, সেই সময় ২।১টি ছোক্‌রা বাবাজীর পেছু নেয়। ইনি তাহা জানিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করেন ও বলেন, "তোমরা নিরস্ত হও। পেছু পেছু আসিও না, আসিলে বিপদে পড়িবে।"

ইহাদের সঙ্গে চোঙ্গদার জমীদারদের রামলাল নন্দীর ভাইও থাকিত। সেদিন তাহারা ফেরত আসে। বাবাজী সকালে রামলালকে তাহার ভাইকে ঐরূপ দুষ্ট ছোক্‌রাদের সঙ্গে মিশিয়া রাত্রে এই সকল করিতে নিষেধ করিতে বলেন। তাহারা কাহারও কথা না শুনিয়া উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন ঐ প্রকার করিলে হঠাৎ রাত্রে রাম নন্দীর ভাইয়ের সমূহ বিপদ হয়। সে কাছারী বাড়ীর উত্তর ধারের পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছিল। বাবাজী নদীতীর হইতে ঐ শব্দ শুনিতে পাইয়া পুষ্করিণীর নিকটে আসেন ও তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া রামলালকে সংবাদ দেন। রামলাল তাহার ভাইকে ওখান হইতে দেশে পাঠাইয়া দেন।

একদিন রাত্রিতে বসিয়া পদসেবা করিতেছি, এমন সময় বলিলেন, "বাবা, জগতে সত্যের আদর ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। যাহাদের সত্যের আঁট নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই, তাহারা কোনকালে ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারে না। সত্যই

ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব ধন। সত্যহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-সমান। যে সত্যকে যে পরিমাণ ত্যাগ করিয়া অসত্যকে আশ্রয় দিয়াছে, সে সেই পরিমাণ মায়ার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। আমি সত্য-রক্ষার জন্য জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি, তোমরাও সত্য লইয়া থাক। বড় বড় উপাধিধারী পণ্ডিত মুখে উচ্চ-উচ্চ কথা বলেন। শ্লোক সকল অনর্গল আবৃত্তি করেন, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া ঠিক ঠিক কর্ম্ম করিতে পারেন না। সেদিন বাবা কলিকাতা হইতে দুইটি বড়লোক তিন চারটি খুব বড় বড় পণ্ডিত লইয়া আমার নিকট আসিলেন। গুপ্ত অভিপ্রায় ছাপাইয়া কথা আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, 'নাভিধৌতি কি আপনার জানা আছে? আপনার অনেক শক্তির কথা শুনিয়া আমরা আসিয়াছি। দয়া করিয়া কিছু শিক্ষা দেন।' ইঁহারা আমার বুজরুকী ভাঙ্গিবার জন্য পরামর্শ করিয়া আসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, 'বাবু, আমি কি শিক্ষা দিব? তোমরা আমার বুজরুকী ভাঙ্গ না। ভালই ত'।' এই কথা বলিবামাত্র একটি ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া জোড় হস্তে বলিলেন, 'বাবা রক্ষা করুন। আমরা বাস্তবিক এই কল্পনা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম। বাস্তবিকই আপনি অন্তর্য্যামী। আপনার নিকট কিছুই ছাপাইবার জো নাই। অপরাধ গ্রহণ করিবেন না'।"

একদিন সন্ধ্যার পর আমি পদসেবা করিতেছি। তিনি শাস্ত্র-কথা, যোগের বিভূতি ইত্যাদি উপদেশ দিতেছেন।

এমন সময়ে কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, সবই ত শুনিয়া যাইতেছি, কিন্তু কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিব? আপনি সর্ব্বদাই বলেন, সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া না জানিলে কিছুই ঠিক জানা যায় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্যই বা কি, আর মিথ্যাই বা কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

গুরুদেব। বাবা, মনে মনে বুঝিলে চলিবে না, ইহা তপস্যার দ্বারা জানিতে হয়। নিজে খাঁটি না হলে কি সদ্বস্তু জানা যায়? অসদ্বৃত্তি থাকিতে সত্যের উদয় হয় না। উপরে লোক-দেখান ভজনে কিছু হবে না। সংযম ও অন্তর্মুখতা না হলে হয় না। সে-দেশের সবই উল্টা।

বলিয়া মধুর কণ্ঠে এক গান গাহিলেন। গান শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম। সেরূপ মধুর কণ্ঠে গান আমি আর শুনি নাই। অদ্যাবধি কোথাও গান শুনিতে গেলে আর গান ভাল লাগে না। সেই গান, সেই মধুর নাদ, আজ পর্য্যন্ত আমার কর্ণে রহিয়াছে। তিনি প্রায় প্রতি রাত্রেই (গভীর রাত্রে) আপন মনে, আমি যখন অন্যমনস্ক হইতাম, এমনি গান আরম্ভ করিতেন; আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। মধুর শব্দ শ্রবণে বিষধর সর্প যেমন ফণা উচ্চ করিয়া স্থির থাকে, আমার অবস্থাও সেইরূপ হইত। এখনও সেই প্রকার সুমিষ্ট গান শুনাইবার জন্য অনেকবার বলিয়াছি—কিন্তু আর হয় না। বলেন, "উপেন্দ্র, সেদিন আর নাই।"

আমি সন্ধ্যার সময় একদিন পদসেবা করিতেছি, এমন সময় বলিলাম, "জগৎ মিথ্যা বলে ; ইহা কি ঠিক ?" উত্তরে বলিলেন, "কেহ মিথ্যা দেখে, আর যাহার জ্ঞান হইয়াছে, প্রজ্ঞা-চক্ষু ফুটিয়াছে, সে দেখে, ঈশ্বরই সব হইয়াছেন।" আমি বলিলাম, "আমাদের জ্ঞান হয় নাই। আমরা যাহা দেখি, তাহার কি অস্তিত্ব নাই ? তবে কেমন করিয়া জগতের সর্ব্বদ্রব্যই চক্ষের উপর ভাসিতেছে ? কিছু না থাকিলে কি কিছুর উদয় হয় ?"

গুরুদেব। ভ্রমে অসত্যে সত্য-প্রতীতি হয়, জ্ঞানে যাহা নাই, অজ্ঞানে তাহা থাকার মতন দেখায়। ঐ যে জবা পুষ্প দেখিতেছ, উহা তোমার চক্ষে জবা। কিন্তু বাস্তবিকই কি উহা জবা ?"

আমি বলিলাম, "কেন বাবা, এখনই তুলিয়া আনিয়া আমি আপনাকে দিই, দেখুন উহা জবা কিনা।" কিঞ্চিৎ হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "কই, তোমার জবা ফুল আন।" আমি উঠিয়া জবা গাছের নিকট গেলাম। ফুল তুলিয়া দেখিলাম, উহা জবা নহে, গোলাপ পুষ্প। আমি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। ভাবিলাম, জবা ছিল, গোলাপ কি প্রকারে হইল! গাছটা তবে কি ? দেখি, গোলাপ গাছ। আমি নিরুত্তর। তদবধি উহা গোলাপই রহিল। তিনি বলিলেন, "তোমার চক্ষে যে রং আছে, তুমি তাহাই দেখ—গুণবৈষম্য। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু-

সমূহ মিশ্র গুণের সহিত সম্বন্ধ করিয়া এই জগৎ উৎপন্ন করিতেছে। মানসিক বৃত্তিসমূহ চিত্ত-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে মায়িক জীবের চক্ষের উপর কর্ম্মরূপে বাহিরে প্রকাশ হইয়া কাহারও আনন্দদায়ক, কাহারও বা অতৃপ্তিকর হইতেছে। ইহাই গুণবৈষম্য।" আমি বলিলাম, "এই যে আপনি রহিয়াছেন, ইহাও কি মিথ্যা ?" বলিতে বলিতে "আমার অস্তিত্ব কোথা" বলিয়া অদৃশ্য হইলেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান। কিছুক্ষণ পরে সদর দরজা হইয়া আবার আসিয়া বসিলেন। তামাক সাজিতে বলিলেন। তামাক দিলাম। খাইতে খাইতে বলিলেন,—"বাবা, এক ব্রহ্মই সত্য। ঠিক্ ঠিক্ কাজ করিয়া যাও। সবই ক্রমশঃ বুঝিবে।"

কি জানি কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব্বদ্বারী দরজার কপাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, আমাকে ডাকিয়া ভিতরে যাইতে বলিলেন। আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বলিলেন, "বস।" আমি বসিলাম। একটু পরেই এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখাইলেন। পৃথিবীর গতি ও কোন্ শক্তিতে, কি গতিতে, জগতে সমস্ত দ্রব্যকে ঘুরাইতেছে, একস্থানে স্থিরভাবে থাকিতে দিতেছে না, তাহাই প্রত্যক্ষ করাইলেন। এই অস্থিরের মধ্যে স্থির বস্তু কি প্রকারে উপলব্ধি করিতে হয়, বোধ করিতে হয়, এবং স্থিরের ভিতর চঞ্চলা প্রকৃতি কি গতিতে কর্ম্মের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্য চালাইতেছেন,

তাহাই দেখাইলেন। জড়, চৈতন্যের সহবাসে কেমন করিয়া কার্য্য করে, ইহা দ তাহাই। আমি যেন এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনা স্বপ্নবৎ দেখিতেছি। আমি অবাক্। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মাথার ভিতর ধরিয়া রাখিতে বহু চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নদ... ...ঙর স্রোত, যেন সেই ভাবকে ভাসাইয়া দিবার জন্য শত শত বাধা-বিঘ্ন তীর বেগে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। বলিলেন, "বাবা, বিনা সাধনায় কি উহা আটক করিতে পারিবে? যাহা কঠোর তপস্যার ফল, তাহা কি পড়িয়া-দেখিয়া রাখা যায়? চিত্ত নির্ম্মল কর, আপনি আসিবে ও থাকিবে। অসদ্‌বৃত্তি যেমন এখন সরিতে চায় না, সদ্‌বৃত্তিও তেমনি চিত্ত নির্ম্মল হইলেই সরিবে না। চিত্ত-বিকারই নিম্নে ও নির্ম্মল চিত্ত ঊর্দ্ধে লইয়া যায়। তুমি যাহাতে তোমার চিত্ত নির্ম্মল রাখিতে পার, তাহার চেষ্টা করিতে থাক।"

আমি এই সময় তাঁহার নিকট তিনটি প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলাম, "প্রভো, আমার এই তিনটি প্রার্থনা আছে।" তিনি দুটি স্বস্তি করিলেন। তৃতীয় প্রার্থনা ছিল, "প্রভু, আপনার নিকট সর্ব্বদা থাকিয়া ও অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া আমার হৃদয় ও মন আনন্দে ভরিয়াছে, আর আপনাকে আমি সাক্ষাৎ নররূপী শিব প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই সময়ে আমার মানসিক বৃত্তিসমূহ আমাকে যে নির্ম্মল আনন্দে রাখিয়াছে, জগৎ ভুলাইয়া দিয়াছে, সদ্বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ

ঘটাইয়া আত্মবিস্মৃতি আনিয়াছে, এই ভাব যেন জীবনে আর না যায়। আমি যেন চিরদিনই এ আনন্দ-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকি।" আমার প্রার্থনা শুনিয়া তিনি নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেন। তারপর বলিলেন, "উপেন্দ্র, তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি। তোমার অন্য দুটি প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। কিন্তু বাবা, শেষের প্রার্থনা স্বস্তি করিতে পারিব না। উহা যে তপস্যা করিয়া রাখিতে হয়। গুরুবাক্যে সবই হয় সত্য, কিন্তু সদ্‌গুরু শিষ্যকে কর্ম্ম করাইয়া, কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া এবং অনেক বাধা-বিঘ্ন নিজেও সরাইয়া দিয়া, তাহাকে নিজালয়ে লইয়া যান। যাহারা কর্ম্মকে ফাঁকি দিয়া, তপস্যা ও সত্যের আদর না করিয়া, জিতেন্দ্রিয় না হইয়া, সমস্ত ভোগের সামগ্রী উপভোগ করিয়া, ভগবৎ-প্রেমে মজিতে, ডুবিতে, ভিজিতে যায়, তাহারা আত্মঘাতী। যে স্থানে যাইবার যে পথ, ভগবৎ-শাস্ত্র ও সদ্‌গুরু তাহা বিশেষ ভাবে স্থির করিয়া দিয়াছেন। বৎস, তোমাকে তাহা পালন করিয়া যাইতে হইবে। দুর্ব্বলতা আনিও না, কঠোর তপস্যারূপ মরুভূমি পার না হইলে স্নিগ্ধ, রসাল তরুতল কি পাওয়া যায়, বাবা? যার মন ঠিক, তার কর্ম্ম ঠিক, তার ভজন-সাধনও ঠিক ঠিক ভাবেই হইয়া যায়। মনকে নিজের বশে আন। তুমি তাহার পিছু পিছু দৌড়াইয়া বিষয়রূপ মনের ও ইন্দ্রিয়ের মোহে মজিও না। কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। শক্তিতে না কুলায়, গুরুর

নিকট, ভগবানের নিকট, আদ্যাশক্তি মা মহামায়ার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে শক্তি ভিক্ষা কর, তাঁহাদের দয়া হইবে। যাঁহার রাজ্যে যখন বাস করিতে হয়, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা জীবের অবশ্য-কর্ত্তব্য। এক গৃহে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে ঘরের কর্ত্তার সম্মান বজায় রাখিবেন, তাঁহার সেবা করিবেন। যাঁহার রাজ্যে বাস, তাঁহার কৃপা হইলেই অনেক কষ্টের লাঘব হয়। মা মহামায়ার রাজ্যে বাস, আদ্যাশক্তি ভগবতীর রাজ্যে বাস, ঘোর মায়াময় মরুর মধ্যে বাস, দাও রাজার দোহাই দাও। আর তাঁহার শক্তি নিজে আরোপ করিয়া এক এক রাজ্যের সীমার বা গণ্ডীর বাহিরে তীব্রবেগে উগ্র তপস্যা ও কঠোর বৈরাগ্য লইয়া চলিয়া যাও। রাজার শক্তি আরোপ করিলে, রাস্তায় কেহই কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া রাস্তা ছাড়িয়া দিবে।"

ইংরাজি ১৯০৩ সাল—শীত একটু একটু পড়িয়াছে। একদিন ডিসেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে, তিনি সাধনার ঘরে নৈঋ্ত কোণে সর্ব্বদা যে কাষ্ঠাসনে প্রায়ই বসিয়া থাকিতেন তাহার নিকটে বসিয়া আছেন। চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ একটি আলমারী ছিল। আমি বলিলাম, "বাবা, আপনার বসিবার স্থানটি ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিয়া দি।" তিনি বলিলেন, "না বাবা, উহাতে আমার অনেক সম্পত্তি আছে। ও ঘর তোমাকে পরিষ্কার করিতে হইবে না।"

আমি ও কালীপদ ঘোষ উভয়ে জেদ করিয়া ধরায় বলিলেন, "তবে যাও।"

একটি কাষ্ঠের পিঁড়ি ছিল, উহার চারিদিকে ময়লা। আমরা যেমন কাষ্ঠের পিঁড়ি সরাইব, অমনি তাহার নীচে দেখি, নানাজাতীয় জীব রহিয়াছে—ইন্দুর-বাচ্ছা, বিছে, ছোট ছোট পোকা ও নানা প্রকারের জীব-সমষ্টি একত্রে বাস করিতেছে। কেহ কাহার হিংসা করে নাই, বেশ সুখে ঘর-কন্না পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। প্রভু তাহাদের উপর আসন করিয়া বসিয়া থাকেন।

বলিলেন, "বাবা, আর একটা সম্পত্তি থাকে, সেটা বাহির হইয়া গিয়াছে, এর পর আসিবে।" বলিলাম, "বাবা, সেটা কি?" বলিলেন, "খরিশ সাপ। ঐ খানেই থাকে। একটু পরে আসিবে। তোমরা ভয় পাবে, নতুবা এখনি ডাকিলে আসিত।"

আমি। না বাবা, ভয় পাব না, আনুন।

তিনি। আচ্ছা পরে হবে।

আমরা সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া দিলাম। বাবা বলিলেন, "যা, তোরা অনেক দিনের ময়লা সাফ করিয়া দিলি।"

একদিন সন্ধ্যার ট্রেনে আমি বর্দ্ধমান হইতে গুষ্করায় যাইতেছি। গাড়িতে গুরুজীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার চক্ষে জল আসিল। আমার বাম পার্শ্বে একটি লোক বসিয়াছিল। সেই সময় ঐ লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা

করিল, "আপনি কোথায় যাইবেন ?" আমি বলিলাম, "গুষ্করায় গুরুর বাড়ী যাইব।" "গুরু কে" জিজ্ঞাসায় বলিলাম, "বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামী আমার গুরুদেব।"

তিনি বলিলেন, "বেশ হবে, চলুন। আমিও তাঁহার নিকট যাইব।" মনে করিলাম, ইনিও তবে বাবাজীর শিষ্য হইবেন।

তখন গুরুজীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার অদ্ভূত দৈবশক্তি ও আমার উপর অকৃত্রিম ভালবাসার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, আমার মনের অবস্থা প্রায় বাহ্যশূন্য হইয়াছে। আমি আর তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব, ইহাও মনে নাই।

গুষ্করা পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব আছে, তিনি সেই সময় আমাকে বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনার মন ঠিক নাই। আপনি প্রভুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। আপনি কি প্রত্যহ তাঁহার নিকট যান ?" আমি বলিলাম, "হাঁ, প্রায় যাই। আপনি আমার মনের অবস্থা কি করিয়া জানিলেন ?"

তিনি। আমি মাকে ডাকিলে মা আসিয়া আমাকে সমস্ত বলিয়া দেন, আমার সহিত আপনার গুরুজীর পরিচয় নাই। আমি এই প্রথম তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছি। তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তির কথা পরস্পরের নিকট শুনিয়া আমি তাঁহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়া যাইতেছি। তিনি বলিবেন কি ?

আমি। হাঁ, বলিবার মতন হইলে বলিবেন। আপনার কি আর কেহ আলাপী আছেন ?

তিনি। না, আমি তাঁহার নিকটেই যাইব। আমার আলাপী কেহই নাই। তাঁর নিকট থাকিবার স্থান কি আমার হবে ?

আমি। হাঁ, হবে, আমার সঙ্গে যাবেন।

গাড়ী গুস্করা ষ্টেসনে পৌঁছিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া টিকিট দিয়া গুরুজীর নিকট চলিলাম। কাছারী বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দেখি, বাবাজী বঙ্ক সাধুর দোকানে গোপাল ভাবে বসিয়া আছেন,—সেই সহাস্যবদন, চক্ষু যেন পদ্মফুল, গায়ে একটি বিলাতি কম্বল। মাথার চুল ঈষৎ বড় হইয়াছে। একটি গান করিতেছিলেন। বলিলেন, "কি গো, এসেছ ?"

আমি যাইবার একটু পরে ঐ লোকটি পৌঁছিলেন।

গুরুজী। ইনি কে ? (লোকটিকে দেখাইয়া)

আমি। ইনি কলিকাতা হইতে আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য আসিয়াছেন।

গুরুজী। বেশ, চল, জল খাবে, চল।

এই কথা বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া উঠিলেন। বঙ্ক সাধু বলিল, "উপেন বাবু এসেছেন, গুরুজী আর থাকিবেন না।" এ কি ভালবাসা ! যেন স্বার্থের গন্ধ নাই, যেন কোথাও ইহার নমুনা নাই। গুরুজী কাছারী ঘরের বাগানে তক্তা-পোশের উপর বসিলেন। আমরা দুইজনে নীচে বসিলাম।

লুচি সন্দেশ ইত্যাদি নানা দ্রব্য দিয়া উভয়কে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। আমি গুরুজীর মুখপানে তাকাইয়া বসিয়া আছি, সেই লোকটি গুরুজীর সঙ্গে আলাপ করিতেছে। রাত্রি প্রায় ৯॥ টা। গুরুজী বলিলেন, "তোমরা পূর্ব্বধারের কুঠুরীর মধ্যে শোবে।" কালীপদ ঘোষ আসিলেন। তোষক, লেপ সব আনা হইল। আমরা শুইলাম।

তাঁহার সঙ্গে নানা কথা বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "মা আমার কথা শুনেন। আপনি যা মনে করেন, আমি সমস্তই বলিয়া দিতে পারি।"

আমি। আচ্ছা, বলুন।

বলিয়া আমি একটি বিষয় মনে করিলাম। তিনি বলিলেন। তাহার পর আর একটি বিষয় মনে করিলাম, তত শীঘ্র বলিতে পারিলেন না, একটু বেশি সময় লইলেন। তাহার পর একটি বিষয় মনে করিলাম, আর বলিতে পারিলেন না। প্রায় একঘণ্টা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হইতেছে না। তখন রাত্রি প্রায় ২টা। বাবাজী পার্শ্বের ঘর হইতে বলিতেছেন, "আর হবে না। যা হয়েছে, যথেষ্ট।"

বলিতে বলিতে নাচিতে নাচিতে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া বিছানায় বসিলেন। সেই লোকটিকে বলিতে লাগিলেন, "উপেন্দ্র মনে করুক, আর তুমি বলিয়া যাও, কেমন ?" সেই লোকটি বলিল, "কি, আর হয় না যে, আপনি কি করিয়া দিলেন ?"

গুরুজী। কি করিব? তোমার মাকে আমি হুড়পীর ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছি। বাহির করিয়া নেও। আর তোমার সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি ছিল, তাকে কোথায় রেখে এসেছ! বেটা ভণ্ড, গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করে বেড়াচ্চ। যা হবার হয়ে গেছে, আর হবে না।"

ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "বেশ, আমি কিছু পাইবার আশায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে সব হারাইয়া গেলাম।" বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিল।

গুরুজী কিছুক্ষণ বসিয়া, সকল গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। আমি আলো লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। গভীর রাত্রি, আর সেই কঠিন শীত। জলে ডুবিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার উপর থাকিলেন। আমি শীতে জড়-সড় হইয়া কাষ্ঠবৎ দণ্ডায়মান।

স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আসিলেন, ধুনা দেওয়া হইল, পরে ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া দিলেন। আমরা উভয়েই ভোর পর্য্যন্ত বাবার কথা লইয়া কাটাইতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া সেই লোকটি বলিতে লাগিল, "অনেক সাধু-সন্তের নিকট গিয়াছি, কিন্তু এরূপ উগ্র তপস্বী দেখি নাই। কি গাম্ভীর্য্য, কি চক্ষু, আর কি গন্ধ! আপনি বাস্তবিকই দেবতা লইয়া আছেন। আমার সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লইয়াছেন।"

আমি। গুরুজী, একটি স্ত্রীলোকের কথা কি বলিতেছিলেন?

তিনি বলিলেন, "কৈ, কিছু না।"

প্রাতে যথাসময়ে ঠাকুর উঠিলেন। সেই ব্রাহ্মণ অনেক কাঁদাকাটি করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি কিছু দেন আর নাই দেন, আমার দ্রব্যটি আমাকে ফিরাইয়া দিন্।"

বাবাজী বলিলেন, "তোমাকে অনেক শিক্ষা দিতে হইবে। অনেকের সর্ব্বনাশ করে বেড়াও। অনেক হারামজাদ্‌কি তোমার আছে, আজ সকলই দেখাইব। আজ থেকে সেই মেয়েমানুষটাকে কোথায় রাখ্‌লে?" শুনিয়া ব্রাহ্মণ চকিত ও চমকিত।

আমার ট্রেণের সময় হইল। স্নান-জল ও প্রসাদ লইয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া আমি চলিয়া গেলাম। পুনরায় একদিন গিয়া শুনিলাম যে, তিনি সেদিন ছিলেন। উত্তম শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছিলেন।

একদিন পত্র পাইলাম। প্রভু লিখিয়াছেন, "আমি তোমার নিকট বিশেষ কার্য্য জন্য বর্দ্ধমান যাইব। তুমি ষ্টেশনে আসিবে।" নির্দ্দিষ্ট দিনে ষ্টেশনে ছুটিলাম। বেলা প্রায় যায়-যায়, শীতকাল, গাড়ি গুষ্করা হইতে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। আমি দ্রুতপদে এ-গাড়ি ও-গাড়ি খুঁজিতেছি, কতক্ষণে শ্রীচরণ দর্শন করিয়া প্রাণ শীতল করিব। দেখি, আমি তাঁহার গাড়ির নিকট পৌঁছিবার আগেই তিনি

প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিতেছেন। সেই সহাস্য-বদন, সেই পদ্মসম চক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া বলিলেন, "কি গো, ভাল আছ ?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, ভাল আছি।" বলিয়া শ্রীচরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া কৃতার্থ হইলাম। জানি না, আজ আমার জীবনের এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, জানি না, আজ অঙ্গার অগ্নিস্পর্শে অগ্নি হইবে, আজ শ্রীগুরু ভব-কাণ্ডারী যথার্থরূপে আমাকে তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্তে স্থান দিবেন।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া গাড়িতে উঠিবার সময় আবার তিরস্কার আরম্ভ করিলেন, "কেন মানসিক বৃত্তি দুর্ব্বলতায় পূর্ণ কর, কেন বিক্ষোভ আনিয়া অন্তর কলুষিত কর ? অমূল্য-নিধি লাভ করিতে হইলে সুখ-দুঃখ উভয়ই জলাঞ্জলি দিতে হয়। সামান্য বিষয়ে উতলা হওয়া কর্ত্তব্য নয়।"

আমি আশ্চর্য্য হইলাম। প্রভুকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে যাইবার কিছু পূর্ব্বে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে। তাতেই আমার মন খারাপ হয়। সেই মন ও মুখ লইয়া আমি প্রভুকে আনিতে গিয়াছিলাম। আর যায় কোথা ! একবার মাত্র মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্তর্য্যামী অন্তরের সমস্ত ব্যাপার জানিলেন, আমি অধোবদনে দণ্ডায়মান।

সেদিন প্রভুর সঙ্গে গুষ্করা স্কুলের হেড্ মাষ্টার বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও ছিলেন। তিনিও সমস্ত

দেখিলেন ও বুঝিলেন। গাড়িতে উঠিয়া সকলে কাছারীর নিকট আমার বাসায় আসিলাম। তখন সামান্য বেলা আছে। প্রভু তামাক খাইতেছেন। এমন সময়ে শুনিলাম, শ্যামসাগর পুষ্করিণীর নিকট ৺ঈশানেশ্বর শিবঠাকুরের মন্দিরে এক অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্না ভৈরবী আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

ঠাকুর বলিলেন, "চল, দেখিয়া আসি কেমন ভৈরবী।"

আমরা তিনজনে যাইতেছি। এমন সময়ে প্রেমচাঁদ ঘোষ নামক আমার জনৈক বন্ধু আসিয়া জুটিলেন। ইঁহার বাড়ী বাঁকুড়া জেলার তালডাঙ্গরা থানার অন্তর্গত ফুলমতি গ্রাম। পুলিশ সাহেবের আফিসে কার্য্য করিতেন। পরে আমার গুরুভাই হইয়াছিলেন।

সকলে ৺ঈশানেশ্বর শিবঠাকুরের মন্দিরে গেলাম। শ্যামসাগরের ঈশানকোণে ৺ঈশানেশ্বর দর্শন করিলাম। ভৈরবী তথায় নাই। শুনিলাম, পূর্ব্বপারে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে এক কুঁড়েঘরে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন। আমরা তথায় যাইয়া দেখিলাম, পদ্মাসন করিয়া ভৈরবী দেবী পূর্ব্বমুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ের রাজা অন্তরের ধন বিশ্বপতির চিন্তা করিতেছেন। আমরা গিয়া সম্মুখে বসিলাম। তখন চক্ষু মুদ্রিত। বাবাজীর গাত্র হইতে স্বর্গীয় গন্ধ বাহির হইতেছে,— তখনও চক্ষু মুদ্রিত। বাবাজী বলিলেন, "আর কেন, চক্ষু মেলা হউক।" বলিতে না বলিতে যেন দুটি চক্ষু নহে, দুইটি শতদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল।

চেহারা নিটোল, যেন দুধে-আলতা-গোলা রঙ্। নাসিকা লম্বা, প্রশস্ত ললাট, গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালা, কপালে রক্তচন্দন, ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে সিন্দূরের বিন্দু, পরনে গেরুয়া, বয়স দেখিলে ষোড়শী বলিয়া মনে হয়। প্রভুকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে নমস্কার করিলেন। প্রভু 'নারায়ণ' বলিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন। হাসিতে হাসিতে উভয়ে কথা বলিতে লাগিলেন। ভৈরবী মা হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলিতে লাগিলেন। সব কথা আমরা ধরিতে পারিলাম না। তবে বাবাজী শেষে বলিলেন, "যাও, আর বুজরুকী করতে হবে না, সব জানা গেল।" তাহাতে ভৈরবী মাতা একটু রাগের লক্ষণ দেখাইলেন। প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই যে, রাগও আছে!" তখন উভয়েরই হাসি আর ধরে না। সন্ধ্যা হইয়াছে। আমরা তথা হইতে উঠিলাম। পূর্ব্বমুখে রাস্তা ধরিয়া কিছু দূর আসিলে বাবাজী বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ এই খানে আছে, দেখা করে যাব।"

ইন্দ্রনাথ বাবাজীর খুল্লতাত-ভ্রাতা, বর্দ্ধমান কলেজে পড়িতেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমরা তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিলাম। বাবাজীর সন্ধ্যা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় বসিলেন। রাখাল মাষ্টার ও আমি হলে বসিয়া নানা কথা কহিতে লাগিলাম।

ভৈরবী মাতার সম্বন্ধেই কথা। প্রভু রাস্তায় আসিতে আসিতে বলিতেছিলেন, "উহার স্বামী আছে। এক পুত্র

ছিল, কিন্তু পুত্র মারা যাওয়ায় উভয়েই এই পথ ধরিয়াছে। ও দেশ-বিদেশে তীর্থ করিয়া বেড়ায়। একত্রে হিমালয়ে মিলিয়া তথায় কঠোর তপস্যা করে।” রাত্রি প্রায় ৮॥০ টার সময় বাবাজী ঘরের কপাট খুলিলেন। প্রভু সন্ধ্যা করিয়া উঠিয়াই জল-সেবা করেন, তাই সকল দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। তাঁহার সেবার পর রাখাল মাষ্টার, প্রেমচন্দ্র বাবু ও আমরা সকলে আহার করিতে বসিলাম।

গুরুদেব। বাবা স্বার্থ ত্যাগ ভিন্ন ঠিক ঠিক তপস্যা হয় না, ত্যাগী না হলে চিত্ত নির্ম্মল হয় না, শ্রীভগবানের কৃপা অনুভব হয় না। তিনি সর্ব্বঘটে, সমভাবে বিরাজমান, জীব মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, ‘আমার আমার’ করিয়া অসত্য, দুঃখ-দায়ক জিনিষকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। এই জগৎ যাঁহার, যিনি না থাকিলে ইহা ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারে না, হাত চলে না, মুখ চলে না, চক্ষু দেখে না, সেই প্রাণের প্রাণকে পর করিয়া, বিস্মৃত হইয়া, মিথ্যা মায়া-বিকারে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

কেন মানবগণ দুঃখ পায়, কেন শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে হা-হতাশ করে, কেন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, তাহার একমাত্র কারণ সত্যকে সত্য বলিয়া, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারে নাই, শিখে নাই। যতই জীব নিঃস্বার্থ হইবে, ততই সত্য-সত্য সদ্‌গুণ আশ্রয় করিবে।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইল। বাবাজী আমার কুটীরের

পশ্চিম দিকের তক্তাপোশে ও রাখাল মাষ্টার আর আমি পূর্ব্বধারের তক্তাপোশে—শুইয়া শুইয়া ঐ সকল কথা হইতেছে।

বাবা দক্ষিণ শিয়রে শুইয়াছিলেন, হঠাৎ মাথা ফিরাইলেন, বলিলেন, "পায়ের দিকে আমার ঠাকুর আছে।" আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "উপেন্দ্র ঘুমাল নাকি?" রাত্রি প্রায় একটা, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "উপেন্দ্র, আমি ঘুমাইতে আসি নাই, তোমাকেও ঘুমাইতে দিব না।" বলিয়া আমাকে হাত ধরিয়া বিছানা হইতে উঠাইলেন। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

গুরুদেব মাষ্টার রাখাল বাবুকে বলিলেন, "তুমি অন্য ঘরে যাও। উপেন্দ্র ও আমি এই ঘরে থাকিব।" তখনও আমি বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি দয়া করিয়া আজ আমাকে আপন করিবেন। তখনও জানি না যে, তাঁহার ভালবাসা স্মরণ করিয়া চিরজীবন চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতে হইবে।

বলিলেন, "ঘরে ধুনা দাও।" ধুনা দেওয়া হইল। ঘর পরিষ্কার করা হইল। বলিলেন, "তৈল আন।" তৈল দিলাম। তিনি মাখিতে মাখিতে বলিলেন, "তুমিও মাখ। তোমাকেও রাত্রে স্নান করিতে হইবে।" বলিলাম, "এত শীতে কি করিয়া স্নান করিব?" বলিলেন, "শীত কি রে?"

আমিও তৈল মাখিলাম। পূর্ব্বাহ্নে বিল্বপত্র, তুলসী, পুষ্প চয়ন করিয়া রাখা হইয়াছে। লণ্ঠন লইয়া তাঁহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর ঘাটে গেলাম। ভয়ানক শীত, পশ্চিমের বাতাস জোরে বহিতেছে। বৃক্ষের নিকটে আমি লণ্ঠন-হস্তে দণ্ডায়মান। বাবা জলে ডুবিলেন, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে উঠিলেন। আমাকে বলিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন ? জলে নাম।" আমি জলে নামিলাম। কন্‌কনে শীত। কোন রকমে স্নান শেষ করিয়া লণ্ঠন লইয়া পিছু পিছু বাসায় প্রবেশ করিলাম। তাঁহার মুখে সেই দেবীর স্তোত্র শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইয়া গিয়াছি। ঘরে কিছুই শীত অনুভব হয় নাই। বাবা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। অপূর্ব্ব গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ হইল।

নিজের বেশভূষা করিয়া আমাকে ভিতরে যাইতে আদেশ করিলেন। আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য নহে।

আমার ইষ্টদেব, সেই প্রসন্ন-গম্ভীর মূর্ত্তিতে পূর্ব্বমুখে আসনে উপবিষ্ট, আমাকে উত্তর মুখে আসনে বসিতে বলিলেন। আমি বসিলাম।

আমার বসা ঠিক হইল না। বলিলেন, "এইরূপ ভাবে বসিলে ঠিক হবে না।" একটি আসন দেখাইয়া দিলেন। ঐ আসন আমি অনেক চেষ্টায় পূর্ব্বে অভ্যাস করিতে পারি নাই।

আমি বলিলাম, "ঐরূপ আসন করিয়া কি বসিতে পারিব ?"

গুরুদেব। হাঁ, তোমার অভ্যাস আছে, খুব হবে।

তাহার শ্রীমুখ হইতে যেমন বাহির হইল, অমনি অতি সহজেই আমার তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল। আহা কি শুভদিন! দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু হইতে দুইটি ৺শিব বাহির করিলেন। তাঁহার জ্যোতিঃ দেখিলে মণি-মাণিক্যের জ্যোতিঃ লজ্জা পাইবে। এমন রঙ্গ্ নাই, যাহা ঐ শিবের অঙ্গে না দেখিলাম! দেখিতে দেখিতে মস্তকে আঘাত করিলেন। অমনি মুখ হইতে দুইটি শালগ্রাম শিলা বাহির হইল। দেখিতে দেখিতে নানাজাতীয় ফুলে ঘর আমোদিত করিল!

আহা! তাঁহার সেই রাত্রের অপূর্ব্ব ও স্বর্গীয় ছটা হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি তখন কোথায়! স্বর্গীয় পুরুষের সঙ্গে স্বর্গে থাকিয়া স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার সম্মুখে তখন জগৎ নাই, জাগতিক ব্যাপার নাই, মায়ার সীমা ছাড়াইয়া যেন আমাকে দেবপুরী মধ্যে দেবাঙ্গনার সঙ্গে, আমার কল্পতরু ভগবান্ শ্রীগুরু আমার পরিচয় করাইয়া দিতেছেন! আর বলিতেছেন, 'উপেন্দ্রের শত অপরাধ হইলেও গ্রহণ না করিয়া ইহাকে অন্তরঙ্গের লোক বলিয়া ধরিতে হইবে।' তিনি প্রত্যেক ঠাকুরের স্নানকার্য্য শেষ করিলেন। তাঁহাদিগকে অপরূপ সাজসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। তাঁহারা যেন ঠাকুরের নিজের হইয়াছেন, যেন দেবতারা তাঁহার সহিত দেবভাষায় কথা কহিতেছেন, আর আমি তাঁহাদের ভাষা বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া

মনকে শত শত ধিক্কার দিয়া সমস্ত বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে দেখিয়া যাইতেছি।

একটি ঠাকুর লইয়া আমার চক্ষের নিকট ধরিলেন। বলিলেন, "বেশ করিয়া দেখ।" আমি তাহার উপর কিছুতেই দৃষ্টি রাখিতে পারিতেছি না। যেন চক্ষু ফিরিয়া যাইতে লাগিল। কত কত মূর্ত্তি, কত কত জড়িত রূপরাশি, কত রকমের আলোক তাহার মধ্যে দেখিতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ তাঁহার পূজা শেষ হইল। আমার ললাটে ভস্ম ও চন্দন লেপন করিলেন। নিজ দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা আমার উভয় ভ্রূর মধ্যস্থানে যখন এক অপূর্ব্ব দ্রব্য স্পর্শ করাইয়া দিলেন, তখন আমি কি সুখ অনুভব করিলাম তাহা বলিবার ভাষা যদি দিতেন, আমি বলিয়া অন্যকে তৃপ্ত করিতে পারিতাম।

এখন যদি আমি কখন পীড়িত হই, সেই অঙ্গুলি-স্পর্শ-জনিত সুখের অনুভূতি কিয়ৎক্ষণের জন্য আনিলে দেহ-মন পবিত্র হয়, রোগের জ্বালা কোথায় চলিয়া যায়।

আমাকে পূজা করাইলেন, আমাকে পুনর্জীবন দান করিলেন। আমার মন ও দেহ পবিত্র হইয়া গেল, আনন্দ-রাশি চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল।

আমাকে বলিলেন, "এখন তুমি বাহিরে যাও।" আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, আমার মন আনন্দে ভরা, চক্ষু বহিয়া কেবল জল পড়িতে লাগিল। আমি দেখি, তখন

আমি এদেশের মানুষ নয়। আমার সব পাল্টাইয়া গিয়াছে, যেন সদাই নিত্যরাজ্যে দেবতা-সহ বাস করিতেছি। জীবনের স্রোত বদ্‌লাইয়া গেল।

ভাবি, আমি কি পাগল হইলাম! তাই বা কি! পাগলে ত যা-তা করে, যা-তা বলে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়। কই আমার ত তা হয় না। আমি আনন্দে বিভোর হইয়া কেবল কাঁদিতেছি কেন? কাহার জন্য, কি জন্য কাঁদিতেছি, তাহাও জানি না। তবুও কাঁদি কেন? মাষ্টার রাখাল বাবু বলিলেন, "অত কাঁদিতেছ কেন?" দেখিতে দেখিতে ঠাকুর ঘরের দরজা খুলিলেন, তখন প্রায় ৭॥০টা হবে। তামাক সাজিয়া দিলাম। তিনি একটা চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। মাষ্টার বলিলেন, "উপেন্দ্র এত কেন কাঁদিতেছিল?" ঠাকুর বলিলেন, "পাগল আর কি?"

ঠাকুর বলিলেন, "উপেন্দ্র, জল খাইয়াছ?" বলিয়া স্নান-জল রম্ভা মিষ্টান্ন দিয়া জল খাইতে বলিলেন। আমি জল খাইয়া নিকটে বসিয়া কথা কহিতে লাগিলাম।

ঠাকুর। বাবা, সাধন-ভজন করিতে হইলে মন খাঁটি করা চাই। চিত্তে অসৎ চিন্তা আসিলে বিচার দ্বারা তাহাকে সরাইয়া দিবে। চিত্তের মধ্যে অসৎ চিন্তাকে কিছুতেই আসিতে দিবে না। যে ক্রিয়া দিলাম, কিছুদিন অভ্যাস করিলে সমস্তই বুঝিতে পারিবে।

(মাষ্টারের প্রতি) উপেন্দ্রের চিত্তবৃত্তি খুব ভাল। মাথা

বেশ, একটু রাগ আছে। তা যাবে। পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা না থাকিলে কি সকলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় ধরিতে পারে? সবই মায়ের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছায় সবই শুভ হয় গো!

এত শীত, কিন্তু ঠাকুর যখন ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইলেন, দেখিলাম সর্ব্বাঙ্গে ঘাম।

ঠাকুর বলিলেন, "আমি অদ্য আহারের পর বণ্ডুল যাইব। দুই এক দিন পর ফিরিব। তোমাকে সংবাদ দিব।" বলিতে বলিতে প্রভুর সেবার সমস্ত প্রস্তুত হইল। তিনি আহার করিয়া বাহিরে বসিলেন। আমি তাঁহার পাত্রেই বসিয়া খাইলাম। মাষ্টার ও প্রেমবাবু আমার সঙ্গে আহার করিলেন।

বাবাজী যাইবার জন্য ব্যাগ প্রস্তুত করিতেছেন, তাই দেখিয়া আমি বড়ই কাঁদিতে লাগিলাম। বলিলাম, "বাবা, আজ থাকুন, কিছুতেই আজ আপনাকে ছাড়িব না।"

আমার চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে দেখিয়া বলিলেন, "তবে থাক গো, আজ যাওয়া হবে না। বেটা কেঁদে কেঁদেই আমাকে গলিয়ে ফেল্‌লে।"

আমি তাঁহার বিশ্রাম করিবার বিছানা ঠিক করিয়া দিয়া আফিসে চলিয়া গেলাম। আমি তখন Reserve Sub-inspector, তাই আফিসে কাজ করিতে যাইতে হইত। আফিসে কাজ করি, আবার মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাই, ঠাকুর কি করিতেছেন। বৈকালে বাসায় আসিলাম। দেখি, বর্দ্ধমানের শ্রীপতি সাধু বাবাজীকে তাঁহার বাড়ী লইয়া

যাইবেন বলিয়া গাড়ি আনিয়াছেন। গুরুজী আমার আসিবার অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

আমি হাত-পা ধুইয়া তাঁহার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে শ্রীপতি সাধুর বাড়ী গেলাম।

শ্রীপতির বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখি, বাহিরের ঘরে অনেক লোক ঠাকুরের আসার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। ঠাকুর গাড়ী হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলে সকলেই প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। কিছুক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ। একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, উপায় কি? আজন্ম 'হরি হরি' করিলাম, কিন্তু কোন বিষয়েই পরিবর্ত্তন ত দেখিতে পাইলাম না।"

ঠাকুর কতক্ষণ স্থিরভাবে যেমন ছিলেন, তেমনিই থাকিলেন। তাহার পর স্থির নেত্রে তাঁহার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বাবা, মনকে ঠিক না করিয়া যাহাই করুন, কার্য্য সফল হয় না। মানসিক চঞ্চল বৃত্তি-সমূহ স্থির সূর্য্যকে দেখিতে দেয় না। সংসারের নানা জটিল বৈষয়িক ব্যাপারে মন সর্ব্বদাই অস্থির, দিবা-রাত্রি ইন্দ্রিয়-সুখ, ভোগ-বিলাস লইয়া ব্যস্ত, তাই ফল হয় না। স্বার্থত্যাগ ভিন্ন সংসারে সৎপথে যাওয়া যায় না। সাধনা দ্বারা সদ্-গুরুর কৃপা উপলব্ধি করিতে হয়। কিছুদিন নির্জ্জনে সাধনা করিয়া মনকে ভালরূপে মায়িক সংসারের কার্য্যপ্রণালী যে অনিত্য, তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া সংসারের বা বিষয়ের

প্রতি যাহাতে ঘৃণা জন্মে, তাহাই করিতে হয়। তবে মন বৈরাগ্য লইয়া ক্রম-অনুসারে সাধন-মার্গে ছুটিতে থাকে। সকল কার্য্যই নিয়ম ও প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়।”

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা বাবা, পরজন্ম কি আছে?

বাবা। হাঁ বাবা, পরজন্ম আছে, শাস্ত্রকারগণ বলেন। আর আমারও বিশ্বাস, পরজন্ম আছে।

ব্রাহ্মণ। বাবা, শুনিয়াছি আপনার খুব শক্তি, আমাদিগকে কিছু দেখান।

বাবা। দেখে কি হবে বাবা? ওসব দেখতে নাই। সেতার শিক্ষার সময় গান বাজাতে নাই, গত বাজাতে হয়। হাত সাফা হলে গান বাজাতে কষ্ট হয় না—শিক্ষাও পৃথক্ ভাবে করতে হয় না। জীবের সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি—বিশ্বাস সহসা আসে না।

ব্রাহ্মণ। আমরা ক্ষুদ্র জীব। কি বুঝি বাবা! সবই আপনাদের কৃপা।

গুরু। হাঁ, ভগবানের কৃপা ত সর্ব্বদাই আছে, উপলব্ধি করে কে, বাবা?

এ সময়ে সূর্য্য প্রায় অস্ত যায়-যায়। শ্রীপতি বাবাজীকে কিছু প্রসাদ করিয়া দিবার জন্য বলায় তিনি বাড়ীর মধ্যে গেলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম।

শ্রীপতি অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়াছেন। প্রভু

ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। সামান্য মাত্র আহার করিলেন। শ্রীপতিকে বলিলেন, "উপেন্দ্রকে বেশ করিয়া খাওয়ান হউক।" আমি প্রসাদ লইলাম। তাহার পর গাড়ীতে বাসায় ফিরিলাম। ঘরে ধুনা দেওয়া গেল। বাবাজী ঘরের কপাট বন্ধ করিলেন। রাত্রি ৮।।০ টার সময় কপাট খুলিলেন। বাবার আহার্য্য দ্রব্য সমস্তই প্রস্তুত। তিনি আহার করিয়া একটি চেয়ারে বসিলেন। আমরা আহার করিতে লাগিলাম। তিনি বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমাদের খাওয়া শেষ হইল।

তাঁহাকে ঘিরিয়া আমরা সকলে বসিলাম। তিনি শাস্ত্রালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "চিত্ত নির্ম্মল কর, ভগবানের কৃপা বা শক্তি অনুভব করিতে পারিবে। নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিষে সূর্য্য-রশ্মি শীঘ্রই কাজ করে। দেখ, কোথায় সূর্য্য আর কোথায় বালুকারাশি, সামান্য তাপেই বালি গরম হইয়া উঠে। অত শীঘ্র কি একচাপ মাটি গরম হয়? তা হয় না। কেননা, মাটি হইতে বালুকারাশি পরিষ্কার ও মার্জ্জিত।"

নানা কথা কহিতে কহিতে প্রায় রাত্রি ১১ টা হইল, প্রভু শয়নের জন্য ঘরের মধ্যে গেলেন। আমরা বিল্বপত্র, তুলসী, পুষ্প প্রভৃতি পূর্ব্বাহ্ণেই ঘরের মধ্যে রাখিয়াছি। আবার কল্য প্রাতে ৮ টার পর দর্শন করিব। রাত্রি ২ টার সময় উঠিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে।

ভোরে উঠিয়া ঠাকুরকে উঠাইয়া দিলাম। তরকারি-পত্র কুটিতে আরম্ভ করাইয়া দিলাম। গুরুজী ৯ টার মধ্যে সেবা করিয়া বণ্ডুল যাইবেন।

প্রায় ৭॥০টার সময় কপাট খুলিলেন। সেই পদ্ম-চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "আহারের কতদূর কিরে, বাপু।"

আমি বলিলাম, সমস্তই প্রায় ঠিক হইয়াছে। প্রণাম করিয়া মস্তকে পদধূলি লইলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া স্নান-জল ও প্রসাদ লইলাম। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও দিলাম। তামাক সাজিয়া দিলাম। আমাদের মধ্যস্থানে বসিলেন, যেন রাজ-রাজেশ্বর। একটু বেলা হইতেই বাবার আসন করা হইল। তিনি সেবায় বসিলেন। এদিকে যাইবার সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতে লাগিল। তিনি উঠিলেন। তামাক খাইয়া বলিলেন, "আজ আসি।" অমনি আমার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। তিনি বলিলেন, "কান্না কি রে?" আমি ব্যাগ হস্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে গেলাম। তিনি বণ্ডুল রওনা হইলেন।

গুরুদেব বণ্ডুল আশ্রমে চলিয়া যাওয়ার পর ফাঁকা মন, উদাস ভাব ও ঊর্দ্ধগতিহীন মনের অবস্থা লইয়া বাসায় ফিরিলাম। যে-ঘরে ঠাকুর কয়েকদিন ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র মন হু-হু করিয়া উঠিল। সেই বিছানা,

সেই বসিবার স্থান, সবই রহিয়াছে,—নাই কেবল সুঠাম-গঠন সেই নশ্বর-দেহ, নাই সেই পদ্মপত্রের ন্যায় উজ্জ্বল-চক্ষু-বিশিষ্ট মহাপুরুষ।

হরিকে কেহই একঘেয়ে আপন করিতে পারে না। সকলেই মনে করে, হরি আমার; সকলেই মনে করে, ভগবান্ গুরুদেব আমাকেই বেশী স্নেহ করেন, ভালবাসেন, কিন্তু তাহা ভ্রম। তিনি ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসেন না, তিনি প্রতি জীবের হৃদয়-কমলে অবস্থিত পুরুষকে ভালবাসেন। তিনি জানেন, অন্য সমস্তই মা-প্রকৃতির খেলা। কিন্তু মাও ভালবাসার জিনিষ, আদরের জিনিষ।

ভগবান্ বিশুদ্ধানন্দ স্থূলের উপর ভালবাসা দেখাইলেও বস্তুতঃ সেই দেহ-মধ্যস্থিত পরমপিতাকেই ভালবাসেন, কিন্তু বদ্ধ জীব মনে করেন যে, আমাকে (স্থূলদেহকে) ভালবাসেন।

গোপীরা যতদিন শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ ভাবিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপা বা ভালবাসার আস্বাদ পান নাই। অনেক প্রকার শিক্ষা দিয়াও যত দিন গোপীদের খণ্ডিত ভাবকে অখণ্ড ভাবের সহিত এক করিতে, মিলাইতে, পারেন নাই, ততদিন নানা কৌশল পাতিয়া খেলা করিতেছিলেন। তাহার পর যখন ক্রমানুসারে গোপীদের ঈষৎ স্বার্থজড়িত ভাব তিরোহিত করিলেন, খণ্ডভাব যখন মহাভাবে মিলিবার জন্য নক্ষত্রবেগে দৌড়িতে শিখিল,

একটু অভাব আসিল, অমনিতর নিকটে আসিয়া হতাশ হৃদয়ে ফিরিয়া যাইতে লাগিল, গোপীদিগকে পার করিবার জন্য ভবপারের কাণ্ডারী তরী লইয়া যখন ধীরে ধীরে তরী বাহিয়া তীরের দিকে আসিতে লাগিলেন, অমনি গোপীদের হৃদয়-মধ্যে একটু খণ্ডিত ভাব-রূপ মেঘের উদয় হইল। অমনি তড়িদ্বৎ তরী নিজেই নিমেষ মধ্যে দৃষ্ট পথের বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তখন দ্বৈত ভাব গেল, ব্যষ্টি সমষ্টিতে আসিয়া প্রেম-রাজ্যে প্রবেশ করিল। অভাব আসিলেই গোপীরা বিলাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বাবা গুরুদেব বণ্ডুল গিয়াছেন, এখনও গুষ্করা ফেরত যাওয়ার সংবাদ পাই নাই।

আমার একজন গুরুভাই, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ফুলমতি-গ্রামবাসী প্রেমচাঁদ ঘোষ, সর্ব্বদাই আমার নিকট থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদাই গুরুদেবের আশ্চর্য্য শক্তি ও অপার করুণার কথা প্রসঙ্গ করিয়া আনন্দ লাভ করিতাম। একদিন সংবাদ পাইলাম, ঠাকুর বাড়ী হইতে গুষ্করা গিয়াছেন, ট্রেনের সময় হওয়ায় আমাকে দর্শন না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন।

দুই এক দিন পরে গুষ্করার কালীপদ ঘোষ আসিয়া বলিলেন, "গুরুজী আপনাকে গুষ্করা যাইবার আদেশ করিয়াছেন।" তখন একটু একটু শীত আছে। বৈকালের ট্রেনে 'শ্রীগুরু কি জয়' বলিয়া রওনা হইলাম। ট্রেন যতই

গুষ্করার নিকটবর্ত্তী হয়, ততই অপরূপ গন্ধ আসিয়া আমাকে উন্মত্ত করিতে লাগিল।

সঙ্গী প্রেমবাবু বলিলেন, "তুমি এত কাঁদ কেন? আমাদের চক্ষে এক ফোঁটা জল কিছুতেই আসে না। তোমার মনে কি হয়, তুমি কি দেখ, যে চক্ষের জলে তোমার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যায়?"

আমি। ভাই, আমার ভাব তোমাকে বুঝাইবার ভাষা নাই। আমি যে কেন কাঁদি, কে কাঁদা, কি জন্য কাঁদান, তাহা অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুই জানেন, আমি বলিতে শিখি নাই —শিখান নাই।

গাড়ী আসিয়া গুষ্করায় পৌঁছিল।

ইহা ১৯০৪-এর ফেব্রুয়ারীর কথা। একটু শীত আছে, গায়ে গরম কাপড় চলিতেছে। গাড়ী কিছু লেট্ ছিল, তাই একটু রাত্রি হইয়াছে।

প্রভু সন্ধ্যা করিয়া আহারান্তে রতনবিহারী সাধুর দোকানে বসিয়া গল্প করিতেছেন। সন্ধ্যার ভোগ হইয়া গিয়াছে। রতনবিহারীকে বলিয়াছেন, উপেন্দ্র আসিতেছে, তাহার জন্য প্রসাদ রাখিবে। রাস্তায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সৌম্যমূর্ত্তি মাথা নাড়িয়া কথা কহিতেছেন, মনে হইল যেন মস্তকের চুলের ও দাড়ির চুলের অগ্রভাগ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তড়িদ্বৎ বাহির হইয়া দিগ্বিদিক্ ছুটিতেছে। হীরকবৎ চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুৎরাশি

চতুর্দ্দিক আলো করিয়া দৌড়িতেছে। তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছি।

ভাবিলাম, এখন সম্মুখে যাইলে পাছে ঐ রূপ-রশ্মি অন্তর্হিত হয়, তাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, গোপনে দাঁড়াইয়া, ভাল করিয়া মন-প্রাণ ভরিয়া আগে দেখিয়া লই। সম্মুখে পাইলে এখনি ভুলাইয়া দিবেন, আর কাঁদিব। প্রেম বাবু "চল হে, দাঁড়ালে যে। গুরুজী দোকানে রয়েছেন, চল" বলিয়া যাইবার জন্য যতই ব্যস্ত, আমি ততই বলি, "ভাই, একটু দাঁড়াও। ওহে, এখান থেকেই দেখ না। ঠাকুর দূর হতে দেখাই ভাল, নিকটে যেও না। ঐ রূপে ডুবে যাবে, আস্বাদ পাবে না, ভালবাসা চলে যাবে, পূর্ব্বরাগ, সুখপ্রদ রাগ, চলে গেলে, মিশে গিয়ে কি নিয়ে থাকব ভাই। একটু দাঁড়াও।"

সাধ মিটিল না। প্রণাম করিলাম। বলিলেন, "উপেন্দ্র, এসেছ। এই যে প্রেমচাঁদ এসেছে। কেদারকে (কেদার মোদক, গুরু ভাই) ডাক, এদের জলখাবার ঠিক করে দিক্।"

বাবাজী। উপেন্দ্রকে প্রসাদ দাও, প্রেমচাঁদকেও দিও।

আমরা প্রসাদ লইলাম। গুরুজী উঠিলেন। বলিলেন, "চল গো কাছারী বাড়ীতে যাই, এরা সব এসেছে। কেলেকে খবর দাও।" ভক্ত কালীপদ ঘোষকে সংবাদ দেওয়া হইল।

কাছারী ঘরের বারেণ্ডায় কতকক্ষণ বসিলেন। আমি

পদসেবা করিতে লাগিলাম, প্রেমচাঁদ তামাক সাজিল। দেখিতে দেখিতে কালীপদ ঘোষ মহাশয় কতকগুলি পান হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে পৌঁছিলেন। আসিয়াই আমাকে সরাইয়া দিয়া নিজেই পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত সময় আমরা তাঁহাকে লইয়া আমোদ করিতেছি, রাত্রি প্রায় ১টার সময় কালীপদ ঘোষ চলিয়া গেলেন, আমি বসিয়া আছি, গুরুদেব তামাক খাইতেছেন। হঠাৎ উঠিয়া তেল মালিশ করিতে বলিলেন। বোতলে খাঁটী সরিষার তেল ছিল, সর্ব্বাঙ্গে বেশ করিয়া লেপন করিলাম।

তাঁহার সঙ্গে পুষ্করিণীর ঘাটে গেলাম। তিনি স্নান করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম। ঘরে কি অপূর্ব্ব গন্ধই উঠিয়াছে, স্বহস্তে বাবাজী সম্মুখের ফুলের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমি ভিজা কাপড় ও লেঙ্গট শুকাইতে দিলাম ও অন্য ঘরে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে যোগ দিলাম।

প্রাতে উঠিয়া দেখি, গুরুজী তখনও উঠেন নাই। কি আশ্চর্য্য ও এক নিয়মে কঠোর তপস্যা! যেমন চন্দ্র-সূর্য্য যথা-নিয়মে হরির আজ্ঞামত কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, ইহাও তাহা অপেক্ষা কম নহে। সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হয়, চন্দ্রে গ্রহণ হয়, কিন্তু আমার ভগবানের বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, আলস্য নাই, রোগ নাই, শোক নাই, মান নাই, দ্বিধা নাই—যেন বায়ুভরে নৌকা আপনিই যায়, ইহাও তাই।

দেখিতে দেখিতে প্রায় ৭টা বাজে, প্রভু একটু পরেই কপাট খুলিয়া বাহির হইলেন। স্নান-জল তাম্রপাত্রে আনিয়া রাখিলেন। আমি পদধূলি লইলাম। বলিলেন, "স্নান-জল নাও, একটু জল খাও।"

এই কথা বলিয়া তক্তাপোষের উপর বসিলেন। আমি পাখা করিতে লাগিলাম। সমস্ত গাত্রে ঘাম। জল খাইয়া ট্রেনের সময় হওয়ায় তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেই বলিলেন, "সময় কি হয়েছে? আচ্ছা এসো, আর একদিন আস্‌বে, আমিও সঙ্গে যাব।" "যে আজ্ঞা" বলে আমি প্রণাম করিয়া ষ্টেসনে ছুটিলাম।

বাড়ী আসিয়া আফিসে গেলাম, মন কিন্তু আর কিছু করিতে চায় না, যেন সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, কাহার চিন্তায় উদাসভাবে থাকিয়া দিন কাটাই, তাহা হৃদয়-স্বামী ভিন্ন আর কেহই জানেন না।

দেখিতে দেখিতে একদিন পত্র পাইলাম। প্রভু লিখিয়াছেন, "তুমি আসিবে, আমি বর্দ্ধমান যাইব।"

তাহার পরদিন আবার পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন, "আর আসিতে হইবে না। আমিই আগামী কল্য যাইব। তুমি ষ্টেসনে আসিবে।"

যথাসময়ে ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। শুনিলাম, গাড়ী আসিতে বিলম্ব আছে। প্ল্যাটফরমে বেড়াইতেছি, হঠাৎ যেন মূর্ত্তি চক্ষের উপর পড়িতে লাগিল, শিহরিয়া উঠিলাম। মন

আর থামে না—কতক্ষণে গাড়ী আসিবে, দেখিয়া প্রাণ শীতল করিব।

গাড়ী সবেগে আসিয়া ষ্টেসনে প্রবেশ করিল।

ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে গাড়ীর কামরা-পানে দেখিতেছি, কোন্ কামরায় আমার প্রভু আছেন।

দেখি, একটি মধ্যমশ্রেণীর গাড়ীর মধ্যে রহিয়াছেন। চক্ষের উপর চক্ষু পলকের মত পড়িল, বিদ্যুৎ খেলিল, মন মাতিয়া গেল, গাড়ী ধরিতে ছুটিলাম। গাড়ীর নিকট আসিতে না আসিতে দেখি, গুরুদেব নামিয়া প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া আছেন।

প্রণাম করিলাম। জুতা খুলিলেন, পদধূলি লইলাম। আমি পশ্চাতে পশ্চাতে ব্যাগ লইয়া চলিলাম, বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বাসায় আসিয়া নিজেই পদ ধৌত করিয়া দিলাম। তামাক সাজিয়া দিলাম। অনেক প্রকার প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। অনেক লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিলেন। সকলের সঙ্গেই সমভাবে ব্যবহার। সকলকেই সৎশিক্ষা দিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ঘরের মধ্যে ধুনা দেওয়া হইল। ঠাকুর ঘরের কপাট বন্ধ করিলেন। আমরা অনেকেই বাহিরে বসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলাম। আমি মধ্যে মধ্যে গিয়া তাঁহার সেবার দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কত বিলম্ব, তাহাই দেখি—সন্ধ্যা করিয়া উঠিলেই জল খাইবেন।

রাত্রি প্রায় ৮টার সময় প্রভু উঠিলেন। তামাক সাজিয়া

দিলাম, গল্প চলিতে লাগিল। বলিলেন, "বাপু, মানুষ চেনা বড়ই কঠিন, সকলের সঙ্গে মন খুলে কথা কবার জো নাই। তা করো না, ঠক্‌বে। সাধন ভজন ঠিক ঠিক মত করলে কিছুদিন পরেই প্রত্যেক জীবের মনের ভাব বুঝতে পারবে। তখন মনে মনে হাসবে, আর বলবে, 'বাবা এই মানুষ জামায়, কাপড়ে, ঘড়িতে, ঘড়ির চেনে বাবু, যেন ফিট্ বাবু, বাহিরটা সাদা ফিট্ ফাট্, কিন্তু ভিতর যে একেবারে নরক অপেক্ষা—পায়খানা অপেক্ষা, ঘৃণিত।' বাপু, এই সব জীব নিয়ে সংসারে চলা বড়ই কঠিন, মন্দকে মন্দ বলবার জো নাই, ঠিকঠাক্ বল্‌লে গাল দিবে, নিন্দা করবে। ঐ শক্তি তোমার শীঘ্রই আস্‌বে। এসেছে—সব কথা বল না, ভাব গোপন করবে। তারাপ্রসন্ন বাবু (গুঙ্করার জমিদার তারাপ্রসন্ন চোঙ্গদার) আমাকে (গুরুজীকে) গণনা করিয়া তাহার বিষয় বলিবার জন্য জেদ করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছি, উপেন্দ্র আসিলে বলিয়া দিবে। সে বেশ বলতে পারে। তুমি একবার তাঁর বিষয় সব বলে দিও।

গুরুদেবের জলখাবার প্রস্তুত হইল, তিনি সেবায় বসিলেন। তাঁহার সেবার পর আমরা প্রসাদ পাইলাম। লুচি, ছোলার ডাল, ভাজা, তরকারী, ক্ষীর, মিষ্টান্ন দিয়া সকলের ভোজন করান হইল।

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় প্রভু শয়নে গমন করিলেন। আমরাও পার্শ্বের ঘরে শুইলাম।

রাত্রি আড়াইটা কি তিনটার সময় 'উপেন্দ্র, উপেন্দ্র' বলিয়া ডাক দিলেন, অমনি বিছানা হইতে লাফ্ দিয়া উঠিলাম। আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। হাত মুখ ধুইয়া তৈল মাখিলেন, পুষ্করিণীর জলে স্নান করিলেন। ধূনা দেওয়া হইল, ঘরে প্রবেশ করিলেন, সেদিন ঘর ফুলের গন্ধে পরিপূর্ণ হইল।

বৈকালে তাঁহার সঙ্গে বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রী৺ঈশানেশ্বর ঠাকুর শিবকে দর্শন করিতে গিয়া অপূর্ব্ব ও মনোহর দৃশ্য দর্শন করি। তাহার পরদিন ঠাকুর গুরুরা রওনা হইলেন। সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিলাম।

এক দিন রাত্রি ২টার সময় ধূনা দিয়া ঘরের মধ্যে স্বীয় অভীষ্ট চিন্তা করিতেছি। হঠাৎ সম্মুখে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। ইহসংসার ছাড়িয়া কোন্ অজানা রাজ্যের সীমায় পৌঁছিলাম, অতি সুগঠন সুঠাম-দেহযুক্ত নরনারী ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে—হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত স্থান। পুরুষ-প্রকৃতি অভেদ জ্ঞানে ব্যবহার চলিতেছে। স্ত্রীলোকেরা দেবীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উল্লসিত মনে বিচরণ করিতেছেন। একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর তীরে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত-শ্রেণী সমারোহ করিয়া দণ্ডায়মান, ঐ পুষ্করিণীতে নানাজাতীয় পুষ্প সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে ছোট ছোট বৃক্ষ নানা প্রকার ফল বিতরণ করিতেছে। একটি গাছের তলায় আমি এক

বালগোপাল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান, আর ইষ্টদেব সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিয়া দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছেন। আমি এই দৃশ্য দেখিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, কোথায় চলিয়া আসিয়াছি, ইহা স্বপ্ন, না প্রকৃতই! আমি স্বর্গে দেবদেবীর সঙ্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছি। আশা মিটে না, দর্শন শেষ হয় না, কাছ ছাড়িতে মন যায় না, যেন যবনিকা পতনের ন্যায় ঐ দৃশ্য আমার সম্মুখ হইতে নীরবে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় পতিত হইলাম—দেখি সেই স্থিরাসনে বসিয়া অভীষ্ট চিন্তা করিতেছি।

কিছুদিন পরে প্রভুর নিকট হইতে পত্র পাইলাম, "উহা স্বপ্ন নহে। ভাবাবেশে দেহের মধ্যে যে যে গুণে মন থাকিয়া যে দৃশ্য দেখায়, উহা তাহাই জানিবে। চিত্ত এক একটি গুণ অবলম্বন করিয়া এক এক ভাব সৃষ্টি করিতেছে। আর বিশ্বপতি তাহার পশ্চাতে আকাশে দ্রষ্টা হইয়া আছেন। আর কখনও বা চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়া নির্গুণ ভাব আনিতেছেন।" পত্র পাইয়া—বলিবার আগে পত্র পাইয়া, ক্রমশঃ যতই আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল, ততই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা আমার নয়ন-পথে পড়িতে লাগিল। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি অকৈতব উদ্যমে প্রাণপণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলাম। ভগবচ্চিন্তায় মন-প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। গুরুদেব আমার

অসাক্ষাতে লোকের নিকট আমার উদ্যম ও বিশ্বাসের কথা বলিয়া শক্তির অনেক প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজের শক্তি আমাতে আরোপ করিতেছেন, ইহা আমি ক্রমশঃ বেশ বুঝিতেছি। নিজে প্রায় লোকের ভাল-মন্দ, কোষ্ঠী-বিচার ছাড়িয়া দিয়াছেন; কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই "উপেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিবে, সে সমস্ত বলিবে" বলিয়া আমার নিকট লোক পাঠাইয়া দেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইলাম। সেই সময় গুঙ্করার মহাবিষ্ণু চোঙ্গদার মহাশয়ের পুত্র যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পীড়িত আছেন, প্রায় ৪২ দিন জ্বর ত্যাগ করে নাই। ডাক্তারেরা আশা ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু গুরুদেবকে "কি হবে বাবা" বলিয়া ধরায় তিনি আদেশ করেন, "উপেন্দ্র অদ্য আসিবে, সে আসিলেই সব ঠিক হইবে।" আমি পৌঁছিলে যজ্ঞেশ্বর বাবু আমার নিকট আসিয়া সমস্ত কথা জানাইলে গুরুজী আমাকে উঁহাদের বাড়ী যাইবার অনুমতি করিলেন। আমি যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত রোগীর নিকট গিয়া দেখি, অস্থি-চর্ম্ম-কঙ্কাল-সার একটি ১৪।১৫ বৎসর-বয়স্ক বালক বিছানায় মিলাইয়া শুইয়া আছে। কিছুক্ষণ বসার পর যজ্ঞেশ্বর বাবু আমাকে বলিলেন "কি প্রকার দেখিতেছেন? বাঁচিবার আশা কি আছে?" আমি বলিলাম, "ইহাকে

মারে কে ? যিনি ইহাকে কষ্ট দিতেছেন, দেখিতেছি তিনিই ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। আর ৭ দিন পরে জ্বর ত্যাগ হইবে, ক্রমশঃ সুস্থ হইবে।" বাবাজীর নিকট আসিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু সমস্ত জানাইলে তিনি বলিলেন, "উপেন্দ্র যাহা বলিয়াছ, তাহাই ঠিক হইবে।" ক্রমশঃ তাহাই হইল।

এই সময় বহু লোক গুরুজীর নিকট দীক্ষা লইবার জন্য আসা-যাওয়া করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল। বণ্ডুল আশ্রম নির্ম্মাণের দ্রব্যাদি সংগ্রহ চলিতে লাগিল। কলিকাতার গুরুভাই রোহিণীকান্ত চেলও সে সময় আসা-যাওয়া করেন।

আমি প্রাতঃকালে গুস্করা হইতে চলিয়া আসিলাম। এইবার আমার কিছুদিনের ছুটি লইবার প্রয়োজন হইল। পূর্ব্বে গুরুদেব যে ঔষধ ও দ্রব্য দিয়াছিলেন তাহার জন্য আমার পত্নী সসত্ত্বা আছেন। মহাত্মা স্বামী নিমানন্দ পরমহংসদেব কামাখ্যায় আমার পুত্র-কামনায় যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আমার পুত্র জন্মিবার কাল নিকট হইয়া আসিয়াছে। আমার বাড়ী যাওয়া আবশ্যক। একদিন প্রভুর নিকট গুস্করা আশ্রমে আসিয়া সকল বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আমি নিকটে দণ্ডায়মান, বাবাজী প্রাতে পূজাদি শেষ করিয়া তক্তাপোষে বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন— "উপেন্দ্র, দু'-এক মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী যাও। বাড়ী

যাওয়া দরকার। দাদা গুরুদেব স্বামী ভৃগুরাম পরমহংস পত্র লিখিয়াছেন, 'উপেন্দ্রকে বলিবে, আগামী ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রে রাত্রি ১১-৫৮ মিনিটের সময় এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে। উপেন্দ্র যেন বাড়ী যায়'।" বলিয়া যে বালক ভূমিষ্ঠ হইবে তাহার কোষ্ঠী-চক্র আমাকে দিলেন।

বলিলেন, "যাও, কোন চিন্তা নাই।" আমি প্রণাম করিয়া বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিয়া দুই মাসের ছুটির দরখাস্ত দিলাম। সাহেব ছুটি মঞ্জুর করিলেন। আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম। আমার বাড়ী বাঁকুড়া জেলার অধীন ওন্দা থানার অন্তর্গত দামোদরবাটী গ্রাম। বাড়ী আসিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হওয়ায় মনের কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলাম। মন-প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ-মত কার্য্য করিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্নেহমাখা পত্র পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলাম। দেখিতে দেখিতে ফাল্গুন, শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি আসিয়া উপস্থিত। রাত্রি ১১-৫৮ মিনিটের সময় পুষ্যা নক্ষত্রে এক নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইল। গণনাকারী দৈবজ্ঞগণ প্রাতঃকালে আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া লগ্ন প্রস্তুত করিলেন, সেই একই। আমি বালকের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে কোষ্ঠীচক্র পাইয়াছি বলায় 'উহা হইতে পারে না' বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। ছেলে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কি কোষ্ঠী প্রস্তুত হয়! ইহা তাঁহারা এই প্রথম

শুনিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, "আপনি নিজে কোষ্ঠীচক্র প্রস্তুত করিতে জানেন, বোধ হয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর উহা প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন।" কি বলিব? বলিবার ভাষা নাই, এই জগতে কত শত নূতন নূতন আশ্চর্য্য ও অমূল্য নিধি আমাদের চক্ষের উপর ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে। কত শত দেবের আরাধ্য ধন ঐ কৌপীনধারী, গুহাবাসী ঈশ্বর-প্রেমিক ভিক্ষুকের ঝুলির ভিতর রহিয়াছে, তাহা দেখিবার, পাইবার, উপলব্ধি করিবার জন্য হে বদ্ধ জীব, তোমরা কি একবার একদিনের জন্যও চক্ষুর জল ফেলিয়া, ভগবানের নিকট কাঁদিয়া তাঁহার কৃপাভিখারী হইয়াছ? না, নিজের উদরকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া, যেন-তেন-প্রকারেণ উদরপূর্ত্তির জন্য, আত্মশ্লাঘার জন্য, বড় মানুষ হইবার জন্য, দেশের নিকট, দশের নিকট আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট ধনী, গুণী, মানী বলিয়া নিজেকে দেখাইবার জন্য, অর্থ উপায়কল্পে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইয়াছ! তাই বলি ভাই সকল, জগৎ ভুলিয়া, প্রাণ মাতাইয়া, সেই চক্রধারীর চক্র ভেদ করিয়া নিজে কৃতার্থ হও—পূর্ব্ব-পুরুষকে কৃতার্থ কর।

দেখিতে দেখিতে আমার ছুটি শেষ হইয়া আসিল, কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটিবার জন্য মোট বাঁধিতে লাগিলাম। মোট বাঁধা, যাওয়া-আসা আর ঘুচে না, প্রভু! হে কর্ম্মরূপী গুরু! আমায় কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত করুন প্রভু! আপনার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মবন্ধন যায় না। প্রভু!

সম্মুখে দুস্তর কর্ম্মসাগর দেখিয়া আমি ভীত হইয়াছি, কি করিয়া অসীম কর্ম্মসমুদ্র পার হইব! আমায় শক্তি দিন্। কাতর প্রাণে কৃতাঞ্জলিপুটে এই ভিক্ষা করি, প্রভু আমায় বল দিন্, হে দুর্ব্বলের বল, শ্রীগুরু! কৃপা করিয়া আমায় বল দিন্। পিতা অপরাধ ধরিলে দাঁড়াইবার স্থান নাই।

দুইদিন ছুটি থাকিতে থাকিতে বর্দ্ধমান রওনা হইলাম। বর্দ্ধমানে গিয়া শুনিলাম, আমার পরম শত্রু ত্রৈলোক্যনাথ দাস আমার স্থানে রিজার্ভ সব্‌ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। আমি ছুটিতে থাকার সময় তিনি শত্রুরূপে আমার শ্রীগুরুর নিকট গমনাগমন করিয়া আমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অধিকন্তু তিনি প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময় আমার আর এক শত্রু বাবু নিবারণচন্দ্র ঘোষ আসানসোলে দারোগা থাকার কালে অশেষ বিপজ্জালে জড়িত হইয়া আমার কল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শুনিলাম, প্রভু আমাকে বহু বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন জানিয়া ত্রৈলোক্য ও নিবারণ বিপদে পড়িয়া বিপদ-কাণ্ডারীর শরণ লইয়া মনপ্রাণ শীতল করিয়াছে। ত্রৈলোক্যের সহিত আমার বাক্যালাপ ছিল না। ছুটির পর হাজির হইয়া এই প্রথম দিন অফিসে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ত্রৈলোক্য প্রেমবাবুকে বলিয়াছেন, "উপেন্দ্র কোন্ থানায় যাইতে চাহে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। গুরুজী তাঁহাকে ভাল থানায়, জলবায়ু ভাল এমন থানায়,

দিবার জন্য বলিয়াছেন।” আমি বলিলাম, “আমি ভাই কোথায় যাইব? ভগবান্ শ্রীগুরুদেব যেস্থানে দিবেন তথায় যাইব। যমের ঘরে দিলেও হৃষ্টমনে যাইব। ত্রৈলোক্য কি পৃথিবীর কর্ত্তা?” তাহার পর সন্ধ্যাবেলা গুরুজীর নিকট গমন করিলাম। বহুদিন দর্শন করি নাই, আজ প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, তাই শ্রীচরণ দর্শন জন্য দৌড়িলাম। গুক্ষরায় পৌঁছিয়া দেখি, গুরুদেব তখনও উঠেন নাই, দরজা বন্ধ। বাহিরে বসিলাম, প্রায় ১ ঘণ্টা পরে কপাট খুলিলেন, আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। গুরুজী বলিলেন, “এসেছ, সব ভাল ত?”

আমি। আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবা।

আমি তামাক সাজিলাম। তাহার পর পাখা করিতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ত্রৈলোক্য আমার পরম শত্রু, সে আবার আমার শ্রীগুরুর নিকটে দীক্ষা লইল! গুরুজী কেন আমার শত্রুকে ভালবাসিলেন! হিংসায় রাগে দুঃখে আমার মন বড়ই বিচলিত হইতে লাগিল।

এই সময় গুরুজী দুইবার আমার মুখপানে তাকাইলেন, কিছু বলিলেন না। তাহার পর সন্ধ্যায় সেবায় বসিলেন। আমি বারেণ্ডায় বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। সেবা করিয়া প্রভু বলিলেন, “উপেন্দ্র, আমার পাতেই বসো, জল খাও।” আমি জল খাওয়ার পর বারেণ্ডায় তাঁহার পদ-সেবা করিতেছি, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, “বাবা,

তোমার মন খারাপ করিবার কোন কারণ নাই। কেন বৃথা মন খারাপ কর? কাল আবার ত্রৈলোক্যের সঙ্গে ভাব ও ভালবাসা হইবে, এই সকল চিন্তা করার জন্য তোমার আত্মগ্লানি আসিবে। বাবা, কেহ কাহারও শত্রু বা কেহ কাহারও মিত্র নয়। কালের প্রবল গতিতে এই সকল ভাব আনিয়া দেয়। ত্রৈলোক্য তোমার অনেক অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছু কি করিতে পারিয়াছে? তাহারও বিশেষ আত্মগ্লানি আসিয়াছে—সে বুঝিয়াছে, কাহারও দ্বারা কিছু হয় না, ভগবান্ যাহা করেন, যাহা করান, তাহাই ঠিক। জীবের কি সাধ্য ইষ্টানিষ্ট করিতে পারে? কেহ তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিলে, তুমি তাহার ইষ্ট চিন্তা করিবে। বাবা, ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম। ইহা বহি পড়িয়া, চিন্তা করিয়া, হইতে পারে না। বেশী পড়িলে প্রায়ই বেশী তর্ক উঠিয়া মনকে সন্দেহ-বাতাসে দোলায়। বহু মুনির বহু মত, নানা শাস্ত্রে নানা উপায় ও নানা পন্থার কথা লেখা আছে। কলিকাল, জীব অল্পায়ুঃ, সকল বিষয় দেখিতে গেলে চলে না। গুরুর আজ্ঞা-মত কর্ম্ম করিয়া যাও। মন যখন যে গুণের স্থানে থাকে, তখন তাহার সেই ভাব হয়। শ্রীগুরুর আজ্ঞায় কর্ম্ম করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয় ও সদ্‌গুণের আশ্রয়ে থাকিয়া মন সর্ব্বদাই আনন্দ-রস পান করিতে থাকে। একে তোমরা কিছু বুঝ না, তাহার উপর ঐ বুদ্ধি লইয়া সবটাই একেবারে বুঝিয়া লইতে যাও—সুতরাং কোন রসই পাও না। মন

সর্ব্বদাই এক একটি গুণে থাকিয়া মোহিত হইতেছে ও মোহিত করিতেছে, গুণাতীত-ভাব পাইতেছে না। 'তুরীয়ম্, চতুর্থম্, দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতম্'-ভাব কি গুণে থাকিলে পায়, বাবা? এখন তোমার মন যে গুণকে অবলম্বন করিয়া 'ত্রৈলোক্য আমার শত্রু, গুরুজী তাঁহাকে বেশী ভাল বাসিয়াছেন,' এই কল্পনা বা ভাবের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাকে ধরিতে চেষ্টা কর। মনকে সেই স্থান হইতে ধীরে ধীরে সরাইয়া ভিন্ন স্থানে রাখিতে পারিলে, এই ভাব তিরোহিত হইয়া আবার এক নূতন ভাবের নিশ্চয় অবতারণা করিবে। তাই বলি, সর্ব্বদাই আত্মভাবে থাকিতে চেষ্টা কর। ত্রৈলোক্যকে তোমার পরম শত্রু বলিতেছ, আবার সময়ে এমন ভাব হবে যে, ছাড়া দায় হবে, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সে ভালবাসা যাবে না। সর্ব্বদাই সৎচিন্তা করিবে. সৎ-অসৎ বিচার করিবে, 'নেতি-নেতি' করিয়া বিচার করিলে ভগবান্ শ্রীগুরু নিজেই এমন মার্জ্জিত বুদ্ধি দিবেন যে, অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু ধারণায় আসিবে। তখন কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ করিবার মত তোমার মধ্যে ভাব আসিয়া তোমাকে পাগল করিবে। ত্রৈলোক্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? কিছু বল্লে?"

আমি। না বাবা, সে নিজে কিছু বলে নাই। প্রেম বাবুকে বলেছে, 'উপেন্দ্র কোথায় যেতে চায়, জিজ্ঞাসা করিবে। গুরুদেব বলেছেন উপেন্দ্রকে ভাল স্থানে দিবে।'

গুরুজী। ওগো, নিবারণ বলে একটি ছেলেও

ত্রৈলোক্যের সঙ্গে ক'দিন এসেছিল, তারও নাকি ভারি বিপদ—সাহেব নাকি বড় চটেছে। বেটারা চাকরী নিয়েই গেল। তার সঙ্গে তোমার ভাব কেমন ?

আমি। ত্রৈলোক্য ও নিবারণ দুয়ে একজোড়, তাহারা পূর্ব্বে আমার শত্রুতা করেছে, এখন নিজের দোষ নিজেই দেখছে।

গুরুজী। বাপু, যাই বল, ত্রৈলোক্যের আধার ভাল। ক্রিয়া নিয়ে খুব খাটছে। তার ভাই রাধাচরণ শিষ্য হয়েছে।

আমি। তাদের বাড়ী কোথা ?

গুরুজী। মালদহ জেলা, বাচ্চামারি গ্রাম। তাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন উভয়েই আসবে।

আমি। তাকে বললে আমার সঙ্গে কি আসবে ?

গুরুজী। খুব আসবে। সে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ছটফট্ কর্‌ছে। আমি সব বলেছি।

কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় টোলের অধ্যাপক মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে তামাক সাজিতে বলিলেন। আমি তামাক সাজিয়া বাবাকে দিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে যোগের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। অনেক বিষয় তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেবল বাবাজীর নিকট গন্ধ লইতেই আসিতেন। বাবাজী নানা প্রকার স্বর্গীয় গন্ধ তাঁহার গাত্রে মাখাইয়া দিতেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায় বলিতেন, "আমাকে এই গন্ধ আনাটি শিখাইয়া দাও।" দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় ১২টা হইল। বড় গরম, বাবাজী বারেণ্ডায় ষ্ট্রেচারের খাট পাতিয়া মশারী খাটাইয়া শুইলেন। আমি নীচে মাছুর পাতিয়া ঘুমাইলাম। রাত্রি শেষে ঘুম ভাঙ্গিল, উঠিয়া দেখি, গুরুজীর ঘরে আলো জ্বলিতেছে। তিনি এর মধ্যেই স্নান আদি করিয়া জগৎ-পিতার আরাধনায় বসিয়াছেন। আমিও বিছানা ত্যাগ করিয়া মুখ-হাত ধুইয়া ইষ্ট-চিন্তায় বসিলাম। আমি উঠিয়া দেখি, তখন সাতটা,—গুরুজী উঠেন নাই। প্রায় ৭॥টার সময় উঠিলেন। আমি স্নান-জল লইয়া বিদায় হইলাম। বর্দ্ধমান ফেরত আসিলাম। আফিসে ত্রৈলোক্যের সঙ্গে দেখা হয়। দেখিবামাত্র সে নিজেই দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "তুমি কি কল্য গুষ্করায় গিয়াছিলে? আমাকে বলিলে আমিও যাইতাম" —অনেক কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিল। কোথায় আমার বদলি হবে তার ঠিক নাই। তুইটার সময় আফিস হইতে চলিয়া যাইবার সময় ত্রৈলোক্য আমাকে বলিল, "আমার বাসায় সন্ধ্যার সময় যাইবে, ঐখানেই ভোজন ও শয়ন হবে। আমার মেয়ে-ছেলে নাই, একাই আছি।" "আচ্ছা" বলিয়া আমি পুলিশ-ক্লাবে চলিয়া গেলাম। বৈকালে ৫ টার সময় দেখি, ত্রৈলোক্য নিজেই গিয়া হাজির। কতকক্ষণ বসার পর বলিল, "চল ৺ ঈশানেশ্বর শিবঠাকুরের দর্শন করিয়া শ্যামসাগরের তীরে বেড়াইব। আমরা উঠিলাম। সঙ্গে

প্রেম বাবুও চলিলেন। গুরুজীর বিষয় নানা কথা বলিতে বলিতে আমরা ৺ঈশানেশ্বর শিবঠাকুরের মন্দিরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। বাহিরে জুতা রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ৺শিবঠাকুরকে দর্শন করিলাম, ঠাকুরের মাথার উপর পর্য্যন্ত ফণা বিস্তার করিয়া একটি সর্প দাঁড়াইয়া আছে, বেশ নির্জ্জন স্থান, সম্মুখে বৃহৎ শ্যামসাগর পুষ্করিণী, চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত রাজপথ, চারিদিকে নানাজাতীয় বৃক্ষ, বিস্তৃত স্বচ্ছ জলরাশি পুষ্করিণীর মধ্যে থাকিয়া কি শোভা ধারণ করিয়াছে! পুষ্করিণীর উত্তর ধারে সাধু-সন্তদিগের থাকিবার আশ্রয় একটি লম্বা খড়ের ঘরের চালা-ঘর। (এখন পাকা হইয়াছে শুনিয়াছি।) তথায় ২।৫ জন সাধুবেশধারী আশ্রয় লইয়া আছেন। তা ছাড়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলেও ধুনী জাগাইয়া ইতস্ততঃ কৌপীনধারী মহাত্মাও রহিয়াছেন। দক্ষিণে প্রশস্ত বাঁধান ঘাট, তাহার পার্শ্বে ৺রাসবিহারী ঘোষ (প্রসিদ্ধ হাইকোর্টের উকিল) মহাশয়ের দোতালা বাসা বাটি। পশ্চিমে বাগান, এখন এই স্থানে প্রকাণ্ড হস্‌পিটেল ও মেডিক্যাল ইস্কুল হইয়াছে। পূর্ব্বধারে প্রশস্ত রাস্তা ছাড়া বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নাই। ইতিপূর্ব্বে এই পূর্ব্বধারের রাস্তার নিকট জলের কিনারায় পরমারাধ্য জ্যেষ্ঠতাত গুরুদেব ভৃগুরাম পরমহংসদেবের শিষ্য স্বামী অভয়ানন্দ পরমহংস আসিয়া তিন দিন স্থিতিলাভ করিয়াছিলেন।

মন্দিরের ভিতর ৺শিবঠাকুরের হিন্দুস্থানী পূজারী মহাশয় বহুদিন হইতে এখানে আছেন প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে ৺শিবঠাকুরের প্রসাদ কিছু কিছু ভাঙ্গ বিতরণ করিলেন। লোকটি বেশ হাসি-হাসি মুখ, বয়স প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর হবে। আমরা কিছু কিছু করিয়া ৺শিবঠাকুরের প্রণামী বলিয়া তাঁহাকে দিলাম।

হঠাৎ বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনে একজন অপূর্ব্ব সাধু নামিয়া সহরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। এই শব্দ সহরে প্রচার হইল, আমি তখন রিজার্ভ সব্‌ইনস্পেক্টর। সকলে সাধুর অন্বেষণ করিতে করিতে এই শ্যামসাগরের তীরে আসিয়া উপস্থিত। গৌরবর্ণ, বিস্তৃত দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, মস্তকে বৃহৎ জটাভার, ত্রিপুণ্ড্রধারী, বিস্তৃত ললাট, নাতি-দীর্ঘ দাড়ি, আকর্ণ-পূরিত পটল-চেরা চক্ষু,—যোগিরাজ জলের অতি কিনারায় পদ্মাসনে অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তন্ময় মনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট। দর্শকবৃন্দ সতৃষ্ণ নয়নে একদৃষ্টে ঐ মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাষ্ঠবৎ দণ্ডায়মান, কাহারও মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নাই। প্রকৃতি যেন নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছেন, ব্যষ্টিভাবসমূহ দর্শকবৃন্দের পৃথক্ পৃথক্ দেহ হইতে দৌড়িয়া যেন সমষ্টিবিশিষ্ট কেন্দ্রস্থল ঐ যোগিরাজের ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত। কে এ অপরূপ রমণীয়-দর্শন? দুইজন চেলা কোথা হইতে আসিয়া নিজেরা নিজেরা ধুনী জ্বালিতেছে। বৃষ্টির আশঙ্কায় সহর-

দারোগা গণেশ সিং (বেনারেস জেলা, ফুলপুরী থানা-বাসী) ছুটিয়া আসিয়া খড়ের চালা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। সকলে মহাত্মার শ্রীমুখ দর্শন করিবার সুবিধা পাইতেছেন না। তাই কেহ কেহ ভাল করিয়া মুখ দেখিতে পাইবে বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া মুখ দেখিতে লাগিল, লোকের হাট বসিয়া গেল, পান-বিড়ির দোকান বসিল, সাধুর ধুনীর নিকট টাকা সিকি ছুয়ানি পয়সা পড়িতে লাগিল। কেহ ডাব, কেহ সন্দেশ, রম্ভা, যাহার যা-মন, সাধুর সেবার জন্য আনিয়া ফেলিতে লাগিল, সাধুর দৃষ্টি সেই একই ভাবে আবদ্ধ, লক্ষ্য একদিকে, অন্য কোন দিকে চাওয়া নাই, ধীর ও স্থিরচিত্তে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া গম্ভীর ভাবে সমাসীন রহিয়াছেন। বিশাল উদর, উঠা নাই, সন্ধ্যা নাই, পূজা নাই। রাত্রি ৮টা হইল, তথাপি ভাবের পরিবর্ত্তন নাই। রাত্রি যত বেশী হইতে লাগিল দর্শকবৃন্দ ততই কমিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত থাকিলাম, লোক নাই বলিলেই হয়, তখনও সাধুর সেই এক ভাব। খাওয়ার চেষ্টা, কি কোন দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ, কিছুই নাই—'নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।' কিছুক্ষণ পরে চলিয়া গেলাম, মনে করিলাম, প্রাতে আবার আসিব। গুরুজীর শ্রীমুখে এই স্বামীজীর কথা শুনিয়াছিলাম। দেখি নাই, কি প্রকারে জানিব ইনিই তিনি। প্রাতে আসিয়া দেখি, যে ভাবে দেখিয়া-ছিলাম ঠিক সেই এক ভাব, চেলাদিগকে জিজ্ঞাসায়

বলিল, রাত্রি প্রায় ২টার পর তাহারা চলিয়া যায়। দেখিলাম একই ভাবে আছেন, যেখানের দ্রব্য সেইখানেই রহিয়াছে। সাধুও নিশ্চল, তিন দিবস কোলাহলপূর্ণ জনতার ভিতর ছিলেন, কিন্তু কেহ স্নান, ভোজন, সন্ধ্যা, পূজা কিংবা মলমূত্র পরিত্যাগ, কিছু দেখেন নাই। কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। শেষ দিবস গুরুজী আসিয়া দেখা করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা মাত্র হইয়াছিল। সমস্ত পয়সা টাকা খাদ্যদ্রব্য যথাস্থানে রহিল। তিনি আসন উঠাইলেন। ষ্টেশনে পৌঁছিলে কত লোক কত জায়গার টিকিট কিনিয়া কমণ্ডলুতে ফেলিয়া দিল। কোথায় যাইবেন, তাহা কেহ জানে না। গাড়ী আসিল, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল না। গাড়ী পশ্চিম মুখে ছুটিল। গুরুজীর নিকট শুনিয়াছি, উনিই অভয়ানন্দ স্বামী।

শ্যামসাগরের পশ্চিম ধারে একটি ছোট বাঁধান ঘাটে বসিয়া ত্রৈলোক্যের সঙ্গে গুরুজীর বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। ত্রৈলোক্য বলিল, "ভাই, আজ সব বলি দাদা তোমাকে, উপর্য্যুপরি বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে দেখিয়া আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি নাই যে, তুমি কি উপায়ে উদ্ধার পাইলে। অনুসন্ধানে জানিলাম, তুমি মধ্যে মধ্যে গুষ্করায় যাও, তথায় এক সাধু আছেন, তিনিই তোমাকে রক্ষা করিতেছেন। শুনিয়া তুমি ছুটিতে যাওয়ার পর আমরা তাঁহাকে

দেখিতে যাই। আমরা দুই তিন বারের পর গিয়া তাঁহাকে তোমার বিরুদ্ধে দুই এক কথা বলিলে তিনি বলিলেন, 'উপেন্দ্রের সম্বন্ধে কেহ কিছু বলো না। যদি বল, তোমরা এখানে এস না।' আমরা শুনিয়া অবাক্। তাহার পর তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে বলেন, না বলিবার পূর্ব্বে আমি স্থির করিয়াছিলাম, তুমি ছুটি হইতে আসিলে নিজেই তোমার সঙ্গে আলাপ করিব।" তাহারা গুরুজীর আশ্চর্য্য শক্তি ও অকৈতব ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াছে, বলিল। দুই এক দিন পর দুইজনেই বিকালের গাড়ীতে শ্রীগুরু দর্শনে গুষ্করা গমন করিলাম, গাড়ীতে উঠিয়া উভয়েই নিস্তব্ধ। গাড়ী খানা-জংসন পার হইয়া গেল। বনপাশ ষ্টেসন পার হইবার পর অতি সূক্ষ্মভাবে পদ্মগন্ধ আসিতে লাগিল। উভয়েই তাহা পাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ গাড়ী-ভর্ত্তি গন্ধ। আরোহীরা সকলেই তাহা পাইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছে, নিকটে কি পুষ্করিণীতে পদ্ম ভরা আছে। আমরা হাসিতেছি, বলি, "হাঁ মহাশয়, গুষ্করায় পদ্মগন্ধের পুষ্করিণী নহে—দীঘি আছে।" আমরা যাইবার পূর্ব্বেই আশ্রমের সাহানি নামক চাকরকে গুরুজী বলিয়াছেন, "ত্রৈলোক্য ও উপেন্দ্র আসিতেছে। কেদারকে, (কেদার মোদককে) বল, তাহাদের জল-খাবার প্রস্তুত করে।" বলিয়া কপাট বন্ধ করিয়া সন্ধ্যায় বসিয়াছেন, আমরা পৌঁছিলাম, সাহানি চাকর হাসিতে লাগিল।

বলিল, গুরুজী আপনাদের জল-খাবার প্রস্তুত করাইবার জন্য বলিয়া সন্ধ্যায় বসিলেন। কেদারের চাকর আমাদের জন্য কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া জল খাইতে দিল। বাবাজী উঠিলে খাইব বলিয়া রাখিয়া দিলাম। বসিয়া আছি, তুই চার জন গুষ্করার লোক গুরুজীকে প্রণাম করিতে আসিলেন। তাঁহারা আমাকেই চিনিতেন, ত্রৈলোক্যের পরিচয় করাইয়া দিলাম। দেখিতে দেখিতে গুরুজী কপাট খুলিয়া বাহির হইলেন। সকলেই একে একে প্রণাম করিলাম। তিনি দ্বার দেশে পূর্ব্ব-পরিচিত তক্তাপোষে বসিলেন। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম। আমি পাখা করিতে নামিলাম। কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জল খাইতে আদেশ করিলেন। আমরা কচুরী, মিহিদানা দিয়া জল খাইয়া নিকটে বসিলাম। গুরুজী তামাক খাইতে খাইতে ত্রৈলোক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপেন্দ্রের কি কোথাও বদলি হইয়াছে?"

ত্রৈলোক্য। না বাবা, কোথাও হয় নাই।

গুরুজী। উপেন্দ্রের মন্তেশ্বর থানায় বদলি হলে ভাল হয়।

ত্রৈলোক্য। তথায় পাকাভাবে দারোগা একজন আছে, খালি নাই।

গুরুজী। খালি হবে, উপেন্দ্রকে সেইখানেই দিও।

বদলি হইবার পূর্ব্বেই, ভগবান আমার বদলি করিয়া দিলেন। কোথা সাহেব—কোথা বা পাকা দারোগার থাকা,

কাহার হুকুম কে দেয়, ত্রৈলোক্য চুপ করিয়া আছেন। গুরুজী জল খাইবার জন্য উঠিয়া গেলেন। বলিলেন, "তোমরা বস, আমি জল খাইয়া আসি।"

ত্রৈলোক্য। হাঁ দাদা, কিছু বুঝি না, তোমার বদলি মন্তেশ্বরে কি করে হবে? নতুন সাহেব তোমাকে চেনে না, পাকা দারোগাকে সরিয়ে কেন তোমাকে দিবে?

আমি। ত্রৈলোক্য, তোমার মনে কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় যে আমার মন্তেশ্বরে বদলি হবে না? ভাই, তুমি স্থির নিশ্চয় জেনো, কাহারও সাধ্য নাই যে ঐ বদলি বন্ধ করে। উহা নিশ্চয় হইয়া আছে, হাতে হাতে দেখিবে।

ত্রৈলোক্য। আচ্ছা দেখি।

আমি। তবে আজ প্রায় দুই মাস কি জন্য আসা-যাওয়া করিতেছ? শুধু লুচি-কচুরী ফল-মিষ্টান্ন সেবা দিতে না কি হে?

ত্রৈলোক্য। কি জানি দাদা, এখন পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারি নাই। যদিও দুই একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, কিন্তু বিচার-বুদ্ধি যায় নাই।

উপেন্দ্র। ভাই, উহা কি এত সোজা যে শীঘ্র শীঘ্র হবে? তোমার দোষ নাই, বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া বড়ই কঠিন তপস্যা-সাপেক্ষ। বিশ্বাস কি সহজ কথা, দাদা? তাঁহার দয়া।

ত্রৈলোক্য। দয়া কি আপনিই হয়?

উপেন্দ্র। দয়া ত হয়েই আছে, উনি বলেন। তবে দয়া বোধে আনা শক্ত, উহা কর্ম্ম-সাপেক্ষ।

এমন সময় গুরুজী আসিলেন। আমরা শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। তিনি আসনে বসিলেন। বলিলেন, "কি গো, তোমাদের কি-সব বিচার হচ্ছে?"

আমি। বাবা, ত্রৈলোক্যের সঙ্গে বিশ্বাসের কথা হচ্ছিল।

গুরুজী। বিশ্বাস কি সহজে হয়, বাবা। বিশ্বাস দৃঢ় হলে ত সবই হল। কত তপস্থায় বিশ্বাস দৃঢ় হয়। এই দেখ তুমি এত কাঁদ, তোমার বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য কত প্রকার জিনিষ প্রত্যক্ষ করাইতেছি, কিন্তু তবু তুমি পরীক্ষা করিতে গিয়া আমার আদেশের বিপরীত কার্য্য করিয়া কত বড় বড় বিপদে পড়িতেছ। তবু ত ছাড় না। সংস্কার নষ্ট হওয়া সময়-সাপেক্ষ। নষ্ট হবে বাবা, কারিকরের হাতে ঠিক ঠিক পড়লে সোজা হয়ে যাবে। পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজে কষ্ট পাও, আমাকেও কষ্ট দাও। তাতে তোমার বিশ্বাস, আরো দৃঢ় হচ্ছে, তাই বাধা দিই না। ওতেও তোমার বিশেষ মঙ্গল আছে।

ত্রৈলোক্য। অবিশ্বাস এলে, গুরুর আদেশের বিপরীত কর্ম্ম করিলে, ত অধোগতি হয়।

গুরুজী। না, ওর তা হবে না, ওর বিশ্বাস আছে। বিপদে পড়িলে শ্রীগুরু রক্ষা করিবেন, এ বিশ্বাস ওর আছে, তাই ওকে নিয়ে আমি খেলা করি, দুর্ব্বল চিত্তের লোক

হলে যা বল। ও সে দুর্ব্বল নয়। সেদিন অন্ধকার রাত্রি, ঝড়-বৃষ্টি, গুষ্করা ষ্টেশন হইতে এখানে আসা বড়ই কষ্ট, কিন্তু ও বিপদকে গ্রাহ্য না করিয়া, সাপের মুখে ভূতের মুখে নির্ভীক চলিয়া আসে ত! একেই একাগ্রতা বলে। বাপু, চোর হোক, ডাকাত হউক, খুনে হউক, পারা যায়—যদি চরিত্র ভাল হয়, যদি পর-স্ত্রীতে মাতৃ-বোধ থাকে। তাদের স্রোতের মোড় ফিরিয়ে দিলেই হয়। তাদের ভিতরে যে-কোন পথ অবলম্বন করিয়া হউক একটা বেশ একাগ্রতা থাকে ত। তাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও ধারাল। যাদের খস্‌খসে বুদ্ধি তাদের কোন জন্মে কিছু হবার নয়। তোমরা নিজের নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন ক্রমশঃই বুঝিবে।

এই সব কথা হইতেছে, এমন সময় আমাদের জল-খাবার আনা হল। আমরা খাইতে বসিতেছি, এমন সময় গুরুদেব বলিলেন, "কৈ আমি যে প্রসাদ রাখিয়াছি কোথা তাহা?" প্রসাদ আসিল, আমরা সেবায় বসিলাম। প্রভু স্বহস্তে বিতরণ করিতেছেন। প্রথমে রম্ভা ইত্যাদি ফল, তাহার পর লুচি, কচুরী, পটল ভাজা, তরকারী, বরফী, গজা মিহিদানা, ক্ষীর দিয়া আমাদের খাওয়াইলেন। আমরা হাত-মুখ ধুইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে শিষ্ট বালকের ন্যায় নিকটে বসিলাম।

গুরুজী। উপেন্দ্র, মন্তেশ্বরের থানায় গিয়া বণ্ডুল আশ্রমের দিকে লক্ষ্য রাখিবে। ইট হইতেছে না, উহার

কার্য্য বন্ধ আছে, সব দেখে শুনে করিও। মন্তেশ্বর থানার জল ভাল গো। আমাদের বাড়ী বণ্ডুল ঐ থানার এলাকায়। ভাল ইট আনাবে। আর যা যা করতে হবে, দেখে শুনে করো, করোগেট রোহিণী কলিকাতা হতে পাঠাবে, কাটোয়ার খুদুকেও লিখেছি।

খুদু বাবু গুরু ভাই। তাঁহার ভাই রাধাবল্লভ বাবু বর্ম্মায় ঠিকাদারী করে অনেক পয়সা টাকা উপায় করেছেন। বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ায় খুব ঘর-বাড়ী করেছেন। তাঁহারা গুরু ভাই। বাবাজী পাঁচসিকা পয়সা দিয়া লক্ষ টাকার ফর্দ্দ করিলেন। আমি বলিলাম, "পয়সা কোথা ?"

গুরুজী। পয়সার অভাব কি রে, তোরা থাক্‌তে টাকা বৃষ্টি-পাতের মত বর্ষণ হবে।

গুরুজী। দাদা গুরুদেবকে এত অনুনয় করে বলেছি, আমি আশ্রম করিব না, ৺শিব প্রতিষ্ঠা করিব না, কিন্তু কি তাঁহাদের অভিপ্রায়, তাঁরা কিছু শুনিবেন না। টাকা-কড়ি যাহা ছিল, তাহাও লইলেন। জ্যোতিষালোচনা বন্ধ করিলেন। আবার বলেন, 'আশ্রম কর, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা কর।' কি করি বাপু বল দেখি। তোমরা যাও, ঘরে বিছানা হয়েছে, শোও গিয়া।

আমরা গিয়া শুইলাম, রাত্রি দুইটার সময় দেখি, তাঁহার ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে।

ত্রৈলোক্য। উপেন্দ্র দেখ, ঐ প্রকারে পার্‌বে। ত্যাগ দেখ, উগ্র তপস্যা দেখ।

ত্রৈলোক্যকেও নানা বিষয় দেখাইয়াছেন। কিন্তু ত্রৈলোক্য কিছু চাপা, সব কথা বলে না। আমি কৌশলে বুঝিলাম, তাহাকেও বিশেষ ভাবে কৃপা করিয়াছেন। আমার সঙ্গে ত্রৈলোক্যের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, করটীয়ার খাঁকি বাবা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভাস্করানন্দ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাদের অপূর্ব্ব ত্যাগ ও একনিষ্ঠ তপস্যার বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল।

ত্রৈলোক্য। তুমি জান রামকৃষ্ণ পরমহংসের গুরু কে?

আমি। না ভাই জানি না, তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলাম, অদৃষ্টে না থাকলে হয় না। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার না থাকলে হবার নয়। উনি কি একজন্মে ঐরূপ সাক্ষাৎ মায়ের সঙ্গে কথা কহিবার পাত্র হয়েছেন! কত জন্ম-জন্মান্তর তপস্যা করিয়া আসিতেছেন। ভগবানের সঙ্গে, মা আদ্যাশক্তির সঙ্গে, মানুষের মত কথা কহা কি সহজ ব্যাপার হে, ভাই? শান্ত সচ্চিদানন্দ, অসীম নিরাকার ব্রহ্ম কি অপূর্ব্ব একাগ্রতা ও ত্যাগ, কি একটানা ভালবাসার গুণে বশীভূত হইয়া ভক্তের জন্য রূপ ধারণ করেন। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল মস্তিষ্কের লোকের পক্ষে উহা কি সম্ভব, ভাই? তবে শ্রীগুরুর কৃপা হলে সবই হয়।

ত্রৈলোক্য। কৃপা করিলে হয়, কিন্তু কি করিলে কৃপা হয়!

আমি। কৃপাময়ই জানেন। শ্রীগুরুর মুখে শুনিয়াছি,

শ্রীগুরু ও ভগবানের কৃপা ত হয়ে রয়েছে, উপলব্ধি কে করে। তাঁর কৃপা অনুভূতিতে আনতে হলে বিধির বিধান মেনে চলতে হয়। গুরুদেব একদিন বলেছিলেন, 'জগৎ সচ্চিদানন্দময়, ভূত ভাবলেই ভূতে ঘেরে লয়।' তাই, যে যা ভাবে হরি তাঁকে তাই দিয়ে থাকেন। ভূত ভাবলেই ভূত, হরি ভাবলেই হরি আপন হন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ বালক ছিল, কিন্তু ভূত ভাবে নাই, নির্ব্বিকার মনে 'হা মধুসূদন, পদ্মপলাশ-লোচন' 'হা হরি' বলে কত ডেকেছিল, কত কেঁদেছিল। অনাহারে, অনিদ্রায় বিপদ-সমুদ্রের ভিতর শ্রীহরির রূপ চিন্তা করে, জালে হড়হড় করে মাছ টেনে আনার মত ব্রহ্ম-সমুদ্র হতে নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার করে টেনে এনে ছেড়েছিল। আহা, গুরুদেবের এই কথাটি আমার হৃদয়-মাঝে আঁকা রয়েছে। *

---

* একদিন ১৯১০ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে আমার বেশ মনে হয়, বরিশাল জেলার দেশবিখ্যাত ও পূজ্য বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত যখন মানভূম জেলার ধানবাদ মহকুমার গোবিন্দপুর নামক স্থানে জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্য আসিয়াছিলেন, আমি তখন ধানবাদে ইনস্পেকটর ছিলাম। প্রায় তাঁহার নিকট যাইতাম, তিনিও আমায় ভাল বাসিতেন। বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় তখন ঐ স্থানে স্কুল-ইন্স্পেকটর ছিলেন। একদিন গীতা পাঠ হইতেছিল। কথা-প্রসঙ্গে আমি গুরুদেবের ঐ উক্তি—'এ জগৎ সচ্চিদানন্দময়—ভূত ভাবলেই ভূতে ঘেরে লয়' এই কথাটি বলিবামাত্র অশ্বিনী বাবু একটু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

কিন্তু ভাই চিঁড়ে ভিজে না। যা যা করলে ভগবৎ লাভ হয়, তা তা ঠিক ঠিক ভাবে করতে হয়।

ত্রৈলোক্য। তবে কর না কেন?

আমি। সামর্থ্যে কুলায় না যে দাদা। শ্রীগুরু শক্তি দিলে হবে। পরে দেখবে, আমিও কি হই, তখন তোমায় ভাল করে চেলা করব।

ত্রৈলোক্য। তুমি ত দাদা চেলা হয়েই আছ।

ভোর হইয়া গেল। আমরা মুখ হাত ধুইবার জন্য নদী-তীরে গেলাম। আসিয়া দেখি, প্রভু উঠিয়াছেন। আমরা প্রণাম করিলাম, স্নান-জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছি।

গুরুজী। ভাল করে জল খাও।

সন্দেশ, আম সেবা করিয়া উভয়ে পদধূলি লইয়া বর্দ্ধমান চলিলাম। সেই দিন আফিসে গিয়া শুনিলাম, আমার বদলির হুকুম হয় নাই। বৈকালে শুনিলাম,

---

বলিলেন,—"হাঁ হে, এযে বড় জবর কথা দেখছি, তুমি ত কম নও। শুধু পুলিশ নও। এ অতি উত্তম কথা। এক কথায় সবই আছে। ও ভাবকে ধরে কে?" বলিয়া নোট বহিতে ঐ কথা লিখিয়া লইয়াছিলেন। একদিন ভালবেসে বলেছিলেন, "তুমি আসবে, তোমায় দেখতে মন চায়।" আমি তথায় গেলে তিনি ও তাঁহার গুণময়ী ভার্য্যা আমাকে উপাদেয় দ্রব্য দিয়া নিকটে বসিয়া ভোজন করাইতেন।

তথাকার দারোগা বিনোদবিহারী উপাধ্যায় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বর্দ্ধমানে আসিয়াছে।

ত্রৈলোক্য। তোমার বোধ হয় মন্তেশ্বর থানায় বদলি হয়।

আমি। কেন হে।

ত্রৈলোক্য। শুনিতেছি বিনোদ উপাধ্যায়—দারোগা ছুটি লইবে। অসুস্থ হইয়াছে।

অপরাপর সকলে চলিয়া গেল।

আমি। ভাই দেখ, কোথা থেকে কি হয়। তোমার এখনও 'বোধ হয়' গেল না। কেমন হে, নিশ্চয় বলতে পার না?

ত্রৈলোক্য। যতক্ষণ না হয় কি করে বলি।

আমি। আমরা অন্ধ, ঘোর অবিশ্বাসী, তাই সর্ব্বদাই সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া বেড়াই। গুরুদেব কি বলিলেন মনে নাই?

ত্রৈলোক্য। হাঁ, আছে বৈ কি।

আমি। তবে কেন ও কথা বল।

ত্রৈলোক্য। বলায় তাই বলি।

আমি। কে বলায়?

ত্রৈলোক্য। মন বলায়।

আমি। মন তোমার কে হে। তুমি মনের, না মন তোমার? তুমি মনের, তাই তোমার অবিশ্বাস। সন্দিগ্ধ

মনকে নিজের করলে ও ভাব থাকে না। কথায় বলে, যার মন ঠিক, তার সব ঠিক। আমার বদলি কার সাধ্য বন্ধ করে।

ত্রৈলোক্য। দেখা যাক।

পরদিন আফিসে গিয়ে শুনি, আমার বদলি হয়েছে। ত্রৈলোক্য বলিল, সাহেব তাহাকে ডাকাইয়া হুকুম দিয়াছে।

আমি। ভাই দেখলে, কার হার হয়েছে?

আমার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় আমাদের গ্রামের শশিভূষণ অধিকারী নামে একজন জিতেন্দ্রিয় সৎ ব্রাহ্মণ থাকিতেন। মন্তেশ্বর যাইবার পূর্ব্বে ঐ ব্রাহ্মণ সহ আমি গুষ্করায় বাবাজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সন্ধ্যার সময় পৌঁছিলাম। তখন ঘরের কপাট বন্ধ। আমরা বঙ্ক সাধুর দোকানে বসিয়া গল্প করিতেছি, দরজার কপাট খোলার শব্দ পাইয়া তথায় গেলাম, গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম। তাঁহার গাত্রে অত্যন্ত ঘাম দেখিয়া পাখা করিতে লাগিলাম।

গুরুজী। তোমার বদলি হইয়াছে?

আমি। আজ্ঞা হাঁ হয়েছে, তাই দেখা করতে এলাম।

গুরুজী। কবে যাবে?

আমি। দুই তিন দিন মধ্যে যাব মনে করছি।

গুরুজী। তাই যাও, দেরী করে কাজ নাই।

আমি। বাবা, বদলি ত আপনি অনেক দিন করেছেন।

গুরুজী। হাঁ, ভগবানের ইচ্ছায় সবই হয়, বাবা।

তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে জীব স্বীয় ইচ্ছা সমসূত্রপাতে আনিতে না পারায় জগৎ অন্ধকার দেখে। জীব মনে করে 'সবই আমি করিতেছি'। তুমি মনে কর আর না কর, তোমার যে নিশ্বাস বয়, তা বন্ধ হয় কি? মনে করি নাই, তাই নিশ্বাস বন্ধ হয়েছে—এ কথা কি হয়? সে নিজের কাজ করে যাবে। কে তাকে চালায়, বাবা?

আমি। কি করলে সব জানা যায়, বাবা? আপনার এই সকল দেখে শুনে মনে হয় কি করে আমরা ঐ রকম হব!

গুরুজী। হবে, তাঁর কৃপায় সবই হয়। একটু চরিত্র ঠিক রাখিয়া শঠতা না শিখিয়া সরল মনে ডেকে চল, সব হবে। শাস্ত্র তাই বলে গো। ত্রৈলোক্য কেমন আছে?

আমি। ভাল আছে।

গুরুজী। সে এল না কেন?

আমি। তাঁর কি জরুরী কাজ পড়েছে, তাই আসতে পারলে না।

গুরুজী। দেখবে তোমার সঙ্গে কেমন তার মেল হবে—তোমাগত প্রাণ হবে।

একটু পরেই সেবা করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন। ঐ দিন তাঁহার অন্যতম ভক্ত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ৺কালিদাস ঘটক মহাশয় বাবাজীর সেবার জন্য তাঁর বাড়ী হইতে নানা রকম খাবার দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাবাজী যাইবার সময় বলিলেন, "উপেন্দ্র, আজ এসেছ ভাল, আজ দেখবে কত

রকম জিনিষ খাবে। ঘটক মহাশয় পাঠিয়ে দিয়েছেন।”
দেখিতে দেখিতে ঘটক মহাশয় আসিয়া উপস্থিত।

ঘটক। এই যে উপেন্দ্র বাবু, কখন?

আমি। এই সন্ধ্যার গাড়ীতে।

ঘটক। (বাবাজীকে সম্বোধন করিয়া) এই যে এঁরা এসেছেন, আরও বেশী বেশী জিনিষ আনি।

গুরুজী। না, দরকার নাই, ওই ওতেই হবে। অত কে খাবে?

প্রভুর সেবা হল, তামাক সাজিয়া দিলাম। আমি পদ-সেবা করিতেছি, কোন দিন পদ-সেবা করিতে ভুল হলে পা বাড়াইয়া দিতেন। আমি তাঁর সেবা করিয়া নিষ্পাপ হই। শরীরের মধ্যস্থ গ্লানি দূর করিবার জন্যই এত আয়োজন। সেই সময় টোলের অধ্যাপক মহাশয় উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম, তিনি রাত্রে বাবাজীর নিকট প্রায় থাকেন।

গুরুজী। এই যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এসেছেন, তাঁর জন্য ভাগ রেখো, অনেক দ্রব্য আছে, কেলেকে ডাকা হউক।

ভট্টাচার্য্য। খাবার কে দিলে?

গুরুজী। ঘটক মশায়ের বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ভট্টাচার্য্য। বেশ বেশ, দেখুন আপনার আড্ডায় এলে সব রকমই মিলে,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

গুরুজী। কেন গো ?

ভট্টাচার্য্য। দেখুন শাস্ত্রালোচনাও প্রত্যক্ষভাবে দেখা —এমন আর কোথাও শুনি নাই। তার পর সেবা—এমন সেবার জুত বাবা দেখি না। ব্রাহ্মণপণ্ডিত সেবা পেলেই সন্তোষ।

গুরুজী। দেখবেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যেন সেবা-অপরাধ না হয়।

ভট্টাচার্য্য। দেখুন আমাকে এক-আধটু শিক্ষা দেন, যখন আপনার এখানে আসি, আমি মনে মনে করি, উনি ত বেশ আছেন, আমিও ঐরকম হতে চেষ্টা করব। কিন্তু আবার দেখি মনটা যেমন ঠিক তেমনই, কি করি বাবা।

গুরুজী। কেন আপনি ত বেশ আছেন। ব্রাহ্মণের সবই ত করছেন। শাস্ত্র পাঠ, টোলে ছাত্রদিগকে সৎশিক্ষাদান, পূজা-সন্ধ্যা সবই ত করছেন। তবে বেশ নাই কেন বলছেন ?

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, তা বটে, কিন্তু চাকরী স্বীকার করেছি, পরাধীন হয়েছি। স্বাধীন না হলে কি ঠিক ঠিক হয়। আনন্দ ত পাই না।

গুরুজী। দেখুন, ভগবান যা করেন ভালর জন্য—ও সবও ত চাই। আপনার দ্বারায় ঐ রকম কাজ করান তাঁর দরকার, তাই করাচ্ছেন। ওতে দ্বিধা আনা ঠিক নয়। আবার যখন অন্য রকম করান দরকার হবে, তিনিই মোড় ফিরিয়ে দিবেন। তিনি যাঁকে যে কর্ম্মে রাখেন, একাগ্রতাসহ

তাতে থাকলে তিনি প্রমোশন দেন, আর ঠিক-মত না থাকলে দণ্ড দেন।

ভট্টাচার্য্য। ঠিক করলে উত্তম যোগী হওয়া যায়।

গুরুজী। "সাধ হয় বৈষ্ণব হতে, পোঁদ ফাটে মচ্ছব (মহোৎসব) দিতে"। জানেন, যোগী হতে হলে, ঠিক ঠিক ভাবে সাধন করতে হলে, বড় কষ্ট স্বীকার করতে হয়। অধিবাস সহ্য করাই দায়। বাঘের অধিবাসের গল্প জানেন? এই বলিয়া ব্যাঘ্রের বিবাহের একটি সুন্দর গল্প বলিলেন।

ভট্টাচার্য্য। আচ্ছা, যে যা চায় সে তা পায়। এটি কি ঠিক কথা?

গুরুজী। হাঁ খুব ঠিক। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। পণ্ডিত হয়ে আবার ভুল করছেন যে।

ভট্টাচার্য্য। আমরা মুখে পণ্ডিত। লোককে বলবার বেলা খুব সাধু—যেন ব্যাস, বশিষ্ঠ; কিন্তু কার্য্যকালে দেখি, আর এক রকম। যে ভাগ্যবান্ আপনার মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বাল্যকাল হ'তে ত্যাগী, অনুরাগী, তাহারাই ঠিক জানতে পারে। এই আমরা ছাত্রদিগকে এত জ্ঞানের উপদেশ দিই, কিন্তু তাতে কি হয়?

গুরুজী। দেখুন আপনারা ঐটি ভুল করেন। অজ্ঞানীকে কিছুতেই জ্ঞানমার্গের উপদেশ দিবেন না। তাহাদিগকে "তুমিই ভগবান্" এমন শিক্ষা দেওয়া ঠিক নয়, কারণ তাহা হইলে বাল্যকাল থেকে তাদের কর্ম্মে অশ্রদ্ধা হয়। আর

অজ্ঞানী কর্ম্ম না ক'রে শুধু জ্ঞান-আলোচনা করলে নিতান্ত পাপাচারী হইয়া উঠে। তাদিগকে কর্ম্মের উপদেশ দেওয়াই ভাল, যাতে নিষ্কাম কর্ম্ম করতে পারে। নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন আত্মোন্নতি হয় না, যেমন বিকারগ্রস্ত রোগীকে কি ভূতে-পাওয়া লোককে হাজার বলুন যে, 'তুমি বিকারী রোগী নও হে, তোমাকে ভূতে পায় নাই', সে কিছুতেই তা ধরবে না, শুনবে না। একজন একাগ্রতা সহকারে গাড়ুর বিষয় চিন্তা করতে করতে গাড়ুর ভার পায়, যে স্থানে বসেছিল সেখান থেকে আর উঠে না, কেহ জিজ্ঞাসা করলে কথা বলে না। কেবল বল্‌ত, "ঢক্ ঢক্"—যেন গাড়ু হ'তে জল বের হচ্ছে। এমনি সংস্কার। তাই অধিকারী দেখে শিক্ষা দিলে মূলে ভুল হয় না, মঙ্গল হয়। এখন দেশ হয়েছে লেক্‌চারভরা —কে কার উপদেশ নেয় মশায়। সবাই গুরু।

রাত্রি অনেক হল। খাবার প্রস্তুত ছিল —সমস্ত দ্রব্য আনা হল। প্রভু সম্মুখে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। লুচি, মাল্‌পো, তরকারী, ছানার সন্দেশ, ক্ষীর, মিহিদানা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি নানা দ্রব্য দিয়া ভোজন করা গেল। আমরা মুখ হাত ধুইয়া পান খাইতে খাইতে তাঁহার নিকট বসিলাম। একটু পরে বলিলেন, "যাও ঘুমাও। আবার রাত্রি থাক্‌তে উঠতে হবে।" আমরা বারেণ্ডায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। গুরুদেবের আহার বালকের ন্যায়—দুই একটা লুচি, একটু মিষ্টান্ন, অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধ। নিদ্রা ত নাই, সমস্ত

রাত্রিই ভগবদারাধনায় যায়। বড় গরম, ঘুম হয় না, বসিয়া আছি, নিকটে আসিয়া বসিলেন।

গুরুজী। ঘুমাও নাই যে?

আমি। বাবা, ঘুম হয় নাই, বড় গরম।

গুরুজী। তোমার সঙ্গী লোকটি ত বেশ নাক ডাকাচ্চে। ওরা খেতে ঘুমতেই এসেছে। দেখ, সংসার কত রকম নিয়ে। রকম বলেই ত সংসার। যেস্থানে রকম নাই, সেই স্বর্গরে, বাপু। অনেক লোক এখানে আস্‌তে আরম্ভ করেছে। তারাপ্রসন্ন বাবু (গুস্করার জমিদার) বলেন যে, এত লোক ভোলানাথের নিকট কি করতে আসে, তাঁর মনে মনে হিংসা এসেছে, বাপু। বলব কি? উঁহার পত্নী গেল, ছেলে গেল, 'বিবাহ করব না' ব'লে নদীর ধারে আশ্রম করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, উহা বৈরাগ্য নয়, উহা শশ্মান-বৈরাগ্য—হটকা বান, থাকবে না। আবার কি করি, পশ্চিমে তাঁদের (দাদা গুরুর) নিকট গেলাম, ফিরে এসে বিবাহ দেওয়া গেল। বলিলাম, তোমার স্ত্রী মরবে না, আবার পুত্র হবে। তাই হল গো, ঐ ধনেশ্বর ছেলেটি হল, তবু অবিশ্বাস, বাপু। ওঁর স্ত্রীর খুব বিশ্বাস, খুব সাধ্বী স্ত্রী, বড় ভাল বৌ, সংসার যাবার নয়। ওঁর পিতা ৺হরিশ্চন্দ্র চংদার মশাই ভাগ্যবান্ লোক ছিলেন। দয়া-ধর্ম্ম ছিল, ধন-সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য তিনিই করে যান—এ সব ঘুচাবে।

প্রায় ভোর হয়ে এল, হঠাৎ উঠিয়া স্নান করিতে গেলেন, আসিয়া পূজায় বসিলেন। আমার সঙ্গী ব্রাহ্মণটিকে উঠাইয়া মুখ হাত ধুইতে গেলাম।

ব্রাহ্মণ। তুমি এখানে এত এসো কেন ?

আমি। আমার আস্‌তে ভাল লাগে, তাই আসি। ভাল না লাগলে আসব কেন, আপনি ও কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?

ব্রাহ্মণ। আমার ভাল লাগে না।

আমি। কেন, এখানে গুরুগিরি কর্ত্তে পান না, তাই ভাল লাগে না। দেখুন, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেহ সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। তাঁর তপঃপ্রভাবে অনেক শক্তি হয়েছিল। তাই আলোর কাছে যেমন পোকা, আলোর জ্যোতিতে মুগ্ধ হয়ে আসে, তেমনি বহু লোক আসিত। আলোর নিকট মরিবার জন্য পোকা আসে, আর মহাপুরুষদের নিকট শান্তি পাবার জন্য লোক আসে। তাই আপনার পূর্ব্বপুরুষদের শক্তিতে আনন্দ পেয়ে অনেক লোক শিষ্য হয়েছিল, এখন সেইটি আপনাদের জমিদারী হয়েছে, জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা শিষ্যের কি উপকার ও আত্মোন্নতির চেষ্টা করছেন, বলুন।

ব্রাহ্মণ। না, তা বলি না। তবে আমার ভাল লাগে না, তাই বলছি।

আমি। পরে দেখবেন খুবই ভাল লাগবে। আপনাকেও ঐ পদ আশ্রয় করিতে হইবে, ইহা যেন স্মরণ থাকে।

আমরা আশ্রমে ফেরত আসিয়া বসিলাম। ব্রাহ্মণ শশীবাবুর মুখ একটু ভার-ভার দেখিয়া বলিলাম, "মশায়, চট্‌লেন না কি?"

ব্রাহ্মণ। না, চট্‌ব কেন? বলি, ট্রেনের সময় হল, যাবে না?

আমি। উনি না উঠিলে যাইব না।

ব্রাহ্মণ। যদি ট্রেন ফেল হও?

আমি। কোনদিন হই নাই, হব না। আর যদি ফেলই হই, জলে ত পড়ি নাই, সে ত ভাল হয়, আরও দুই পাঁচ ঘণ্টা নিকটে থাকিতে পাই।

ব্রাহ্মণ। তোমাকে পারব না। তাই ভাল!

এমন সময় মহাবিষ্ণু চংদার মশায় আসিয়া উপস্থিত। তিনি আসিয়াই দূর হইতে আমাকে দেখিয়া বলিলেন "এই যে, আপনি কখন?" এঁর ছেলেরই অসুখ হয়েছিল, গুরুদেব আরোগ্য করান।

আমি। কাল সন্ধ্যার ট্রেনে এসেছি।

মহাবিষ্ণু। এখন কোথায় আছেন?

আমি। ছুটিতে ছিলাম, মন্তেশ্বর থানায় বদলি হইয়াছি, তাই প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

বিষ্ণুবাবু। আপনার বিশ্বাস ও গুরুভক্তি আশ্চর্য্য। আমরা ও রকম পারি না। আমাদের ঘরে শালগ্রাম, তবু দুই বেলা আসিতে পারি না। ইনি (গুরুদেব) উঠেন নাই?

আমি। না, উঠেন নাই। আপনার ছেলেটি কেমন আছেন ?

বিষ্ণু। হ্যাঁ ভাই, তোমাদের গুরুর কৃপায় ভাল হয়ে উঠেছে।

গুস্করার চংদার বংশের আজকাল সময় খুবই ভাল।

পূর্ব্বপুরুষ হরিশ্চন্দ্র চংদার ও গিরিশচন্দ্র চংদার বড়ই ভাল লোক ছিলেন। তাঁহারা জমীদারী রংমহল বালাখানা বার মাসে তের পর্ব্ব করিয়া গিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র চংদারের পুত্র তারাপ্রসন্ন বাবু, আর ৺গিরিশচন্দ্রের পুত্র মহাবিষ্ণু চংদার, উভয়ে অনেক পার্থক্য। তারাপ্রসন্ন বাবু খুব সংসারী, আর মহাবিষ্ণু চংদার যেন গৃহস্থ বৈষ্ণব। মহাবিষ্ণু বাবুকে দেখিলেই মনে হয়, উদারপ্রকৃতি, নির্ম্মলচিত্ত, দীর্ঘকায়, হাত পা লম্বা সুগঠন। ইনি ভগবদ্‌ভক্ত, দয়া-ধর্ম্মশীল, প্রজাপীড়ক নন। শুনিয়াছি, সাধন-ভজন লইয়া থাকেন। তারাপ্রসন্ন বাবু একটু গেঁড়া, তীক্ষ্ণবিষয়-বুদ্ধি, উগ্রস্বভাব, এক কথায় সত্ত্ব ও রজোগুণ দুই ভাইয়ের উপর পূর্ণ মাত্রায় খেলা করিতেছে। তারাপ্রসন্ন বাবুর মাথা গরম হয়—অনেক চিকিৎসায় ও ঔষধ এবং তৈল ব্যবহার করিয়াও ফল পান নাই। তিনি দীর্ঘনগর আশ্রমের ৺শিবানন্দ ব্রহ্মচারী, যাঁর কৃপায় আমি আমার ইষ্ট লাভ করিয়াছি, সেই মহাপুরুষের নিকট গিয়া স্বীয় পীড়ার কথা উত্থাপন করিয়া কিসে ভাল হয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

উত্তরে ব্রহ্মচারী মশায় বলিয়াছিলেন, "উহা ভাল হবার নয়। ভাল হবে না। বাবা, ঐ ব্যাধি তোমার পরম মিত্র জানিবে। তোমাকে ঐ ব্যাধি অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছে। ভগবান্ কৃপা করিয়া তোমাকে উহা দান করিয়াছেন। উহা বৃথা তাড়াইবার চেষ্টা করিবে না। ঐ ব্যাধি না থাকিলে তুমি যাহা মনে আসে তাহাই করিতে।" এই কথা শুনিয়া তিনি স্থান ত্যাগ করেন। মহাবিষ্ণু চংদার মহাশয়ের অনেক সদ্‌গুণ আছে। গুরুদেবের কোন অসুবিধা না হয়, ইহাই তাঁহার সর্ব্বদা লক্ষ্য। তারাপ্রসন্ন বাবুর পিতা ৺হরিশ্চন্দ্র চংদার বলিয়াছিলেন, "এই শালগ্রামটি (গুরুদেবকে) যেন বাড়ীতে সযত্নে রাখা হয়। বহুভাগ্যে আসিয়াছেন, যে দিন এই স্থান ত্যাগ করিবেন, সেইদিন ওঁর সঙ্গে সব চলিয়া যাইবে। কার্য্যেও তাহাই হইতে বসিয়াছে, পরে দেখিবেন।"

গুরুদেব কপাট খুলিলেন। যেন প্রাতঃকালীন সূর্য্য উদয় হইল। সে মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণ গলে, পাহাড় টলে, মরুতে বারি দেখা দেয়। উপস্থিত সকলেই দাঁড়াইলেন। পদধূলি মস্তকে লইলেন, কেবল আমার সঙ্গী ব্রাহ্মণটি উঠিলেন না। সকলে কিছু কিছু প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেলেন, যে সকল আতুর ঔষধের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই গেলেন না। আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। দেখিয়া বলিলেন, "গাড়ীর দেরী আছে। একটু তামাক

কর।” আমি তামাক দিয়া পাখা করিতেছি। তখনও বেশী কথা কহিবার ইচ্ছা নাই। যেন নেশা কাটে নাই। আস্তে আস্তে বলিলেন, “জল খাওয়া হয়েছে ?”

আমি বলিলাম, “হাঁ, বাবা।”

গুরুজী। উনি (শশী ব্রাহ্মণ) ?

আমি। উনি খাবেন না।

গুরুজী। তা হলে এসো, পত্র দিও।

“যে আজ্ঞা” বলে আমি বিদায় হইলাম, বেলা প্রায় দশটার সময় বর্দ্ধমান পৌঁছিলাম। স্নান আহার করিয়া অফিসে গেলাম, বদলীর হুকুমী কাগজ লইলাম। ত্রৈলোক্যের সঙ্গে দেখা করিলাম।

ত্রৈলোক্য। কি হে, কাল গুস্করা গিয়েছিলে ?

আমি। হাঁ গেছলাম, তুমি গেলে ভাল হত। অনেক ভাল ভাল কথা হল, খাবার ধূম আবার তাহতে বেশী।

ত্রৈলোক্য। তুমি কাল মন্তেশ্বর যাবে ?

আমি। হাঁ, কাল নিশ্চয় যাব। তিনিও কাল যেতে বলেছেন। তুমি নিকটে থাকলে, তোমার ভাগ্য ভাল, আর আমি দূরে গিয়ে পড়লাম।

ত্রৈলোক্য। দূরে থাকা ভাল, মনের একাগ্রতা বাড়ে, সর্ব্বদা ভয় থাকে।

আমি। তাঁর কৃপা। বণ্ডুল আশ্রমের জন্য অনেক কাজ করতে হবে। তুমি তোপের মুখে থাকলে। যেদিক

থেকে যে দ্রব্য আসবে তুমিই বণ্ডুল পাঠাবার ভার নিয়েছ। কাষ্ঠ কয়লা ইত্যাদি—কেমন?

ত্রৈলোক্য। সে সব আমি ঠিক করব, চিন্তা নাই।

ত্রৈলোক্য ওজনে ভারী, কথা ভারী, তার ফাঁকা আওয়াজ নহে। মুখে যা বলে, কাজে তা করে। সে হাল্‌কা থাকের লোক নহে। একবার যা ধরবে, তা ছাড়ে না, সাহেব-টাহেবকে ভয় আদৌ নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, ধীর ও মন্দ মন্দ গতিতে কাজ করে। এই ত্রৈলোক্য পরে চাকরী ছাড়িল, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে তীর্থে তীর্থে সাধন ভজন করিয়া বেড়াইতেছে। আর আমি সংসারাশ্রমেই কাটাইলাম,—ইহাই দুয়ের প্রভেদ! রাত্রে ত্রৈলোক্যের বাসায় সেবা করিলাম। পরদিন প্রাতে একটি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া মন্তেশ্বর চলিলাম, বেলা দশটার সময় সেখানে পৌঁছিলাম। গ্রামের এক প্রান্তে থানা, থানার সম্মুখে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ও তাহার পাহাড়ে পুষ্পোদ্যান। অনেক রকম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, মনে মনে করিলাম, এ বেশ হল, কাজ-কর্ম্মও শুনিলাম খুব কম, বসে বসে তাঁকে ডাকা যাবে। খাবার বন্দোবস্ত—একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম থেকে আনা হল, তিনিই পাক করিলেন। আমার এক আত্মীয় এই থানায় জমাদার রহিয়াছেন। তিনিও বিশেষ যত্ন করিলেন। আমার সঙ্গী শশীঠাকুর প্রায় চুপচাপ থাকেন, বেশী কথা কন না। একধারে

একটি কম্বলের আসন করিয়া বসিয়া জপ করেন। বলেন, আমি দারোগা উপেন্দ্রের গুরু। পশার বেশ হল, সকলে মানতে লাগল, আদর-যত্ন বেশী হল। সিপাহীরা প্রায় কাছ ছাড়া হত না। তিনি কবচ-টবচও দিতেন, দয়া-শ্রদ্ধা করে যে যা পারত টাকাটা সিকিটা দিত। নিকটে একটি ক্ষুদ্র নদী, প্রায় সেইখানে স্নান করতাম। আর সন্ধ্যা-সকাল ভগবান্‌কে ডাকিয়া চলিতে লাগিলাম, দুই দশ দিন থাকার পর পুলিশ সাহেব inspection করিবার জন্য আসিলেন। থানা পরিদর্শন করিলেন, অসন্তুষ্ট হইলেন না। আমি মেয়ে-ছেলে আনিব বলিয়া ৪ দিনের ছুটি চাহিলাম, ছুটি মঞ্জুর হল। তারপর দিন শশীঠাকুর সহ বাড়ী চলিলাম। বাড়ীতে আসিয়া একদিন মাত্র থাকিয়া ছেলেটি ও মেয়েটিকে লইয়া বাঁকুড়া গেলাম। দাদা ৺দুর্গাদাস চৌধুরী বাঁকুড়ায় ওকালতী করিতেন, তাঁহার শক্ত পীড়া, তাই দেখা করিয়া যাইতে লিখিয়াছিলেন। শরীর বড়ই দুর্ব্বল, এই তাঁকে বাঁকুড়ায় শেষ-দেখা দেখিয়া গেলাম। বৈকালের গাড়ীতে বর্দ্ধমান চলিলাম, তথা হইতে প্রাতে গো-গাড়ীতে বর্দ্ধমানে রওনা হইলাম। পথে কুড়মন গ্রামে অনেক দেরী হইল। বৈশাখ মাস, বড়ই রৌদ্রের উত্তাপ, তাই বাগানে গাড়ী রাখিয়া স্নান করিয়া জল খাইয়া রৌদ্রের তেজ কিছু কম পড়িলে গাড়ী ছাড়িলাম। পথিমধ্যে শুশুনী গ্রামে সন্ধ্যা হওয়ায় তথাকার বাবু রাসবিহারী ঘোষাল

কিছুতেই ছাড়িলেন না। ব্রাহ্মণ নিরীহ, আমাদের অশেষ যত্ন করিলেন ও যত্ন-সহকারে যথারীতি খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিলেন। রাত্রি প্রায় একটার সময় থানায় পৌঁছিলাম। সরকারী বাসা-ঘর অতি কদর্য্য, উপায় কি? তাহাতেই প্রবেশ করিলাম, কাজকর্ম্ম এক প্রকার চলিতেছে, কিন্তু মন স্থির নাই—সেই গুরুরার কথা সর্ব্বদাই মনে হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বাবাজীর বাড়ীর সংবাদ পাই। যাই-যাই করিয়া সরকারী কার্য্যের জন্য ব্যস্ত, সময় হয় না।

একদিন গুরুজীর পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন, "আমি শীঘ্রই বগুল যাইব।" দুই চার দিন পর বগুল আসার সংবাদ পাইয়া আমি রাত্রেই বগুল চলিলাম, অতি প্রত্যূষে পৌঁছিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছি। লোক কেহ উঠে নাই, সামান্য রাত্রি আছে। দেখি, দক্ষিণ দিক্ হইতে আমার গৌর নাচিতে নাচিতে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে উত্তর মুখে স্নান করিয়া আসিতেছেন। প্রথম দেখিয়া গা রোমাঞ্চিত হইল। নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। আমি বাহিরের ঘরেই বসিয়া রহিলাম, এই প্রথম শ্রীগুরুর জন্মভূমি দর্শন। গ্রামটি তত বড় নয়, গ্রামের চতুর্দ্দিকেই বিস্তৃত ধান্য-ক্ষেত্র। উত্তরে শ্মশান-ভূমি ও একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীমাতা ৺সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। ইনি

বাল্যকালে এই সিদ্ধেশ্বরী মাতার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সহসা বাহির হইতেন না, আর স্থান ছিল ঐ শ্মশান-ক্ষেত্রের বটবৃক্ষ। আমি বসিয়া আছি, সকাল হইল, তুইটি আট নয় বৎসর বয়স্ক বালক আসিয়া দাঁড়াইল—যেন কৃষ্ণ-বলরাম। এ তুইটি প্রভুর সন্তান, বড়টি শ্রীমান্ তুর্গাপদ ও ছোটটি শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ। উভয়ের মুখশ্রী, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সবই প্রভুর ন্যায়। ছোটটি যেন গুরুদেবের সকল অংশই অধিকার করিয়াছে, বড়র রং কিছু ফর্সা। কিছুক্ষণ পরে বাবাজীর খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীমান্ ইন্দ্রনাথ আসিলেন। তাঁহারা কেহই বিশেষরূপে আমাকে জানেন না। প্রতিবেশী তুই পাঁচ জন ক্রমশই জুটিতে আরম্ভ হইল। সকলেই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এই গ্রামে হঠাৎ আসার কারণ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, কি জানি এত সকালে থানার দারোগা কেন আসিল। এঁদের বাড়ীতেই বা কি হয়েছে। ইঁহাদের মুখভঙ্গী ও জিজ্ঞাসার কায়দা-কানুনে বুঝিলাম, ইঁহারা উদ্দেশ্য জানিবার জন্য চঞ্চল হইয়াছেন।

আমি। মহাশয়, আমি কোন বিশেষ সরকারী কার্য্যে আপনাদের গ্রামে আসি নাই। আমি যাঁহার বাড়ী আসিয়াছি, তাঁহাকে দর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য।

গ্রামবাসী। "তা বেশ, উনি লোক ভাল, কিছু মন্দ বটেন তা নন। কি হে ভোলানাথ, ভাল লোকই বটে,"

ইত্যাদি প্রলাপ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। উহার মধ্যে একটি ব্রাহ্মণ আমাকে ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। পরে জানিলাম, ইনিই প্রভুর খুড়ো, বাবাজীর সংসারের কাজ-কর্ম্ম দেখেন। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে বাড়ীর মধ্যে আমাকে ইন্দ্র খুড়া ডাকিয়া লইয়া গেলেন, গুরুদেব পূজা সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণ দ্বারী ঘরের পিঁড়ায় বসিয়া তামাক সেবা করিতেছেন। আমি গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিয়া পদরেণু লইয়া কৃতার্থ হইলাম। জল খাইতে বলিলেন। চাঁছি, মিহিদানা লইয়া জল সেবা করিলাম। গুরুজী আমাকে সঙ্গে লইয়া বাহির বাটিতে আসিলেন। গ্রামের লোকেরা অনেকেই উপস্থিত, নিকটবর্ত্তী গ্রামের চৌধুরী মহাশয়েরাও কেহ কেহ আসিলেন। তাঁহারা ঐ গ্রামের তালুকদার, অবস্থাশালী লোক। জাতিতে উগ্র-ক্ষত্রিয়, স্বভাব উগ্র ও অভিমানী। বর্দ্ধমান জেলায় এই জাতির বসবাস বেশী ও আধিপত্য আছে। নিকট গ্রামবাসীরা গুরুজীর অসাধারণ শক্তির বিষয় বিশেষ অবগত নন। ইঁহারা বাবাজীকে সাধারণ মানুষ বলিয়া ধরেন। জ্ঞাতি কি স্বগ্রামবাসী কেহ কাহারও কোন বিষয়ের উন্নতি দেখিতে বা স্বীকার করিতে চান না।

গ্রামবাসী। দারোগা বাবু হঠাৎ আপনার বাড়ী কেন এসেছেন? বিশেষ কোন কাজ আছে বুঝি?

গুরুজী। না, ও আমার শিষ্য, তাই দর্শন করিতে আসিয়াছে।

গ্রামবাসী। ও, তা বেশ বেশ। দারোগা বাবু লোক ভাল; শুনি উনি ধার্ম্মিক লোক। কতদিন মন্তেশ্বরে আসা হল।

আমি। এই অল্পদিন।

তাঁরা 'শিষ্য' এই কথা শুনিয়া আস্তে আস্তে একে একে পলাইবার পথ দেখিতে লাগিলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন যে, কেহ কোন বিপদে পড়ে নাই, এঁদের বাড়ীতে কোন মোকর্দ্দমা পড়ে নাই, দারোগার ঘুষের বন্দোবস্ত কিছু করিতে হইবে না। তাই কেহ হাই তুলিতেছেন, কেহ বা "চল যাওয়া যাক্" বলিয়া মুখ চাওয়াচায়ি আরম্ভ করিলেন। ক্রমে একে একে সকলেই অদৃশ্য হইলেন। বাঁচিলাম বাবা। একবার বাবাজীর সঙ্গে নির্জ্জনে দুটা কথা বলিয়া বাঁচি।

গুরুজী। দেখলে লোকের ব্যবহার, এই মানুষ। এদের ভিতরে যে কি আছে বা ছিল, তা তবু সম্যক্ জান না। অনেক প্রকার মতলবে এসেছিল। যাই শুন্‌লে শিষ্য, অমনি পালাবার পথ খুঁজতে আরম্ভ কর্‌লে। কেহ কি কারও ভাল দেখতে পারে, হিংসা দেশময় প্রবল হইয়াছে। দিন দিন কলিকালের প্রভাব বাড়িতে চলিল, অতি গোপনে কার্য্য করা দরকার, তবে কাজ হাঁসিল হয়। কাকেও কিছু বলিবে না, এখানের আশ্রমের কাজ যাহা করিতে হয় কালী-প্রসন্ন খুড়ার সঙ্গে যুক্তি করে কর।

আমি। আজ্ঞে হাঁ, আপনার কাজে বাধা দেয় এমন লোক এ জগতে দেখি না।

গুরুজী। না গো, বিশ্বাস ক'র না, জগতে সব রকম আছে। সকল রকম নিয়ে জগৎ। ভাল মানুষ আছে, মন্দ মানুষও আছে,। যেমনি ভাল গাছ আছে, তেমনি বিষফলের গাছও আছে, সাবধানে থাকতে হয়। এর পর দেখলেই ভাল মন্দ বুঝবার শক্তি হবে। ত্রৈলোক্য চিঠিপত্র দেয় ?

আমি। আজ্ঞে, ক'বার পত্র দিয়েছিল। গুষ্করা যায় ?

গুরুজী। হাঁ গো, প্রেমচাঁদ, ত্রৈলোক্য, আর আর অনেকেই যায়-আসে, ক্রমশই বাড়িতেছে। এখানেও বহু-লোকের জনতা হবে। তাই শীঘ্র শীঘ্র আশ্রম না করিলে থাকিবার স্থান কোথা ? এস, আশ্রমের স্থান দেখাই।

এই বলিয়া প্রভু উঠিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। বাড়ীর নিকটেই আশ্রমের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমে খুব ফাঁকা শস্যক্ষেত্র, নিকটেই একটি পুষ্করিণী, জলও ভাল, জায়গাও অনেক, যে প্ল্যান করেছেন, যে স্থানে যে ঘর ও গুহা, শিবমন্দির, স্ত্রীলোকের থাকিবার স্থান, পাকশালা, ভাঁড়ার-ঘর হবে সমস্ত দেখাইলেন।

গুরুজী। হরিদাসের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে কি ?

আমি। হাঁ বাবা, হয়েছে।

গুরুজী। বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার হরিদাস প্রায় গুষ্করা আসে, তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই ? তোমার নাম

সে আমার নিকট শুনেছে। বেশ লোক। এখানে বাড়ী আরম্ভ হলে আসবে বলেছে। ভাল রাস্তা করবার সব খরচ দিতে চায়।

আমি। ৺হর-হরি প্রতিষ্ঠা কতদিনে হবে?

গুরুজী। এই মন্দির হলেই হবে। এখানে যে কেন তাঁরা ৺শিবপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য জেদ কর্‌ছেন, কিছু বুঝি না। তাঁরাও মধ্যে মধ্যে এখানে আসবেন, ভৈরবী মা-রাও আসবেন। স্নান কর।

আমি স্নান করিতে গেলাম। গ্রামের দক্ষিণধারে একটি অতি উত্তম পুষ্করিণী, প্রভু রাত্রি-শেষে ঐ পুকুরেই স্নান করিয়াছিলেন। গ্রামের সকল লোকই ঐ পুকুরে স্নান করেন ও উহার জল খান। আমি স্নান করিয়া আসিলাম, আবার আম সন্দেশ দিয়া জল খাইলাম। বাবাজীর বাড়ীতে দিদিমা, মাঠাকুরাণী, পিসিমা, খুড়িমা, ইন্দ্র খুড়া ও প্রভুর সন্তান দুটি প্রায় থাকেন। পিসিমা শ্রীমতী কাশীশ্বরী দেবী ঘরের কাজ দেখাশুনা করেন। খুব বুদ্ধিমতী। বাবাজীর বড়ই আদরের। বাল্য-বিধবা, প্রভুর খুব সেবা করেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। মা-ঠাকুরাণী উদার-বুদ্ধি, কোন বিষয়ে দেখাশুনা নাই। যেন মা আমার সাক্ষাৎ জগদীশ্বরী। দিদিমা (বাবাজীর মাতা) অতি সরল ও সেকেলে, সরলবুদ্ধি। যেন সকলেই আপনার লোক, তাঁর চক্ষে জগতের সবই ভাল। প্রভু মাকে সাক্ষাৎ ত্রিজগতের

মা জ্ঞানে পূজা করেন। এমন মাতৃভক্তি দেখি নাই, ইহা দুর্লভ। তিনি মায়ের কোন ইচ্ছা পূরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। প্রভুর মাতা যখন মৃত ছেলেদের জন্য কাঁদিতেন, বাবাজী বলিতেন, "বৃথা মরামানুষের জন্য কেন কাঁদ মা? কেহ কি মরে গা? তুমি যদি কাঁদ, আমি আর বাড়ী আসব না।"

মা। আমি বাবা তাদের জন্য কাঁদি না, পাছে তোর আবার কিছু হয়, তাই কাঁদি।

বাবাজী। মা, আমার জন্য কেঁদ না, বেঁচে থাকতে থাকতে এত কাঁদবে, ত মরে গেলে না জানি কি করবে। মা, তুমি থাকতে আমি মরব না। যমের সঙ্গে কথা হয়েছে। সে চিন্তা ক'র না।

প্রভুর মধ্যাহ্ন-সেবা হবার পর পিসিমা বললেন, "ওঁর (আমার) কোথায় খাবার স্থান হবে?"

গুরুজী। আমার পাত্রেই উপেন্দ্র খেতে ভালবাসে গো, আমার পাত্রেই দাও। পিসিমা আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বাবার পাত্রেই বসিলাম, অমৃততুল্য সমস্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া, বহুদিনের পাপ নষ্ট করিলাম। জগদ্‌বন্ধু শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলাম, নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলাম। আমি বলিলাম, "অদ্য বৈকালে মন্তেশ্বরে আমার সঙ্গে চলুন।"

গুরুজী। তা বেশ, চল, যাওয়া যাক্।

বেলা আড়াইটা কি তিনটার সময় গো-গাড়ীতে রওনা

হইলাম। শুনিয়াছি, গুরুবাড়ী আসিয়া সকলকে প্রণামী দিতে হয়। আমি বাড়ীর সকলকে প্রণাম করিয়া কিছু কিছু প্রণামী দিলাম। দিদি ঠাকুরাণী বলিলেন, "কেন বাবা উপেন্দ্র, প্রণামী কেন ?"

বাবা। নাও গো নাও, উপেন্দ্র আমার শিষ্য, গ্রহণে দোষ নাই। ওতে উপেন্দ্রের মঙ্গল হবে।

"বেঁচে থাক বাবা" এই বলিয়া দিদিঠাকুরাণী আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দিদিমা। দেখ ভুরি, (গুরুদেবকে দিদিমা 'ভুরি' বলিয়া ডাকেন) উপেন মন্তেশ্বর থেকে প্রায় ছেলেদের জন্য কত জিনিষ পাঠায়। ছেলেদিগকে কত ভালবাসে।

শুনিলাম, আমি মন্তেশ্বর আসিবার কালে বাবাজী বাড়ীতে চিঠি দিয়াছিলেন, 'উপেন্দ্র বণ্ডুল গেলে যেন আদর-যত্ন করা হয়। সে আমার ছেলে দুর্গা, বিষ্ণুর চেয়ে কম নয়,' সে-কথা দিদিমা বলিলেন। বাবাজী রথে উঠিলেন—যেন জগন্নাথ, আমি হাঁটিয়া হাঁটিয়া পিছু পিছু যাইতে লাগিলাম, দুই বার তিনি বলিলেন, "উঠ, হেঁটে কেন যাবে।" তার পর পাকা রাস্তায় উঠিয়া বলিলেন, "গাড়ীতে উঠ।"

আমি। না বাবা, আপনার সঙ্গে এক বিছানায় কি করিয়া যাই, উঠিতে ভয় হয়। গুরুজী "আচ্ছা এস" বলিয়া, পাতা বিছানার উপর নিজের গায়ের গরদের চাদর বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া বলিলেন, "এই ত আমার পৃথক্ আসন

হল। আয়রে বাপু, ছেলে বাবার কাছে বসিবে তাতে ভয় বা দোষ কি ?”

আমি। আগে আপনার কোলে বসিবার মত করুন, তবে ত। চাকর, দাস, এরা কি প্রভুর বিছানায় বসতে পারে?

গুরুজী। হাঁ পারে,—প্রভু যদি ডাকিয়া ভালবাসিয়া আপন ভাবিয়া বসান, তবে পারে।

আমি। আপনার মনের মত হতে পার্‌চি কৈ—আগে ঠিক ঠিক ভাবে 'আমি আপনারই' এ কথা বলিতে, ভাবিতে দৃঢ়রূপে শিখি।

গুরুজী। হাঁ, এ বেশ কথা। প্রথম 'আমি তোমার', তার পর 'তুমি আমার', তার পর 'তুমিই আমি' হইয়া যায়, কিন্তু বাপু ঐ ভাব রাখা দুষ্কর। অহঙ্কারই সব মাটি করে। শাস্ত্র মেনে, গুরু-বাক্য ধ'রে, ক'জন চলে। তা হলে জীবের এত দুর্গতি কেন? কাল-মাহাত্ম্য ত আছে, কলিতে অধিকাংশই মুখ-সর্ব্বস্ব, কর্ম্মী পাওয়া কঠিন। দেশের ব্রাহ্মণেই সব মাটি করলে, বাবা। তাই বিভীষণ বলেছিলেন, আমি কলির ব্রাহ্মণ হব। জ্ঞান-চক্ষে দেখেছিলেন, কলির ব্রাহ্মণের অধোগতি নিশ্চয়। তা বলে কি ভাল নাই, অবশ্যই আছে, তবে খুব কম। তাও বহু কষ্ট পেয়ে যদি স্বীয় ধর্ম্ম রাখতে পারে। কিন্তু সে কজন।

আমি। কলিতে কি সত্য একবারেই নষ্ট করবে ?

গুরুজী। নষ্ট কি জান? জগতে কোন দ্রব্য নষ্ট হয় না,

সবই থাকে ও আছে। তবে কথা এই, যার যখন সময়, তখন তারই অধিকারে অন্য সমস্ত নিস্তেজ হয়ে থাকে। কলিতে সত্য আছে, আবার সত্যেতেও কলি থাকে—না থাকার মত। যারা এ-কালেও সত্য ধরে আছে তাদের কাছে সত্য আছে, তবে বহু ব্যভিচার অনাচার বিকর্ম্মের মধ্যে ভাব ধরে রাখা বড় শক্ত। অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে একথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সম্মুখে ঘোর কলিযুগে জীব কি সনাতন ধর্ম্ম, বেদবিহিত কর্ম্ম করিতে পারিবে? শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, কলিতে সত্যধর্ম্ম রাখা বড়ই কঠিন হবে। অনেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি বহু কষ্ট স্বীকার করে রাখবে, তবে সে প্রকার সৌভাগ্যবান্ অতি কম হবে। বোধ হয়, আমার মন বুঝিবার জন্যই বলিলেন, "ত্রৈলোক্য খুব কর্ম্ম করছে, শীঘ্র শীঘ্র ফল পাবে—যদি ঐ প্রকার একাগ্রচিত্তে কর্ম্ম ক'রে যায়।" আমি উহাতে হিংসাভাব আনি কি না, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য উহা উত্থাপন করিলেন। আমার মনে একটু হিংসার ভাব এসেছিল, পাছে ত্রৈলোক্যই গুরুজীর সব ভালবাসা লইয়া ফেলে। কিন্তু তাহা কি আর বলিব? "হাঁ বাবা, তা বেশ" ইত্যাদি বলিলাম। কিন্তু শ্রীগুরু সমস্তই বুঝিয়া হাসিতে লাগিলেন।

গুরুজী। দেখ হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা বড়ই খারাপ। সৎপথে যারা যেতে চেষ্টা করে, তাদের ঐ সকলের দিকে খুব লক্ষ্য রাখা চাই, তবে ঠিক রাস্তায় যেতে পারে।

দেখ, মনে কত ভাব উঠে। জন্মজন্মান্তরের স্তূপীকৃত রাশি রাশি সংস্কার একত্র হইয়া আছে। সেই সকল লইয়া মন সর্ব্বদাই খেলা করিতে চায়, চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতে চায়। ঈশ্বর মুখে যাইতে হইলে, এই প্রবল শত্রুকে স্বীয় বশে আনিতে হইবে, নতুবা উহা সম্মুখের দিকে তোমাকে টানিয়া লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করিবে। মন-মাতুয়া সকলের অনিষ্টের মূল।

আমি। আমাদের দ্বারা হবে কি ?

গুরুজী। কেন হবে না, মানুষেই ত করে, পশুতে কি করে ?

আমি। মানুষ ত সবাই, কোটী কোটী মানুষ রয়েছে, কৈ সব মানুষে কি ঐ পথে যায় ?

গুরুজী। হাঁ, অনেকে যাচ্চে; তুমি ক'জনকে জান ? দেখ হিমালয়, গির্ণার, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি নানা স্থানে গুহায় গুহায় মহা মহা স্থানে কত কত মহাত্মা গোপনে আছেন। আবার গ্রামে, তীর্থে, নগরেও মধ্যে মধ্যে বেড়ান, কে ধরবে ? ক'জনের ধরবার চক্ষু আছে ? তবে এ কথা সত্য যে মানুষ—তুই-পদ তুই-হস্ত-বিশিষ্ট মানুষ—হলেই মানুষ হয় না। উহার মধ্যে মনোবৃত্তি অনুসারে পশু সর্প 'ব্যাঘ্র প্রভৃতি জাতির মানুষও আছে। তাহাদের কলুষিত বুদ্ধিতে তাহাদিগকে ঐ-জাতীয় জীব বানাইয়া রাখিয়াছে। হিংসা-ভাব উহাদের এতই বেশী যে, সর্প ব্যাঘ্র

ত ভাল। কামবৃত্তি এত প্রবল যে পশু হার মানিবে। তাহারা পশুর ন্যায়, সর্ব্বদাই আহার নিদ্রা আর মৈথুন লইয়া ব্যাপৃত আছে। তুমি কি সেই মানুষের কথা বলিতেছ ?

আমি। হাঁ বাবা।

গুরুজী। না, তা ব'ল না। এর পর মানুষ চিনিতে পারিবে। এতদিন ত বৃথা সময় নষ্ট করিলে, এখন বয়স হয়েছে, এখন থেকে প্রাণপণে লাগ।

আমি। কত বয়স হইতে আরম্ভ করা ভাল ?

গুরুজী। কি জান, একটু জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ১০।১২ বৎসর বয়স হইতে গুরুর নিকটে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন দরকার। সেকালে শিষ্যে প্রথম প্রথম প্রায় ১২ বৎসর কাল হইতে ২২।২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন করিয়া কেহ সংসারে প্রবেশ করিত, আর কেহ বা সন্ন্যাস লইয়া তীর্থে পাহাড়ে গুহায় হরি-সাধনা করিয়া জীবন সার্থক করিত। এখন কি আর সে সব দিন আছে বাবা ? *

* এই বিবৃতি-লেখক উপেন্দ্রনাথ অল্পদিন হইল মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার কাহিনী অসমাপ্তই থাকিয়া গেল। তাঁহার নিকট চতুর্দ্দশ বৎসরের বহু বিবরণ প্রাসঙ্গিক ভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। তাহাতে শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে এমন অনেক কথা ছিল, যাহা এখন অন্যত্র পাওয়ার আশা নাই। আশা করি, তাঁহার যোগ্য পুত্রগণ তাহার উদ্ধার ও প্রকাশ সাধনে যত্নপর হইবেন।—গ্রন্থকার

শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুলিশ অফিসার, আলিপুর—২৪ পরগণা

১। যেবার দুর্গাদাদার (বাবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের) বিবাহ হয়, সেবার বিবাহের দিন ও ৺শিবরাত্রি খুব সামান্য ব্যবধানে হইয়াছিল। দুর্গা-দার বিবাহান্তে বর্দ্ধমানে আসিয়া পুনরায় শিবরাত্রে বঙুল যাইয়া শিবরাত্রি করা যায় না। সেজন্য আমি ও প্রেমচাঁদ ঠিক করিয়াছিলাম যে, সাত দিনের ছুটি লইয়া যাইব এবং বিবাহ ও শিবরাত্রের ব্রতান্তে ফিরিয়া আসিব। এমন সময় আমাদের অফিসে চিঠি আসিল যে, আমাদের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার জেনেরাল টমাস সাহেব আমাদের অফিস পরিদর্শনে ঠিক সেই সময় আসিবেন। এই সংবাদে দুজনেই দুঃখিত হইয়া বাবাকে সমস্ত বিষয় জানাইয়া বলিলাম যে, ডি, আই, জির পরিদর্শন-কার্য্য বন্ধ না হইলে আমাদের বঙুল যাওয়া হইবে না। বাবা সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, যাহা হয় হইবে”। আমরা তখন নিশ্চিন্ত হইলাম। যথাসময়ে সাহেব বর্দ্ধমানে আসিলেন। পরিদর্শনের একদিন পূর্ব্বে বাবাকে সে সংবাদ দিলাম। জেনেরাল সাহেব সেদিন সমস্ত দিন ঘুমাইয়া রহিলেন। তিনি দুপুরে ঘুমাইয়াছিলেন, আর পাঁচটার

সময় উঠিলেন। উঠিবার একটু পরেই কলিকাতা হইতে প্রেরিত তার পাইলেন, তাঁহাকে তখনই কলিকাতায় যাইতে হইবে। তিনি তখনই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, "এখন পরিদর্শন হইবে না, যখন হইবে, পরে জানাইব।" আমরা বিবাহ ও শিবরাত্রির পর আসিলে অনেক দিন পরে পরিদর্শন হইয়াছিল।

২। একদিন রবিবার তুপুর বেলায় বাবা বর্দ্ধমান-রাণীগঞ্জের বাসায় বারেন্দায় খাটের উপর নিদ্রিত আছেন, সম্মুখে মুন্সেফ নরেনবাবু ও উকীল রজনীবাবু তুজনে বসিয়া আছেন। আমি পিছন দিকে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলাম। সহসা চাহিয়া দেখি, রজনীবাবু ও নরেনবাবু তুজনে কি কুড়াইতেছেন। আমি দেখিলাম, সেখানে বহু আঙ্গুর ফল পড়িয়াছে, আমি অনেকগুলি কুড়াইয়া লইলাম। এমন সময় বাবা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, কি হচ্চে?" আমি বলিলাম, "বাবা, এখানে সহসা অনেক আঙ্গুর আসিয়া পড়িতেছিল, নরেনবাবু ও রজনীবাবু অনেক কুড়াইয়া লইয়াছেন, আমিও অনেকগুলি কুড়াইয়াছি।" বাবা তখন বলিলেন, "স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন রূপার গাছে আঙ্গুর ফলিয়াছে। 'আঙ্গুর', এই কথা যেমন মনে হইয়াছে, অমনি আঙ্গুর আসিয়া পড়িয়াছে।"

৩। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাবার আহ্নিকের আসন করিতে যাইয়া দেখি, গুগ্‌গুল ফুরাইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানে

ভাল গুগ্‌গুল পাওয়া যাইত না বলিয়া কলিকাতা হইতে গুগ্‌গুল আনান হইত। বাবাকে বলিলাম, "বাবা, গুগ্‌গুল ফুরাইয়া গিয়াছে।" বাবা যথাসময়ে আহ্নিক করিতে গেলেন এবং আহ্নিকান্তে ঘরের দরজা খুলিয়াই আমাকে ডাকিলেন, আমি কাছে যাইতেই বলিলেন, "ঐ গুগ্‌গুল নাও।" আমি ঘরের মধ্যে তাকাইয়া দেখি, অতি উৎকৃষ্ট গুগ্‌গুল সমস্ত ঘরময় ছড়ান রহিয়াছে। আমি তখন ঐ সমস্ত গুগ্‌গুল কুড়াইয়া একত্র করিলাম। তাহার পরিমাণ প্রায় সাত আট সের হইবে। ওরূপ গুগ্‌গুল আর জীবনে কখন দেখি নাই।

৪। একদিন দুপুর বেলা রাসেশ্বরী তৈল তৈয়ার করিবার জন্য একটি লোহার কড়াতে করিয়া পাকী অর্দ্ধ মণ তিল তৈল জ্বাল দেওয়া হইতেছিল। তেল যখন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছিল, বাবা তখন সেই ফুটন্ত তৈল হাতে করিয়া কড়াই হইতে তুলিয়া পাক ঠিক হইয়াছে কি না দেখিতে-ছিলেন। আমি ও আর দুই চারিজন লোক সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমার কেমন ইচ্ছা হইল, আমিও ঐভাবে ঐ ফুটন্ত তেল মধ্যে হাত দিয়া দেখি। যেমন ইচ্ছা হইল অমনি বাবাকে বলিলাম, "বাবা, আমি ঐ তেলে হাত দিব?" বাবা বলিলেন, "দিতে পার।" আমি তৎক্ষণাৎ ঐ ফুটন্ত তেলের মধ্যে হাত ডুবাইয়া দিলাম,—ঐ ফুটন্ত তেল আমার নিকট ঈষৎ গরম বলিয়া বোধ হইল।

৫। একদিন দুপুর বেলা বাবা খাটের উপর শুইয়া আছেন, আমি তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছি। কিন্তু দেখিতেছি, নাক দিয়া নিশ্বাস লওয়া বা প্রশ্বাস ফেলার কোন শব্দ পাইতেছি না। তখন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, আপনার নাক দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে না ?" বাবা বলিলেন, "না"। তাহাতে মনের সন্দেহ না যাওয়ায় প্রথমে হাত দিয়া, পরে তূলা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই নাক দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে না। তখন বাবা বলিলেন, "আমার শ্বাস-প্রশ্বাস নাভিদেশ দিয়া পড়ে।" তখনই নাভি-প্রদেশে হাত দিলাম। দেখিলাম বালকের শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় নাভিদেশ দিয়া বায়ু বহির্গত হইতেছে এবং সেইরূপ শব্দও পাওয়া যাইতে লাগিল।

ইহার পর অন্য কথা-প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, তাঁহার চক্ষের মধ্যে একটি লাল বর্ণের দেবী মূর্ত্তি আছেন। ঐ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য বাবাকে ধরিলাম। বাবা তখন চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "আমার চোখের দিকে তাকাইয়া থাক, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে।" ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিবার পর দেখিলাম, একটি দিব্য লাল বর্ণের দেবী-মূর্ত্তি বাবার চক্ষের অপাঙ্গ দেশ হইতে বাহির হইয়া চক্ষের মধ্য পর্য্যন্ত আসিয়া তখনই আবার অপাঙ্গদেশে অন্তর্হিত হইলেন। সে মূর্ত্তিটি এখনও যেন আমার চোখে লাগিয়া রহিয়াছে।

৬। বর্দ্ধমানে থাকিবার সময় বাবার পূজায় কর্পূর

লাগিত। সেজন্য বাবা আমাকে একটি অক্ষয় কর্পূরের কৌটা দিয়াছিলেন, তাহা হইতে আবশ্যক মত কর্পূর বাহির করিয়া লইয়া কৌটা বন্ধ করিয়া রাখিতাম। আবার যখনই যাইয়া খুলিতাম, তখনই দেখিতাম কৌটা কর্পূরপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমি বর্দ্ধমান হইতে যশোহর বদলী হইয়া গেলে ঐ কৌটাটি কি হইয়াছিল, তাহা জানি না। আমারও যাইবার সময় উহা লইয়া যাইতে মনে ছিল না।

৭। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ক্ষেতুবাবুকে (ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়—মহারাণী নারায়ণকুমারীর পোষ্যপুত্র) বাবা বলিলেন যে, আগুনের তেজ শরীরের ভিতর দিয়া অন্যত্র পরিচালিত করিতে পারা যায়। তাহাতে তিনি সে বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিতে চাহিলেন এবং ইহা হইতে পারে না বলিয়াও একটু তর্ক করিলেন। বাবা তখন তাঁহার (ক্ষেতুবাবুর) দক্ষিণ হস্ত উপুড় করিতে বলিলেন এবং সেই হাতের পিঠে একটি দোয়াতের টিনের গোল মুখ রাখিয়া তাহার উপর নিজ বাম হস্ত রাখিলেন এবং দক্ষিণ হস্ত একটি অগ্নিপূর্ণ কলিকার উপর রাখিলেন। এইভাবে বোধ হয় এক সেকেণ্ড রাখিয়া বাবা হাত উঠাইয়া লইলেন। তখন দেখা গেল, ক্ষেতুবাবুর হস্তপৃষ্ঠে ঐ দোয়াতের মুখ-পরিমাণ, আগুনে পুড়িলে যেরূপ ফোস্কা হয়, সেইরূপ একটি ফোস্কা পড়িয়াছে। ক্ষেতুবাবু তখন নির্ব্বাক্।

৮। একদিন রাত্রে বাবা মুড়ি সেবা করিলেন।

বাবার আহারান্তে প্রায় পনেরো ষোলো জন আহার করিতে বসিলেন। সকলেই মুড়ি খাইবেন। আমার স্ত্রী ও শরৎ-দার স্ত্রী সমস্ত গুছাইয়া দিতেছিলেন এবং আমি পরিবেশন করিতেছিলাম। প্রথম বার মুড়ি পরিবেশন করিয়া মুড়ির পাত্র ঘরে রাখিয়া যখন অন্যান্য উপকরণ পরিবেশন করিতেছিলাম, তখন আমার স্ত্রী দেখিল, পাত্রে মুড়ি সামান্যই আছে। যাঁহারা আহার করিতে বসিয়াছেন, তাঁহাদের আরও মুড়ি লাগিবে এবং স্ত্রীলোকও প্রায় ছয় সাত জন আহার করিতে বাকী আছে। আমার স্ত্রী তখন চিন্তিত হইয়া বাবাকে বলিল, "বাবা, মুড়ি ত সামান্যই আছে, কিন্তু এখনও ত যাঁহারা খাইতে বসিয়াছেন তাঁহাদের মুড়ি লাগিবে এবং স্ত্রীলোকও ছয় সাত জন খাইতে বাকী আছে।" বাবা তখন মুড়ির পাত্রটি হাতে লইয়া একবার হাত দিয়া মুড়িগুলি নাড়িয়া, পরে পাত্রটি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "উহা হইতেই দাও।" ঐ মুড়ি হইতে, যাঁহারা খাইতে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে পরিমাণ আবশ্যক দেওয়া হইল এবং যে সব স্ত্রীলোকেরা খাইতে বাকী ছিলেন, তাঁহারাও খাইলেন, অথচ সেই মুড়ির পাত্রে পূর্ব্বে যে পরিমাণ মুড়ি ছিল, সকলের আহারান্তে দেখা গেল, সেই পরিমাণ মুড়িই রহিয়াছে।

৯। একদিন একটি দুষ্ট বালক আমার কনিষ্ঠ পুত্রের কপালে একটি ঢিল মারিয়া গভীর ক্ষত করিয়া দিয়াছিল।

ঐ ক্ষত আরোগ্য না হইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল। বাবা তখন বর্দ্ধমানে ছিলেন না। পরে বাবা যখন বর্দ্ধমানে আসিলেন, তখন বালক একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিল এবং বলিল, "দাদাগুরুদেব, আমার মাথার ঘা সারাইয়া দিতে হইবে।" বালকের বয়স চারি বৎসর হইবে। বাবা তাহাকে অনেক বুঝাইলেন যে, ঔষধ দিয়া তিনি সত্বরই তাহার ক্ষত সারাইয়া দিবেন। সে কিছুতেই তাহা না শুনিয়া বাবার কাপড় ধরিয়া রহিল এবং বলিতে লাগিল, তাহার মাথার ঘা আজই সারাইয়া দিতে হইবে। বাবা যখন দেখিলেন, বালক কিছুতেই ছাড়িবে না, তখন তাহার যেখানে ক্ষত ছিল সেখানে হাত দিয়া বলিলেন, "কই তোমার কপালে ঘা কই?" সে তখন হাত দিয়া স্থান দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "এইখানে ঘা আছে।" বাবা বলিলেন, "কই তোমার কপালে ত ঘা নাই।" সে বাবার কথায় বিশ্বাস না করিয়া পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, "না, আছে।" তখন বাবা আমার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কই গো, তোমার ছেলের কপালে ঘা কই?" আমার স্ত্রী আসিয়া দেখিল, তাহার কপালে ক্ষতের চিহ্ন মাত্র নাই। তখন তাহাকে বলিল, "লালু, (বালকের নাম) ঘা সারিয়া গিয়াছে।" লালু তখন কপালে হাত দিয়া বুঝিল, ক্ষত আর নাই। সে তখন বাবার কাপড় ছাড়িয়া মহা আনন্দে খেলিতে গেল। দুঃখের বিষয়, সে এখন পরলোকে।

১০। বর্দ্ধমানে থাকা কালে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমরের একবার রেমিটেণ্ট জ্বর হয়। ১৪।১৫ দিন হইয়া গেল—জ্বর কিছুতেই কমে না। ঔষধাদি রীতিমত দেওয়া হইতেছিল। বাবা তখন বর্দ্ধমানে ছিলেন না। পরে বাবা যেদিন বর্দ্ধমানে আসিলেন, সেই দিন রাত্রে তিনি যখন আহারান্তে বাহিরের ঘরে গিয়া বসিয়াছেন, তখন অমর অতি কষ্টে উঠিয়া কোনমতে যেখানে বসিয়া তিনি আহার করিয়াছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইল। তখন আমার স্ত্রী প্রসাদ-অন্ন রাখিবার আয়োজন করিতেছিল। সে সেইখানে তাহাকে ধরিয়া বসিল, বাবার প্রসাদ খাইবে। তখন তাহার বয়স ১২।১৩ বৎসর হইবে। আমার স্ত্রী তাহাকে অনেক বুঝাইল যে, এরূপ জ্বরের মধ্যে দুধ, লুচি ও কলা খাইতে নাই। বাবা তখন রাত্রে লুচি খাইতেন। প্রসাদ দুধ, লুচি ও কলা ছিল। সে কিছুতে তাহা না শুনিয়া আমার স্ত্রীকে ধরিয়া বসিয়া থাকিল। সে কি করিবে ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে বাবা বাড়ীর মধ্যে আসিলেন, তখন সে বাবাকে বলিল, "বাবা, আপনার নাতি আপনার প্রসাদ না খাইয়া কিছুতে ছাড়িবে না।" বাবা বলিলেন, "অল্প করিয়া দাও।" অমর বাবার অনুমতি পাইয়া বেশ করিয়া দুধ, লুচি ও কলা দিয়া মাখিয়া পেট ভরিয়া বাবার প্রসাদ খাইয়া শুইয়া থাকিল। সকাল বেলা দেখিলাম, তাহার জ্বর কিছুই নাই—দিব্য সুস্থ শরীর। সেই দিন হইতে অন্ন পথ্য করিতে লাগিল।

১১। যখন রাণীগঞ্জের বাসা হয় নাই, তখন বাবা বর্দ্ধমানে আসিলে নটবর বাবুর বাসায় থাকিতেন। তখন বর্দ্ধমানে তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা খুবই কম। একবার গ্রীষ্মকালে বাবা বিন্ধ্যাচল গিয়াছিলেন, সেখান হইতে ফিরিবার সময় বর্দ্ধমানে নামিলেন এবং ২।৩ দিন বর্দ্ধমানে ছিলেন। এক দিন রাত্রি ৮টার সময় আহারাদি করিয়া, আমি, প্রেমচাঁদ ও দুর্গাদাস তিন জনে বাবার নিকট উপস্থিত হইলাম। বাবা তখন আহারাদি করিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। আমরা চারি জন মাত্র ছিলাম। পশ্চিমের ও অন্যান্য স্থানের অনেক কথা বাবার নিকট শুনিতেছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে একজন কিছু যোগ-বিভূতি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাবা তাহাতে আমাদের চারি জনকে পৃথক্ স্থানে থাকিয়া চারিখানি কাগজে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিতে বলিলেন। আমরা চারি জন উঠিয়া গিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বসিয়া চারিখানি ক্ষুদ্র কাগজে যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহা লিখিলাম। ঐ কাগজ ভাঁজ করিয়া হাতে লইয়া বাবার ঘরে ঢুকিলাম। বাবা তখন ঐ কাগজ হাতে না লইয়া উহা কলিকার আগুনে আমাকে পুড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন। আমি চারিখণ্ড কাগজ লইয়া বেশ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলাম। যখন দেখিলাম, কাগজের চিহ্নমাত্র নাই, তখন কলিকা সমেত রাখিয়া দিলাম। বাবা একখানি কাগজে আমরা

যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই লিখিয়াছিলেন, এবং আমাদিগকে সেই কাগজখানি দিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা লিখিয়াছিলে, দেখ ঠিক তাহা লেখা হইয়াছে কি না।" আমাদের তিন জনের লিখিত বিষয় মিলিল, কেবল প্রেমচাঁদ বলিল, "আমার লিখিত বিষয় প্রায় সবই মিলিয়াছে কেবল একটি 'শ্রী' কম হইয়াছে।" বাবা বলিলেন, "তুমি একটি 'শ্রী' কম লিখিয়াছ।" প্রেমচাঁদ বলিল, "না, আমি তুইটি 'শ্রী' লিখিয়াছি।" বাবা তখন কলিকার উপর যে ছাই ছিল তাহা হাতে মুঠো করিয়া তুলিয়া লইলেন এবং হাতের মুঠো খুলিয়া আমাদের হাতের লেখা সমেত ঠিক সেই চারিখানি কাগজ দিলেন। আমরা দেখিলাম যে, আমরা যে কাগজে লিখিয়াছিলাম, ইহা ঠিক সেই কাগজ। বর্ণ, আকৃতি বা কোন বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। প্রেমচাঁদের কাগজে দেখা গেল তুইটি 'শ্রী'ই আছে। বাবাকে উহা দেখাইলে তিনি একটু হাসিলেন মাত্র। আর কিছু বলিলেন না।

ইহার পর বাবা জানালার একটি গরাদের তুই পাশ দিয়া তুইখানি হাত দিয়া আমাকে বেশ করিয়া তাঁহার হাত বাঁধিতে বলিলেন। সেই বাঁধন না খুলিয়া দিলে আর সেখান হইতে মুক্ত হইয়া অন্যত্র যাইবার উপায় নাই। কিন্তু যেমনই তাঁহার হাত বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া সরিয়া আসিলাম, অমনই দেখি বাবার হাত যেমন বাঁধিয়াছিলাম সেইরূপ বাঁধাই আছে, অথচ তিনি গরাদের পাশ হইতে

মুক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এই ভাবে ২।৩ বার বাঁধিয়াছিলাম। কিন্তু একবারও তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারি নাই। হাত যেমন বাঁধি তেমনই বাঁধা থাকিত, অথচ তিনি গরাদের পাশ হইতে মুক্ত হইয়া দূরে চলিয়া আসিতেন।

১২। একদিন বেলা বারোটা বা সাড়ে বারোটার সময় একজন শিষ্য রাণীগঞ্জের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন সকলের আহার হইয়া গিয়াছে, কেবল আমার স্ত্রীর আহার বাকী। হাঁড়ীতে যে অন্ন ছিল, তাহাতে একজনের হয় না। অথচ তখন রাঁধিয়া দিবার সময়ও নাই, কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় বাবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাত আছে কি না। আমার স্ত্রী বলিলেন, "আছে।" তখন তিনি জায়গা করিয়া দিতে বলিয়া বাহিরে গেলেন। জায়গা করিয়া শিষ্যটিকে আহার করিতে দেওয়া হইল, তিনি পেট ভরিয়া আহার করিলেন এবং পরে আমার স্ত্রীও আহার করিলেন এবং হাড়ীতে সামান্য ভাত থাকিল। আমার স্ত্রী নিজে রাঁধিয়াছিলেন ও পরিবেশন করিয়াছিলেন। সুতরাং কি পরিমাণ কি ছিল তাহা তাঁহার অজানা ছিল না।

১৩। একদিন সন্ধ্যার সময় বাবা আহ্নিক করিতে যাইবার সময় আমাকে বলিলেন, "একখানি পরিষ্কার থালা ঘরে রাখিয়া যাও।" আমি একখানি থালা ঘরে রাখিয়া আসিলাম। বাবা আহ্নিক করিয়া আমাকে ডাকিয়া

বলিলেন, "ঐ থালা লইয়া যাও এবং উহাতে যাহা আছে সকলকে দাও"। আমি যাইয়া দেখি, কে যেন পরম যত্নে সেই থালাখানি ভরিয়া সন্দেশ সাজাইয়া রাখিয়াছে। সেই থালা আনিয়া যথাসময়ে সকলকে ঐ সন্দেশ দিলাম।

১৪। একবার বণ্ডুলে শিবরাত্রির দিন সকালবেলা বাবা পূজা করিতে বসিয়াছেন, সেই সময় আমি দরজার ধারে গিয়া বসিলাম। বাবা বলিলেন, "দেখ, শিবের গা দিয়া কেমন তেল বাহির হইতেছে।" আমি চাহিয়া দেখি, শিবের গা দিয়া যেন তৈলের উৎস বাহির হইতেছে এবং ঐ তৈলে সমস্ত গৌরীপাট ভরিয়া যাইতেছে। বাবা সেই তৈল খানিকটা হাতে করিয়া লইয়া আমার হাতে দিলেন। ঘ্রাণ লইয়া দেখি, অতি মিষ্ট মনোমোহন গন্ধ। পরে দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ অনেকখানি গব্য ঘৃত আসিয়া শিবের গায়ে পড়িল। বাবা সেই তৈল ও ঘি শিবের গাত্রে মাখাইয়া দিলেন। পরে তিনি পূজায় বসিলে আমি উঠিয়া আসিয়া সেই তৈল সকলকে দেখাইলাম।

১৫। রাণীগঞ্জে থাকা কালীন মধ্যে মধ্যে বাবার গা সাবান দিয়া ধুইয়া দিতাম। সেই সময় দেখিতাম, বাবা সাবান-জল নাভিদেশ দিয়া টানিয়া পেটের মধ্যে লইতেন।

১৬। গ্রীষ্মকালে অনেক বরফের টুকরা মাথার মধ্যে রাখিয়া দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে উহা আমাদের বাহির করিয়া দিতেন।

১৭। আহারান্তে ধৌতি করিবার সময় দেখিতাম, যে দ্রব্যটি বাহির করিয়া দিবার ইচ্ছা হইত, শুধু সেইটিই বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতেন। নারিকেল কোরা দিয়া শাক রান্না হইলে, শুধু নারিকেল বাহির করিয়া ফেলিতেন, শাক থাকিয়া যাইত। দুধ কলা খাইলে, শুধু কলা বাহির করিয়া ফেলিতেন, দুধ থাকিয়া যাইত।

শ্রীনেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

গোস্বামীপাড়া লেন, হাবড়া।

ইং ১৯০৮।৯ সালের কার্ত্তিক মাসে ৺শারদীয়া পূজার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে পুরুলিয়া হইতে জনৈক গুরুভ্রাতার সহিত প্রাতঃকালে রওনা হইয়া বেলা ২ টার সময় বর্দ্ধমানে আসিয়া ৺রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী উখরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সহিত ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হইল। গরুর গাড়ী অথবা অন্য কোনও প্রকার যানের অভাবে পদব্রজেই বণ্ডুল যাওয়া স্থিরীকৃত হইল। শ্রীশ্রীগুরুদর্শনে যাইতেছি, এই ভাবিয়া আমি নগ্নপদে গিয়াছিলাম এবং আমিই তিন জনের মধ্যে অল্পবয়স্ক থাকায় (আমার বয়স তখন ২১।২২) সকলের ভার বোঝা আমিই বহিয়া লইয়া যাইতে লাগিলাম। সন্ধ্যা ৭।৩০এর সময় কুড়মুন-পলাশি গ্রামের উপকণ্ঠে আসিলাম। সেখানে জনৈক ব্রাহ্মণ আমাদিগকে উত্তর দিকের রাস্তায় যাইতে দেখিয়া পূর্ব্বদিকের রাস্তা অপেক্ষাকৃত অনেক সরল হইবে বলিয়া উক্ত পথে যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দাদারা ঐ ব্রাহ্মণের কথায় বড়-একটা কাণ দিলেন না। ক্রমে কোথাও হাঁটু অথবা কোমর অবধি জল ও কাদা ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে রাত্রি বারটার পর আমরা ৺বণ্ডুল ধামে

পৌঁছিলাম। ৺রাধিকা দাদা মহাশয় দুই একবার 'বাবা', 'বাবা', বলিয়া ডাকিতেই বাবা স্বয়ং আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর বাবা যেন তিরস্কার ছলে রাধিকা দাদাকে বলিলেন, "সন্ধ্যা ৭।৩০এর সময় কুড়মুন গ্রামের উপকণ্ঠে রাস্তায় দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণের কথা শুনিলে এত কষ্ট হইত না।" আমি চম্‌কিয়া উঠিলাম। মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথম সাক্ষাতেই আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল যেন বাবা কতদিনের পুরাতন—কতকালের চেনা, কত আপনার জন। একেবারেই নিঃসঙ্কোচে "বাবা, বাবা" বলিতে লাগিলাম। আহারাদির পর পান দিবার সময় বাবা আমার ডান হাতের তালু যেন একটু ঘষিয়া দিলেন। আমি একটু কৌতূহলী হইয়া রহিলাম। খালি পায়ে ১২।১৪ মাইল হাঁটিয়া আমার দু'পা দিয়া অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতেছিল। এমন কি, আমার ভয় হইল যে, হয়ত ক্ষত হইয়া অন্ততঃ ছয় মাস ভুগিতে হইবে। রাস্তার যত ক্লেশ সাক্ষাৎ মাত্রেই দূরীভূত হইয়াছিল। শয্যা গ্রহণ করিবামাত্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া একঘুমে রাত্রি শেষ করিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে বাবাকে শ্রীশ্রী৺বগুলেশ্বরের মন্দিরের দাওয়ায় দণ্ডায়মান দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, তোমার পা কেমন আছে?" চকিতে পায়ের দিকে চাহিয়া, আমার দরবিগলিতধারে

অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, আমি কথা কহিতে পারিলাম না। তখনি মনে হইল, নগ্নপদে এত রাস্তা হাঁটিয়া আসার সমস্ত ক্লেশ হরণ করিবার জন্যই বুঝি হাতটা ঘষিয়া দিয়াছিলেন। আহা, দয়াময়, নগ্নপদে আসিয়া কত অপরাধই করিলাম। সন্ধ্যার পর শিবমন্দির হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় বসিবার পর পদ-সেবার অধিকারী হইয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলাম। মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করায়, পদ্মাসন দেখাইয়া দিলেন এবং গায়ত্রী জপ করিতে আদেশ দিলেন। "দীক্ষার এখনও দেরী আছে", এই কথা বলিলেন।

পূজার কয়েকদিন কি স্বর্গীয় আনন্দে যে কাটাইলাম, তাহা বলিতে পারি না। বাহিরের কোনও চিন্তা তিলার্দ্ধের জন্যও মনে স্থান পায় নাই। পরে আসিবার দিন প্রাতে বাবাকে তৈল মাখাইতে মাখাইতে বলিলাম, "বাবা, এই নিকটস্থ বড়বেলুন গ্রামে ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীতে আমার ভাগিনেয়ীর বিবাহ হইয়াছে। তাহাকে একবার দেখিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু বাবা, ভয় হয়, পাছে আমায় জোর করিয়া মদ খাওয়াইয়া দেয়। শুনিয়াছি, তারা মদ খায়।" এই কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন, "ব্যাটা ভারি সাধু, নিজে যেন কখনও মদ খায় নি। খাও নি? বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি।" আমি আঁতিপাঁতি করিয়া খুঁজিয়া কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না। অবশেষে নিজেই বলিতে

আরম্ভ করিলেন, সামান্ত বলাতেই আমার সমস্ত স্মরণ-পথে উদিত হইল, আমি কিন্তু আর বাধা দিলাম না।

বলিলেন, "তুমি যখন পুরুলিয়ায় ৪র্থ ক্লাশে পড়, তোমার বড় দাদা আসানসোলে Labourer Supplyএর কাজ করেন। গ্রীষ্মাবকাশে তথায় আসিয়া তুমি দেখ যে, তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষে প্রায়ই কলহ হয়। ইহার হেতু মদ্যপান। তোমার দাদা একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মদ খাইয়া চলিয়া যাইবার পর, কেমন লাগে পরীক্ষা করিবার জন্য সমস্ত দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া, তুমি খাওনি কি? বৎস, সুরা এবং নারী শিব-ভোগ্য বস্তু, কখনও ইহাদের নিন্দা করিবে না।"

আমি শুনিয়া বিমুগ্ধ ও চিত্রার্পিতের ন্যায় অনিমেষ নয়নে বাবার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। পরে বলিলেন, "বৎস, ইহা ত সামান্ত কথা, দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তোমাদের প্রত্যেকেরই তিন জন্মের ব্যাপার আমায় দেখিতে হয়।"

শ্রীশ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইয়া আমার মনে হইল, এই দুস্তর সংসার-সাগরের একটি ভেলা পাইলাম; অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। পরে ১৯১০ সালের শারদীয়া পূজার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীশ্রী৺বণ্ডুলেশ্বরের মন্দিরে আমার দীক্ষা হইল।

৺শিবরাত্রি পর্ব্বোপলক্ষে বণ্ডুলাশ্রমে তৎকালে বহু লোকের সমাগম হইত। আমরা ৫।৬ জন শিষ্য শুদ্ধ

জলখাবার দিবার জন্য নিযুক্ত থাকিতাম। ৺শিবরাত্রির দু-একদিন পূর্ব্ব হইতে দু-এক দিন পর পর্য্যন্ত আমরা ২০।২৫ জন শিষ্য এত অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিতাম যে, মানুষের স্বাভাবিক শক্তিতে সে পরিমাণ পরিশ্রম করিয়া অসুস্থ না হওয়া অসম্ভব। আমরা পরস্পর বলিতাম, "ভাই, পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের কি কৃপা, কই আমাদের শরীরে একটু ব্যথাও ত হয় না।"

পরে ৺শিবরাত্রির ভিড় কমিয়া গিয়াছে, সর্ব্বসমেত হয়ত ১০।১৫ জন শিষ্য আশ্রমে আছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পূজনীয় শ্রীযুক্ত ভিক্ষুরাম ঘোষাল দাদা মহাশয় কোনও কার্য্যব্যপদেশে ৺বণ্ডুলেশ্বরের মন্দিরের পশ্চিম দিক্‌পানে যাইতে যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পা-পা করিয়া পশ্চাতে হাঁটিয়া আসিয়া দ্বিতল বাটীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে বাবা সে ঘরে আসিলে পর ভিখু দাদা বলিলেন, "বাবা, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আপনি মন্দিরের দালানের মেজেতে শয়ন করিয়া কূর্ম্মের ন্যায় হস্ত পদ ও মস্তক ধড়ের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছিলেন, আমি না জানিয়া গিয়া পড়ায়, হয়ত আপনার বিঘ্ন হইয়া থাকিবে, আমি বড় ভয় পাইয়াছি।" বাবা হাসিতে হাসিতে সুমধুর-স্বরে বলিলেন, "ভয় কি গো, না দেখিলে তোমরা শিখিবে কি প্রকারে? ওগো, ছেলেরা এই কটা দিন যা পরিশ্রম

করিয়াছে, যদি আমি তাদের সমস্ত পরিশ্রম আকর্ষণ পূর্ব্বক এই ক্রিয়া দ্বারা নষ্ট না করি, তাহা হইলে বাছারা যে পীড়িত হইয়া পড়িবে।”

শ্রীযুক্ত দুর্গা দাদার উপনয়ন উপলক্ষে বহু গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণ হয়। আশ্রমের সমস্ত স্থানেই ঠাঁই হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণও বসিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তথাপি অনেক ব্রাহ্মণ স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া আছেন এবং রৌদ্র এত বেশী প্রখর যে, ক্ষণমাত্র উঠানে বা অনাবৃত স্থানে দাঁড়ান যায় না। উঠান ব্যতীত আর অন্য কোথাও স্থান না পাইয়া আমরাও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছি, এমন সময়ে বাবা আদেশ করিলেন, “উঠানে আসন পাতিয়া বসিবার জায়গা করিয়া দাও। তোমরা দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ ?” আমরা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঠাঁই করিয়া দেওয়া মাত্র সমস্ত উঠানের আকাশ জুড়িয়া চাঁদোয়ার (চন্দ্রাতপের) ন্যায় একটি কালো মেঘ আসিয়া দাঁড়াইল এবং যতক্ষণ ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিসমাপ্তি না হইল ততক্ষণ ভৃত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল ; অথচ এই সীমানার অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থান মাঘ-ফাল্গুনের সূর্য্যালোকে যেন পুড়িয়া যাইতেছিল।

অদ্য হইতে ১৬।১৭ বৎসর পূর্ব্বে যে অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়াছিল, সেই যোগে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য আমরা নানা স্থান হইতে প্রায় ৫০।৬০ জন শিষ্য বর্দ্ধমানে রাণীগঞ্জ

বাজারের আশ্রমে সমবেত হই। পরে ত্রিবেণীতে প্রাতঃকালে উপস্থিত হই। সমস্ত শিষ্যের সহিত গঙ্গায় অবতরণ করিবার সময় পরিধানের ধুতি ও গামছাখানি ব্যতীত বাবা আর কিছুই লন নাই। কিন্তু পূজা করিবার সময় কত রকমের ফল ও কত পুষ্প ও উপকরণ দিয়া যে পূজা করিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সে সময় আমি বাবার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। যাত্রীর সমাগম অত্যন্ত বেশী হওয়ায় আমরা ভাবিতেছিলাম, কি প্রকারে ট্রেণে স্থান পাইব। কিন্তু গাড়ী আসিবামাত্র বাবা প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া বসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যাইতে বলিলেন। আমরা নির্ব্বিঘ্নে বর্দ্ধমানে পৌঁছিলাম।

একবার (১৯১১) ৺শিবরাত্রি পর্ব্বোপলক্ষে ৺বণ্ডুলাশ্রমে যথারীতি গমন করি। ব্রত উপবাস, ব্রাহ্মণভোজনাদি সমস্ত কার্য্য শেষ হইবার পর, বাবাকে একাকী পাইয়া, হঠাৎ মনের চাঞ্চল্য অবস্থা কেন আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, বাবা বলিলেন, "অদ্য হইতে তিন বৎসরের মধ্যে ম্লেচ্ছদের দেশে অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইবে; তোমায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ দিবস তথায় অনেক বিপৎসঙ্কুল স্থানে থাকিতে হইবে। কিন্তু কোনও চিন্তা নাই, তোমার পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইবে না। সেজন্য এবং আরও দু-একটা ঘটনা ঘটিবে বলিয়া মনের চাঞ্চল্য আসিয়াছে। ভাল করিয়া কাজ করিয়া যাও, সব ভাল হইবে।"

দীক্ষিত হইবার তিন বৎসরের মধ্যে মানসিক অবস্থা এরূপ হইল যে, নিজ গুরু-ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কাহারও সঙ্গ ভাল লাগিত না। তখন ভগবৎ-প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কথায় কান দিতাম না। ক্রমে এরূপ ব্যাপার দাঁড়াইল যে, আমাকে পুরুলিয়ার চাকরী ত্যাগ করিতে হইল। চাকরী ছাড়িয়া প্রায় ২।৩ মাস যথেচ্ছাক্রমে যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, বাড়ীর কোনও সংবাদ রাখিতাম না। তৃতীয় মাসের শেষাংশে, একদিন বালীগ্রামের বারেন্দ্র-পাড়ায় গঙ্গার ঘাটে বেলা দুইটার সময় নিজমনে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন যুবা সন্ন্যাসী আসিয়া আমায় বড়ই মধুরস্বরে বলিলেন, "বাবুজী, আপ্ ইস্ হাল্‌মে রহনেসে ঠিক নেহি হোগা। ফির বাবু, ঘর বাপিস্ যাও। পছিম্ মে যানেহীসে আপকা সরকারি নোকরি হোগা।" অথচ প্রাতে শ্রীযুক্ত শ্বশুর মহাশয় আসিয়া মিরাটে লইয়া যাইবার জন্য কত খোসামোদ করিয়াছিলেন, আমি তাহাতে রাজি হই নাই।

কথাগুলি প্রাণে আঘাত করিল। খানিক পরে উঠিয়াই সন্ন্যাসীটির চতুর্দ্দিকে অনেক সন্ধান করিলাম, কিন্তু আর দেখা পাইলাম না। মনে হইল, বাবা যেন রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া আমায় একথা বলিয়া গেলেন। সেই রাত্রেই রাঁচি এক্‌স্প্রেসে চড়িয়া পুরুলিয়া যাত্রা করিলাম এবং পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় মিরাট যাত্রা করিলাম। এক

সপ্তাহের মধ্যেই আমার Assistant Director of Supplies and Transport অফিসে চাকরী হইল। পরে জানিলাম, পুত্রের কষ্ট হইতেছে দেখিয়া, বাবা এই কার্য্য করিয়াছিলেন।

চাকরী গ্রহণ করিবার দেড় বৎসর পরেই জর্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধিল। ৪ঠা আগষ্ট ১৯১৪ সালে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ১৪ই তারিখে আমরা প্রস্তুত (mobilized) হইলাম। ২০শে মিরাট হইতে রওনা হইয়া, লাহোর হইয়া ২৪।২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত করাচি পৌঁছিলাম। পরে ২রা সেপ্টেম্বর তারিখ City of Lahore জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনে চড়িয়া ভারতভূমি ত্যাগ করিলাম। কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, একথা তখন অজ্ঞাত রহিল। জাহাজ তীর হইতে ৩।৪ মাইল দূরে গিয়া নঙ্গর করিয়া রহিল। বোম্বাইতে অবস্থিত ৩২ খানি জাহাজের G. O. C.-র (১৬ খানি করাচি হইতে এবং ১৬ খানি বম্বে হইতে এক সময়ে ছাড়িয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমুদ্রে মিলিত হইবে) বেতার হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রিতে জাহাজ কখন ছাড়িয়াছে টের পাই নাই। পরদিন প্রাতে ১০॥ নাগাইদ জাহাজের সকলেই অত্যন্ত উত্তেজিত ও ভীত হইয়াছে দেখিলাম। বোম্বাই হইতে যে বহর ছাড়িয়াছে তাহারই ২।১টা মাস্তুল দেখিয়া শত্রুপক্ষ সবমেরিণ জ্ঞানে এত ভীত হইয়াছিল। পরে ছাদ হইতে Flag

করিয়া ও দুটি Dreadnaught অগ্রগামী হইয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া আসিল। ৩২ খানি জাহাজ গতির বেগ অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া চলিতে লাগিল।

প্রথম যখন জাহাজে উঠি, খাকী হাফপ্যাণ্ট, কোট ও হ্যাট পরিয়াছিলাম। ক্রমে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই স্নান ইত্যাদি করিয়া সন্ধ্যায় বসিলাম। সঙ্গে গঙ্গাজল ছিল এবং জপিবার রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ হইবার পর, আমার সহযাত্রী দুইজন পাঞ্জাবী গোমস্তা, যাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমাকে কেবিন হইতে বাহির করিতে পারেন নাই, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আঃ জী, বাবুজী, আপ্ হিন্দু হ্যাঁয়, ভগৎ হ্যাঁয়, ব্রাহ্মণ হ্যাঁয়, হামলোগোঁকো মাপ করনা, হামতো আপকো ঈশাই সম্‌ঝা থা।" ছাড়িবার তৃতীয় দিন হইতে রসদ বিভাগের ভার আমার উপর পড়িল। ২০০০।২৫০০ লোকের ভরণপোষণ আমার উপর। সুতরাং জাহাজের মধ্যে বানার্জি বাবু বা মিষ্টার বানার্জি একটা কেউ-কেটা নয়; আবার কোট প্যাণ্টের ভিতরেও একটু "হিন্দুয়ানি" দেখিয়া অনেকে বেশ একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। সেপ্টেম্বর মাসে আরব্য সমুদ্র অত্যন্ত বাত্যাহত হইয়া থাকে এবং জাহাজ অত্যন্ত দোদুল্যমান হওয়ায় আরোহিগণ প্রায় সকলেই বমি করিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। বাবার কৃপায় আমার একটি দিনও মাথা ধরে নাই বা বমি হয় নাই। হিন্দু সিপাহীদের

রান্না হইয়া গেলে পর চৌকা দিয়া আমার দেহরাদূন হইতে আনীত পাহাড়ী ক্ষত্রিয় চাকরটি বেলা তিনটার সময় খিঁচুড়ি রাঁধিত এবং রাত্রি এবং পরদিন প্রাতঃকালের জন্য পরোটা তৈয়ার করিয়া রাখিয়া দিত। জাহাজে বেশ আনন্দের সহিত কাটিয়া গিয়াছিল। সুয়েজ ক্যানেলে আমাদের জাহাজ একরাত্রি ক্যানেলের ধারে লাগিয়া stranded হইয়া যাওয়া ব্যতীত এমন বিশেষ কিছু উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

১৪ই অক্টোবর মারসেল বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলাম। ১৫ই তারিখ ট্রেণের বন্দোবস্তে গেল। ১৬ই বেলা ১০টার সময় ট্রেণে চড়িয়া ক্রমান্বয়ে আট দিন ধরিয়া যাই। কেবলমাত্র প্রাতে দুই ঘণ্টা এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুই ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী দাঁড়াইত—স্নান, রান্না, খাওয়া ইত্যাদির জন্য। মালগাড়ীতে বেঞ্চ পাতিয়া কোনও প্রকারে যাইবার উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছিল। গাড়ীতে আর কুলাইতে পারে নাই। কষ্টের সীমা ছিল না। যে ষ্টেশনেই গাড়ী থামিত, সেইখানেই ফরাসী ভদ্র পুরুষ ও মহিলারা, দুধ, ফল, রুটি, মদ ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য সৈন্যদের উপহার দিতেন। ২৫শে আগষ্ট Orleans সহরে আসিয়া পঁহুছি। সহরের প্রান্তে ময়দানের উপর তাঁবু গাড়িয়া রহিলাম। ক্রমে এক একটি করিয়া unit form করিয়া সমবেত লোকদের বিভিন্ন স্থানে (firing line-এ) পাঠাইতে

লাগিল। রেলওয়ে ষ্টেশনে আমাদের ৫।৭ জনের কাজ পড়িল।

এই স্থানে একদিন অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া তাঁবুতে সন্ধ্যা আট টার সময় ফিরিয়া আসি। মনে করিলাম, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তার পর সন্ধ্যাহ্নিক করিব। কিন্তু শুইবামাত্র এত গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম যে, রাত্রি বারটার পর শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার শিরোদেশে সেই মনোহর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া অতি সুমধুর স্বরে আমায় ডাকিয়া জাগ্রত করিলেন—"শিবরাম, কই আজ আহ্নিক করিলে না।" আমি মূর্ত্তি দেখিয়া ও শব্দ শুনিবামাত্র "জয় গুরু নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া এত জোরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম যে, পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা জাগিয়া উঠিয়া, আমার কোনও বিপৎপাত হইয়াছে ভাবিয়া আমায় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, শুধু এই কথা বলিয়া সকলকে সান্ত্বনা করিলাম বটে, কিন্তু নিজে বাকী সমস্ত রাত্রি প্রায় বসিয়া রহিলাম। অনেক কাঁদিলাম, অনেক নালিশ করিয়া বাবাকে পত্র লিখিলাম।

কিছুদিন পরে বেলজিয়াম্ ও ফ্রান্সের সীমানাস্থ এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে First Indian Cavalry Division ডিভিসনাল ট্রুপস্‌এ আসিয়া যোগদান করিল। সেই হইতে প্রায় প্রত্যেক তৃতীয় দিবসে ৪০।৪৫ মাইল মার্চ্চ করিতে হইত। শীতকালে তিনটার

এবং গ্রীষ্মকালে নয়টার সময় সন্ধ্যা হইত। এরোপ্লেনে দেখিতে পাইবে বলিয়া শীতকালে তিনটায় মার্চ্চ আরম্ভ হইয়া রাত্রি তিনটায় শেষ হইত, অবশিষ্ট রাত্রিটুকু মাঠে ঘাটে যেখানে সেখানে কাটাইয়া, প্রাতঃকালে আবার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত। সেদেশে বৎসরের মধ্যে প্রায় ১০ মাস বাদল, বৃষ্টি, কুয়াশা ও বরফে কাটিয়া যায়। সূর্য্যদেব ছয় সাত সপ্তাহমাত্র দর্শন দেন।

এ সব প্রাকৃতিক বৈষম্য ত আছেই। তা ছাড়া ট্রেঞ্চ হইতে শেল এবং এরোপ্লেন হইতে বোমা প্রত্যহই পড়িত। পাশাপাশি, পথে, মাঠে এত লোক বোমা বা শেল হইতে মারা যাইত যে, এ সমস্ত দেখিয়া "রাখে হরি মারে কে" এই কথাটি মাত্র স্মরণ করিয়া দিনপাত করিতাম। কিন্তু আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে ১৯১১ সালে তিন বৎসর পূর্ব্বে যে শুনিয়াছিলাম আমার পায়ে কুশাগ্র বিদ্ধ হইবে না, বাস্তবিক তাহাই হইল। আমি একটি দিনের জন্য অসুস্থ পর্য্যন্ত হই নাই।

Kut-El-Amaraতে জেনেরল টাউনসেণ্ড ১৯১৬ সালের নবেম্বর মাসে তুরস্ক ও জর্ম্মাণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলে বেলজিয়াম ও ফ্লাণ্ডার্স হইতে আমরা পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইব, এই অজুহাতে মার্সেলে নামিয়া আসিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া শুনিলাম, তাহা নহে; হয় ডার্ডানালেস, নয় বসরা যাইতে হইবে। ভূমধ্যসাগরে তখন

জর্ম্মাণরা প্রায়ই সৈন্যের জাহাজ সবমেরিণ দ্বারা ডুবাইতে লাগিল। সুতরাং জাহাজে চড়িয়া এলেক্‌জান্দ্রিয়া যাইতে হইবে শুনিয়া সকলেরই অত্যন্ত ভয় হইল, মুখ শুখাইয়া গেল। কিন্তু মিলিটারী হুকুম, অগ্রাহ্য করিবার যো নাই। সুতরাং অম্লানবদনে "জয় গুরু" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ২৩শে ডিসেম্বর City of Baralaতে চড়িয়া রওনা হইলাম। কোথায় যাইব, কেহ জানে না। মার্সেল হইতে এলেক্‌জান্দ্রিয়া সাত দিনের রাস্তা, কিন্তু আঠার দিনের রেশন লইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ছাড়িয়া ঘণ্টা খানেক যাইতে না যাইতেই একটি ছোট মোটর বোট তরতর করিয়া আসিয়া কাপ্তেনকে জাহাজ থামাইতে সঙ্কেত করিল। জাহাজ থামিলে ফরাসী অফিসারটি megaphone দ্বারা বলিল, "পথ অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল। এই কিছু পূর্ব্বে ২টি ফরাসী বা ১টি ইটালীয় জাহাজ জর্ম্মাণ সবমেরিণ ডুবাইয়াছে। আপনারা অদ্য রাত্রি শেষ অবধি আমাদের নেভাল বেস ফুলনে নঙ্গর করিয়া থাকুন।" তাহাই হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয় করিতাম না। তিনি কত ভাবে কত প্রকারে অভয় দান করিয়াছেন যে, ভয় আর হৃদয়ে স্থান পায় না, সুতরাং বেশ ঘুমাইলাম।

পরদিন বেলা ১২টার পর—জাহাজ অবশ্য ভোর বেলাই ছাড়িয়াছে—বিপদ উপস্থিত হইলে কি ভাবে কাজ করিতে

হইবে, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। জাহাজ চার বার বাঁশী বাজাইবে। আমাদের দ্বিতলের ডেকএর দক্ষিণ দিকের বারেণ্ডার কোণে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইতে হইবে। লাইফ বেল্ট বা লাইফ বয়টি সমস্ত দিন পরিয়া থাকিতে হইবে ও রাত্রিতে মাথার নীচে রাখিতে হইবে। Roll call হইবে। একজন ব্রিটীশ সৈনিক রাইফেল হাতে সুমুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং একজন কাপ্তেন-পদবীপ্রাপ্ত ব্রিটীশ অফিসর থাকিবেন। জাহাজ ডুবিতে আরম্ভ করিলে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সম্মুখস্থ লঞ্চ বোটে অফিসরের হুকুম ব্যতীত উঠিতে যাইলেই ব্রিটীশ সৈনিক তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলি করিয়া মারিবে। কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া বেশ পার হইয়া আসিলাম। সিসিলি এবং ইটালীর মাঝখান দিয়া আসিবার পরই বিপদ আরম্ভ হইল। সমস্ত দিন অন্ততঃ পক্ষে ২।৩টি wireless আসিত যে সবমেরিণের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য তোমরা নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে তিন মাইল উত্তরে চলিয়া যাও—ইত্যাদি। এইভাবে উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিমে বাহিয়া মালটা দ্বীপে আসিলাম। মালটা বন্দরের ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য আমাদের ও বন্দর হইতে বাহির হইবার জন্য অপর একটা জাহাজকে একই সঙ্গে সিগনাল দেওয়ায় গেট পার হইয়া কিঞ্চিৎ যাইতে না যাইতে দুই জাহাজে ভয়ানক সংঘর্ষ

হইল। আমি তখন জাহাজের ডেকএর উপর। মনে করিলাম, যদি ডুবে, জাহাজ হইতে লাফ দিয়া সমুদ্রে পড়িব। অপর জাহাজের কাপ্তেন বোটটা একটু বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তত্রাপি শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় জল হইতে এক বিঘৎ উপরে একটি চার ফুট লম্বা ও তিন ফুট চওড়া গহ্বর হইয়া গেল এবং বামদিকের সমস্ত লঞ্চ বোটগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। আমরা মালটায় ৮।১০ দিন রহিলাম। জাহাজ মেরামত হইতে লাগিল। জাহাজ হইতে নামিয়া সহরে যাইতে নিষেধ হইল। ৭।৮ জানুয়ারি আমরা পুনরায় মালটা ছাড়িয়াএলেক্‌জান্দ্রিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ডার্ডানালেস Expeditionary Forceএর 'বেস' (base) ছিল মালটা, সুতরাং মালটা হইতে এলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত স্থানটি অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল। মালটা ছাড়িবার পর দিন বেলা দুইটার সময় আমাদের সামনের পথের দুই মাইল মধ্যে P. & O. জাহাজ জর্ম্মাণ সবমেরিণ টরপেডো দ্বারা ডুবাইল। অনন্তর ৫।৭ দিন বহু কষ্টের পর এলেক্‌জান্দ্রিয়াতে আসিয়া পঁহুছিলাম। তখনি জেনেরল অফিসর কমাণ্ডিংএর একজন সহকারী মোটর বোটএ আসিয়া হুকুম দিলেন, "You are meant for another theatre of war, and not for India." সুতরাং ভারতবর্ষ ফিরিয়া যাইবার ক্ষীণ আশা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল। আবার

জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তথা হইতে সুয়েজ কেনাল, লোহিত সাগর, ভারত সাগর, পারস্য উপসাগর পার হইয়া ৩১শে জানুয়ারী ১৯১৭ টাইগ্রীস নদী ও পারস্য উপসাগর-সঙ্গমে আসিলাম। নদীর লাল জল এবং সমুদ্রের কাল জলের মিশ্রণ দেখিয়া কবি কালিদাসের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের বর্ণনা মনে উদয় হইল। ২রা ফেব্রুয়ারী বসরাতে নামিলাম।

ইহার পর হইতে দুঃখ বিশেষভাবে আরম্ভ হইল। ২।৪ দিনের পর ফ্রণ্টে যাইবার জন্য হুকুম হইল। একটি ফেরী ষ্টীমারের দুই পাশে দুইখানি বার্জ বাঁধিয়া ঘণ্টায় ২।৪ মাইল হিসাবে টাইগ্রীস নদী বাহিয়া বোগদাদ অভিমুখে যাইতে লাগিলাম। ফ্রান্স এবং মেসোপটামিয়াতে স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের ন্যায় পার্থক্য। সন্ধ্যা হইলেই অনিয়ত আরব ট্রুপস নদীর দু-পাশ হইতেই ফেরী ষ্টীমার ও বার্জের উপর বন্দুক ছুড়িত, সুতরাং মৃত্যু যে-কোনও মুহূর্ত্তে হইতে পারে এবং নদীর এক-টানা সমুদ্রমুখী গতি অত্যন্ত খরতরা; হঠাৎ গাদা বোট বা ফ্লাট (তাতে রেলীং নাই) হইতে পড়িয়া গেলে আর কোনও প্রকারে তীরে উঠিবার আশা নাই। এরূপ ভাবে কত লোক ডুবিয়া মারা গিয়াছে। ১০।১২ দিন এ ভাবে যাইয়া আবু রোমান বলিয়া কুট হইতে ৫।৭ মাইল নীচে বা দক্ষিণে এক স্থানে ষ্টীমার হইতে নামিলাম। সেখানে তখন কিছু কিছু শীত ছিল।

নদীর ধারে তাঁবু পুতিয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছি, হঠাৎ বাতাসে সমস্ত উঠাইয়া লইয়া গেল এবং সমস্তই ভিজিয়া গেল। পরে যখন গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল, উত্তাপ উঠিল ১২২° ডিগ্রি। প্রত্যহ ৫০।৬০ জন করিয়া রেজিমেণ্ট পিছু লোক মরিতে লাগিল। G. O. C. হুকুম দিলেন, বেলা ১২টা হইতে ৩টা অবধি সাধ্যমত কোনও কার্য্য হইবে না। এপ্রিল মাসের প্রারম্ভেই তুর্কীগণ গ্রীষ্মাগমনের ভয়ে ১৫ মাইল পিছাইয়া গেল। ২।১ দিন মধ্যে এরোপ্লেনে যাইয়া তাহা জানিতে পারিয়া আমাদের ট্রুপসও অগ্রগামী হইল। কিন্তু যাইবার পর দিনই শুনিলাম, জলাভাবে শতকরা ১০ জন লোক মারা পড়িয়াছে। আমাদের অফিসের লোকেরা মন্ত্রণা করিল, রাত্রিকালে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাইবে। আমি বলিলাম, আগামী প্রাতেই চারিটা সাড়ে চারিটার সময় জেনেরল সাহেবের সহিত পদব্রজে যাইব। আমার সহিত হেডক্লার্ক পণ্ডিত-জী একমত হইলেন। কিন্তু ঠিক পথ কোন্‌টি, জানিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল ভাবে একাকী বাবাকে ডাকিতে লাগিলাম। দিব্য শুনিতে পাইলাম— 'তিলার্দ্ধ থাকিবে না, সিপাহীদের সহিত যাওয়াই ঠিক।'

এই পথে যে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছি, সেরূপ দৃশ্য ফ্রান্সেও দেখি নাই। বলা বাহুল্য, আমি পরদিন পদব্রজে ১৫ মাইল হাঁটিয়া বেলা ২টার সময় যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। আসিয়া দেখিলাম, পথে সমস্ত জলাশয় শত্রু-কর্ত্তৃক বিষাক্ত করা

হইয়াছে। আমাদের অফিসের প্রায় ১৫ জন লোক আমাদের কিট (তৈজসপত্র) ও অফিসরের অনেক জিনিষ লইয়া রাত্রিতে যাত্রা করিয়া ৩০০ গাড়ি 'রেশন কনভয়' (৫০০ সংখ্যক ব্রিটীশ ও ভারতীয় অশ্বারোহী ও পদাতি কর্ত্তৃক অনুগত) ধরিবার জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিয়াও তাহাদের ধরিতে না পারিয়া, (কারণ রাতারাতি শত্রুর গতিবিধি দেখিয়া টেলিগ্রাফ দ্বারা রাস্তা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল) রাত্রি ৪ টার সময় ৭০ তুর্কী কেবলরি বা ৩০ ইরেগুলর আরব দ্বারা অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া বন্দী হইল। জেনেরলের ৩০ জন দেহরক্ষক তাহাদের কিছুই করিতে পারিল না। ভাবিয়া দেখুন, এই আমার সঙ্গীদের পরামর্শ ও ভয় প্রদর্শন অনুসারে কার্য্য করিলে আমার অবস্থা কি হইত।

সেপ্টেম্বর মাস অবধি নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকিয়া একটি সারকুলর অনুসারে ছুটির জন্য আবেদন করিয়া যখন বিফল-মনোরথ হইলাম, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় বাবাকে ডাকিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলাম, 'বাবা, আজ গত তিন বৎসর ৺শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা দেখি নাই। আমি এবার যেন ঠিক ষষ্ঠীর দিন বাড়ীতে উপস্থিত হইতে পারি।' এই বলিয়া কেবলমাত্র একটিন দুগ্ধের উপর (sterilized milk) নির্ভর করিয়া ২২ দিন উপবাস করি। বাবা একটু ধৌতি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাই

সাহেবকে বুঝাইলাম, আমি যাহা খাইতেছি কিছুই পেটে থাকে না, বমি করিয়া ফেলি। ২২ দিনের দিন জ্বর হইতে ভয়ানক ভয় হইল। এত দুর্ব্বল হইয়াছি—উঠিবার শক্তি নাই। সাহেবকে ডাকিয়া বলিতেই সাহেব বড় ডাক্তার-সাহেবকে দেখাইতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, এপেণ্ডিসাইটিস হইয়াছে। সেই দণ্ড হইতে খুব যত্ন হইতে লাগিল। তার পরদিন মোটর বোটএ করিয়া প্রায় ১২ মাইল নীচে এক হাসপাতালে আরব গ্রামে যাইলাম। শ্রীশ্রীগুরুজীর কৃপায় এখানকার বড় সাহেব ২।৪ দিন রাখিয়া একেবারে বসরায় পাঠাইয়া দিলেন। একটু একটু খাইতে আরম্ভ করায় চেহারার পরিবর্ত্তন হইতেই ভয় হইল, পাছে পুনরায় উপরে পাঠাইয়া দেয়। অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া একদিন বাবার কৃপায় বোম্বাই যাইবার জন্য হুকুম হইয়া গেল। বলিতে কি, বাস্তবিক পক্ষে আমার কোনও ব্যাধি ছিল না। ক্রমে একদিন শুভক্ষণে Hospital জাহাজে চড়িয়া সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি বোম্বাই আসিয়া পঁহুছিলাম।

জাহাজ হইতে নামিয়া (লর্ড) হার্ডিঞ্জ হাসপাতালে আসিয়া উঠিলাম। দুই চারি দিন পর সাহেব বড় ডাক্তার বলিলেন যে, আমার এপেণ্ডিসাইটিসে অস্ত্র করিবেন। যে সমস্ত রোগীর অস্ত্র হইয়াছে তাহাদের ফোটো দেখাইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন যে

আমায় লিখিয়া দিতে হইবে যে মৃত্যু হইলে কেহ দায়ী নন। উত্তরে আমি সাহেবকে বলিলাম—"Sir, in consideration of my active service for more than two years all along the firing line, please release me from this Hospital and let me be operated on by medical men in the Medical College, Calcutta, amongst my own men, whom I did not see for years. If, in the very act of operation, I may meet death, I shall die a peaceful death." সাহেবের কিরূপ দয়া হইল। তার পর দিনই আমাকে রেলওয়ে ওয়ারেণ্ট দিয়া হাসপাতাল হইতে বিদায় দিলেন। আমি মেলে চড়িয়া মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্টে তিন দিন পর রাত্রি ১২টার সময় আসিয়া পঁহুছিলাম। পরে সেখান হইতে ঠিক ষষ্ঠীর দিন প্রাতে ৬টার সময় পুরুলিয়ায় নিজবাটীতে পৌঁছি ও যথাসময়ে শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বর্দ্ধমানে সমস্ত নিবেদন করি।

অত্যন্ত সংক্ষেপে কেবল মাত্র দু-একটা ঘটনা দেওয়া হইল। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, শ্রীশ্রীগুরুজীর কৃপা অবলম্বনে এ অবস্থায় আমাদের মত ভীরু বাঙ্গালী এরূপ ভীষণ যুদ্ধস্থলে কি প্রকারে একদিনের জন্যও ভীত হয় নাই এবং প্রত্যহ সাধ্যমত জপ করিয়া আসিয়াছে।

শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ

পেন্‌সন্‌ প্রাপ্ত সবজজ।

আমি লেখক নহি, লিখিতে জানি না। আমি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের একজন দাসানুদাস শিষ্য মাত্র। কিছুকাল যাবৎ মনে হইতেছিল যে, পরমারাধ্য সাক্ষাৎ ভগবান আমার উদ্ধারের উপায় করিতেছেন। কিন্তু কই আমি ত তাঁর কিছু করিতেছি না।

১৯১১সালে আমি বর্দ্ধমানের চতুর্থ আদালতের মুন্‌সেফ ছিলাম। তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর কথায় আমি একটানে সাড়ে পাঁচ বৎসর ছিলাম। সেই সময় গুষ্করায় বাবাজীর আশ্রম ছিল, বর্দ্ধমানে হরি দে ময়রার জামাতার একটি বাড়ী লওয়া হইয়াছিল। তথায় আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাবাজী থাকিতেন। আমার উপর কোন মহাপুরুষের আদেশ ছিল, এই সময়ে আমি আমার চিরকালের গুরু পাইব এবং তিনি এক মহাপুরুষরূপে প্রকট হইবেন। তিনিই ইনি, ইহা জানিয়া ও বাবাজীর নাম ও গুণ শুনিয়া ইঁহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। প্রথম দিনে যখন গিয়া প্রণাম করিলাম, আমার সহিত ব্যবহার করিলেন যেন কত কালের আলাপী ; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে আমার মন-প্রাণ যা-কিছু

সব ঐ শ্রীচরণ দুখানিতে অর্পণ করিলাম। সেই অবধি আমি বাবাজীর শ্রীচরণের তলায় মিশিয়া গিয়াছি। সে সময় আমি বাবাকে যে কি দেখিলাম, তাহা আমি লেখনীতে বর্ণনা করিতে পারি না। অপূর্ব্ব ভাব। আমি জানিলাম, ইনিই আমার তিনি, ইনি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব—আমার চিরকালের ধন। বাবা প্রাতঃক্রিয়া সারিয়া আসিয়া বসিয়াছেন, সেই সময় আমি কৃষ্ণবাবু ও বিনোদবাবুর সহিত গেলাম। যাইয়া এক অপূর্ব্ব সুগন্ধ পাইতে লাগিলাম। আমি চারিদিক্ অনুসন্ধান করিলাম। ক্রমে জানিলাম, বাবাজীর অঙ্গ হইতে এই সুগন্ধ বাহির হয়। আমি বর্দ্ধমানে থাকিতে থাকিতে ৩০০৲ হইতে ৪০০৲ শত, পরে ৫০০৲ শত টাকা বেতন পাইয়া পরে সবজজ হইয়া কিছুদিন কাজ করিয়া ঢাকায় যাই। বাবাজী শিষ্যদিগকে যোগে উৎসাহ দিবার জন্য দাদাগুরু মহারাজের উপদেশ-মত কিছু কিছু বিভূতি দেখাইতেন। তিনি বলিতেন, যোগের অসাধারণ ক্ষমতা এবং দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কত কি দেখাইতেন। সেই সময় হইতে আমি আশ্রম ছাড়িতাম না, ঐ স্থানে পড়িয়া থাকিতাম। চাকর কাপড় আনিত, ঐখানে কাপড় ছাড়িতাম। চাকর আমার গয়ার তামাক গুল-টীকা আনিত, আমি সাড়ে পাঁচ বৎসর যাবৎ তামাক সাজিয়া বাবাকে খাওয়াইয়া সুখ ও তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইহাতে কেহ কেহ হিংসা করিতেন। তাঁহারা দুদিন তামাক সাজিলেন, ধোঁয়া একেবারে বাহির হইল না। আমি আবার

ঢালিয়া সাজিয়া দিতাম, তবে ধোঁয়া বাহির হইত। সেই অবধি ঐ কাজটি সকলে আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। এই ঘটনা হইতে সকলের একটু জ্ঞানলাভ হইল। বাবাজী একটি আঙ্গুল দিয়া এক সময়ে পর পর কত যে গন্ধ বাহির করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সব বিপরীত গন্ধ পর পর বাহির হইত। ফেনাইন দিয়া পরেই পদ্ম-গন্ধ, কি ভায়লেট, কি গোলাপ-গন্ধ বাহির করিতেন। ধোপার বাড়ী হইতে কাপড় কাচিয়া আসার পরেও ঐ গন্ধ থাকিত। অবিশ্বাসীর দল কেহ বলিত, আঙ্গুলে লাগান আছে, কেহ বলিত, পেটে আছে। মৃত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় উকিল একদিন সাবান দিয়া প্রত্যেকবার আঙ্গুল ধুইয়া দিতে লাগিলেন। তাহাতে কিন্তু গন্ধ আরও বেশী হইতে লাগিল। বাবাজী তাঁহাকে বলিলেন, "উহাতে যে তড়িৎ আরও বেশী হয়।" তখন তিনি বলিলেন, "তবে পেটে গন্ধ আছে", কিন্তু পেট অনুসন্ধান করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। একদিন ঐরূপ একটি বাবু বলিলেন, "দুইটি সদ্‌গন্ধের মধ্যে বিষ্ঠার গন্ধ দিন।" এই কথা শুনিয়া বাবাজী উপর ঠোঁটে তর্জ্জনী ঠেকাইয়া দিলেন, তাতে বাবু বমি করিয়া বাবার কাছে আসিয়া পড়েন। তখন যেমন ছিল তাই হইল। আশ্রমের চাকর ও আমার একটি চাকর প্রত্যহ বাবাজী আহ্নিক করিয়া উঠিবার পরে আসনে একটি করিয়া গাঁজা পাইত। ঐরূপ জিনিষ বাজারে পাওয়া যাইত না। একটা চাঁপাফুলের বড় কুঁড়ি গাঁজা হইয়া থাকিত। নিত্য আমি

পদসেবা করিতাম। একদিন রাত্রে যেমন পায়ের তলা ঘসিয়া দিয়াছি, ঝর ঝর করিয়া চন্দ্রকিরণের মত আগুন পড়িতে লাগিল। আমি চমকাইয়া উঠিতেই বলিলেন, "ভয় নাই, আর হইবে না।" গায়ে মাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, চড়াইপাখী ইত্যাদি বসিলে পুড়িয়া মরিয়া যাইত এবং আমরা চুল পোড়ার গন্ধ পাইতাম। এই অবস্থা এপ্রেল মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত থাকিত। বণ্ডুলের গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় তামাক খাইতে খাইতে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "ভাল মশলাদার তামাক বুঝি আমরা খাইতে পাই না? শিষ্যের তামাক বলিয়া কি একলা খাইবে?" তৎক্ষণাৎ বাবা তাঁর কলিকার দিকে দৃষ্টি করিলেন। তখন ঘোষাল মহাশয় ভ্যাবাচাকা খাইয়া হাঁ করিয়া বলিলেন, "একি হইল, এই দা-কাটা খাইতেছিলাম, কি করিয়া মশলাদার ভাল তামাক হইল?" সেই অবধি ঘোষাল মহাশয় আর কিছুই বলিতেন না। একদিন একটি সন্ন্যাসী একগাছি কাচের মালা আমায় দিয়া একটি পুরাতন দুই টাকা মূল্যের ঘড়ি লইয়া যায়। আমি তাহা লইয়া আশ্রমে বাবার কাছে গিয়া দেখাই। তিনি বলিলেন, "কিরে বাবা, তোকে ঠকাইয়া বুঝি কেউ কাচের মালা দিয়া পাঁচ টাকা লইয়া গিয়াছে?" আমি বলিলাম, "না বাবা, আমি ছেলেদের দুই টাকা দামের একটা পুরাতন ঘড়ি দিয়াছি।" বাবা বলিলেন, "মজা দেখ্‌বি, যদি উহা কাচ হয়, আমি চক্ষে দেখিলে ফাটিয়া যাইবে, আর

স্ফটিক হইলে কিছু হইবে না।" বাবাজী মালাছড়া চক্ষের সাম্‌নে এক হাত তফাতে ধরিলেন। তাহাতে ৮।১০টি ফুট-কড়াইয়ের মত ফাটিয়া গেল। আমি সেগুলি বাঁধিয়া ছাঁধিয়া অনেক দিন রাখিয়াছিলাম। সকলেই অদ্ভুত ক্ষমতায় আশ্চর্য্য হইত—বিশেষতঃ অবিশ্বাসীর দল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সময় বাড়ীর মেয়েরা গোলাপ-জল খাইতে চাহিয়াছিল। তাহাতে সেইদিন কন্যাদের বাড়ীতে যত জল ছিল সব গোলাপ-জল হইয়া গেল। এমন কি, তাহারা গোলাপ-জলে আঁচাইয়াছিল। বাবাজীর মাথায় স্ফটিকের একছড়া মালা ও একটি বাণলিঙ্গ শিব আছে। যখন বাহির করিয়া পূজা করেন, সকলেই দেখিতে পায়। একদিন বলিলেন, "স্ফটিক শরীরের লোমকূপ দিয়া ঢোকাইয়া যেখান দিয়া ইচ্ছা বাহির করা যায়।" তার পরে তিনি দক্ষিণ হস্তের বুড়-আঙ্গুলের তলা দিয়া একটি স্ফটিক পুরিয়া বরাবর লইয়া গিয়া একদিন নাভি দিয়া, একদিন কলার-বোনের নিম্নস্থান দিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

৺ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মহারাণী নারায়ণকুমারীর ভিক্ষাপুত্র। তাঁহার অত্যন্ত তমোগুণ ছিল। তিনি জ্যোতিষ জানিতেন বলিয়া অত্যন্ত অহঙ্কার করিতেন। তিনি গুরুদেবের নিকট সকল রকম উপকার এবং সাহায্য লইতেন, কিন্তু গুরুদেবের নিকট হইতে বাহির হইবামাত্র তাঁহাকে নিন্দা করিতেন এবং গালি দিতেন। ক্ষেতুবাবুকে শিক্ষা দিবার

জন্য একদিন প্রাতে বাবাজী বলিলেন, "দেখ ক্ষেতু, তুমি রহিয়াছ মাটিতে, আমি রহিয়াছি তক্তাপোষের উপর। তোমার হাতের উপর আমি হাত রাখিলে তোমার হাত পুড়িয়া যাইবে, আমি কেবল একবার আগুন ছুঁইয়া লইব।" বোধ হয় ক্ষেতুবাবু ইহা বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বাহাদুরি করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং হাত পাতিলেন। বাবাজী তাঁহার হাতের উপর হাত দিলেন, কেবল মধ্যে একটি পাথর-বাটী রাখিলেন; নতুবা হাত একবারে পুড়িয়া যাইত। প্রথমে ক্ষেতুবাবু বলিলেন, কিছুই জানিতে পারিতেছেন না, তারপরে বলিলেন, একটু চিন্‌চিন্‌ করিতেছে, তারপর গুরুদেবের হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া মুখে পুরিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বাবা নিষেধ করিয়া ঘৃত আনাইয়া সেই স্থানটিতে মাখাইয়া দিলেন। ঠিক টিকা পড়িলে হাত যেমন পুড়িয়া লাল হয়, সেইরূপ হইয়াছিল। বিশ্বনিন্দুকের আশ্চর্য্য গতি। এই ক্ষেতু ইহার পূর্ব্বে শক্তিবলে আনয়ন-করা কত জিনিষ খাইয়াছে, কত কি দেখিয়াছে। আমরা কত রকমের জিনিষ যে খাইয়াছি, কত রকম জিনিষ ইচ্ছাশক্তি বলে আনয়ন করা দেখিয়াছি, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

বাবু তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিলেন। তিনি আমার সহিত বাবাজীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রথমে, যোগ ও আসন সম্বন্ধে উপদেশ লয়েন, তারপর গন্ধে মোহিত হইয়া নানারূপ গন্ধ লয়েন, তারপরে যোগ ও ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব

দেখিতে চাহেন। বাবাজী খুব বড় পুষ্ট টাটকা আঙ্গুর তাঁহাকে দেন। তেজুবাবু মুক্তকণ্ঠে ক্ষমতা স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, "এরূপ জিনিষ বাজারে পাওয়া যায় না।" বাবু রাজেন্দ্র দত্ত বর্দ্ধমানে ডিষ্ট্রিক্ট জজ থাকাকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র-বধূ এবং আর একজন লোক ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন তিনি আমার সহিত গুরুদেবের কাছে যান, ও ক্ষমতা দেখিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়েন। একদিন গুরুদেবের পায়ের উপর পড়িয়া কনিষ্ঠ পুত্রের জ্বরের জন্য অনুরোধ করেন। বাবাজী আমাকে বলেন, "ছেলেটির ক্ষয় রোগ দাঁড়াইবে এবং উহা শিবের অসাধ্য"; পরে রাজেন্দ্রবাবুকে একটি ঔষধ দেন ও বলেন, "খুব উচ্চস্থানে পাথরবাটীতে গঙ্গাজলের মধ্যে ইহা রাখিবেন, প্রাতে উঠিয়া ইহা ধুইয়া জল খাইতে দিবেন। যদি ঔষধটি থাকে, ছেলেটি বাঁচিবে"। পর দিন প্রাতে ঔষধ ধুইয়া জল খাইতে দিতে গিয়া সকলে দেখিল, ঢাকার ভিতর হইতে পুটুলি-শুদ্ধ ঔষধ উবিয়া গিয়াছে। আমি স্থানটি দেখিয়াছি, অতি উচ্চ স্থান, কড়িকাঠের কাছ বরাবর। তারপর রাজেন্দ্রবাবু সব বুঝিতে পারিলেন। ছেলেটি পরে মারা গিয়াছিল। বনোয়ারিহাটী বাবু বর্দ্ধমানের পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন। হঠাৎ তাঁর এমন হইল, বাম হস্ত বুকের নীচে আর নামে না, হাত আড়ষ্ট হইয়া গেল। গুরুদেবকে বলিবার জন্য তিনি আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি গুরুদেবকে বলায় তিনি

প্রাতে আহ্নিকের পর লইয়া যাইতে বলিলেন। একদিন প্রাতে বনোয়ারিবাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম। বাবাজী ঠিক সেই সময় বাহির হইয়া আসিলেন। তখন গুরুদেব তাঁহার কাঁধের উপরে দুই দিকে আঙ্গুল দিয়া ধরিলেন। প্রথমে বনোয়ারিবাবু কিছু বুঝিতে পারেন নাই, পরে কাঁধটি চিন্‌চিন্‌ করিতে আরম্ভ করিল। যখন গুরুদেব বলিলেন, "এইবার দেখ দেখি", তখন বনোয়ারি বাবু হাত নামাইলেন —হাত ঠিক হইয়া সহজ হইয়া গেল। একদিন দুপুর বেলায় আমরা কয়েক জন—তার মধ্যে ক্ষেত্রনাথবাবু, বনোয়ারিবাবু প্রভৃতিও ছিলেন—একশত আট মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সব ঘুরিয়া যখন বাঁধা ঘাটে আসিয়া বসিলাম, তখন সকলকার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। বাবাজী বলিলেন, "সকলের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, কিছু খাবে ?" আমরা বলিলাম, "পেলে আর মাঠের মাঝখানে কে না খায় ?" বাবা তখন "কি খাইবে" জিজ্ঞাসা করায় বনোয়ারিবাবু বলিলেন "পেড়া খাইতে ইচ্ছা করিতেছে।" বাবাজী বলিলেন, "বৈদ্যনাথে একটি মাড়ওয়ারি পেড়া পূজা দিল—আনিয়া দিতেছি।" তারপরে অতি উৎকৃষ্ট পেড়া বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন। পরে যখন গাড়ী করিয়া বাড়ী আসিতেছিলাম, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "নরেন্দ্র, ধর ধর, অনেক পেড়া আসিয়াছে।" আমি তখন অম্লান বদনে সমস্তটা হস্তগত করিয়া পকেটে আনিয়া বাড়ীতে ছেলেদের দিলাম।

একদিন প্রাতে আমি আশ্রমে যাইয়া বাবার কাছে বসিয়া আছি। ইতিমধ্যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (ওরফে নেড়ু; সে এখন হাইকোর্টের উকিল—আলিপুরে কার্য্য করে এবং এখন শিষ্য হইয়াছে, কিন্তু তখন ক্ষেতুবাবুর পাল্লায় পড়িয়া বিরুদ্ধবাদী ছিল) হঠাৎ ছট্‌ফট্‌ করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষেতুবাবু এবং বাড়ীর অপর লোকে ডাক্তার খুঁজিয়া পাইল না। নেড়ুর হার্ট কেমন করিতেছিল, আমার হঠাৎ মন খারাপ হওয়ায় আমি এক রাস্তা দিয়া বাড়ী আসিতেছি, উক্ত ক্ষেতুবাবু অপর রাস্তা দিয়া গুরুদেবের কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি রকম গুরু—আপনার প্রিয় ও প্রধান শিষ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র হঠাৎ মর-মর, আর আপনি এখানে মজা করিয়া বসিয়া আছেন।" তাহাতে গুরুদেব স্থিরভাবে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "দেখ ক্ষেতু, চালাকি করিও না, ছেলেতে আর শিষ্যেতে কোন প্রভেদ নাই। নেড়ুর কিছুই হয় নাই, গর-হজমের জন্য পাকস্থলী ফুলিয়াছিল, গিয়া দেখ গে এখন ঠিক হইয়া গিয়াছে ও ভাল আছে।" আমি বাড়ী আসিয়া দেখি, নেড়ু ভাল হইয়া গিয়াছে ও সোডা খাইতেছে। ক্ষেতু দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "আপনার গুরুদেব এই সব কথা বলিলেন।" তখন তিনিও দেখিলেন, নেড়ু ভাল হইয়া গিয়াছে। গুরুদেব যাহা বলিয়াছিলেন, ডাক্তার অটল বাবু তখনি আসিয়া সেই সব

কথাই বলিলেন। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমাদের গুরুদেবের যত শিষ্য প্রত্যেকেই মনে করেন, 'আমাকে গুরুদেব সকল অপেক্ষা বেশী ভালবাসেন আমি সকলের অপেক্ষা প্রিয়।' তাঁহার কাছে উচ্চ-নীচ, ধনী ও গরিব, বিদ্বান্ বা মূর্খ, কিছুই প্রভেদ নাই, তিনি সকল সময়ে একাধারে পিতা, গুরু ও ঈশ্বর —তিনি এত স্নেহময় যে, নিজের পিতাও সেরূপ ভালবাসিতে পারেন না, নিজের পিতাও পুত্র-সম্বন্ধে এত খোঁজ রাখেন না।

একবার শিবরাত্রির আগে আমার মধ্যম পুত্র সর্দ্দারের (রমেন্দ্রর) পেটে একটা বেদনা হইল। ডাক্তার অটল বাবু কিছু করিতে পারিলেন না। সর্দ্দার গোঁ ধরিল যে, বণ্ডুলে গুরুদেবের কাছে গেলে ও তিনি হাত বুলাইয়া দিলে নিশ্চয়ই ভাল হইবে। কয়েক টাকা খরচ করিয়া কোঁতাইতে কোঁতাইতে গরুর গাড়ী করিয়া সে বণ্ডুল গেল। পর দিন প্রাতে সে গুরুদেবকে ধরিয়া বসিল যে, তার পেটে হাত বুলাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গুরুদেব পেটে হাত বুলাইয়া দিয়া মহাদেবের স্নান-জল খাইতে বলিলেন। সে নিম্নে গিয়া স্নান-জল খাইয়া আসিয়া বলিল, "একেবারে ভাল হইয়া গিয়াছে, আর সেরূপ হয় নাই।" ডাক্তারে বলিয়াছিল, উহা কলিক্ পেন।

আমার তৃতীয় পুত্র কানুর (রত্নেন্দ্রনাথ ঘোষ—এখন হাইকোর্টের উকিল) জ্বর আরম্ভ হইল—কিছুতে ছাড়ে না।

অটল বাবু ও অমূল্য বাবু দুজনে দেখিয়া কিছু করিতে পারিলেন না—ক্রমে দ্বৈকালীন জ্বরে পরিণত হইল। ডাক্তারেরা বলিলেন, "আমাদের আর কিছু নাই—চেঞ্জে লইয়া যান।" গুরুদেব বলিলেন, "কিরে বাপু, ডাক্তারদের বিদ্যাবুদ্ধি ফুরাইয়া গেল? আমি ঔষধ দিতেছি, লইয়া গিয়া খাওয়াইয়া দাও।" প্রথম তিন দিনের ঔষধ দিলেন, তাতে কিছু উপকার হইল; পরে আর তিন দিনের দিয়াছিলেন, দুই দিন খাইতে জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল, আর হয় নাই।

আজ ১৩ই আগষ্ট, ১৯২৮ সাল। এই ছেলের (কানুর) ১৬ই জুন হইতে প্রত্যহ জ্বর হইতেছিল। ৪ঠা ও ৫ই জুলাই জ্বর হয় নাই, আবার ৬ই জুলাই হইতে রোজ বৈকালে জ্বর হইতেছিল। ইতিমধ্যে বরাবর ডাক্তার পরেশ বাবু, জগদ্বন্ধু বাবু এবং নলিনীকান্ত সেন, এম, ডি, দেখিয়া ডিস্পেন্সারি উজাড় করিয়াছেন। তিনটি এসেটিক ইন্জেক্সন, ছয়টি ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড ইন্জেক্সন এবং পাঁচটি ক্রুসেটিনিসিরো ভেক্সিনো ইন্জেক্সন দিয়াও কিছু হয় নাই। ৪ঠা আগষ্ট শনিবার বাবাজীর কাছে গিয়া দুই মোড়া ঔষধ আনি। রবিবার এক মোড়া ও সোমবার এক মোড়া ঔষধ খাইয়া ৭ই মঙ্গলবার ৯৯° ডিগ্রীর নীচে জ্বর নামে, ৮ই বুধবার একেবারে হয় নাই, ৯ই বৃহস্পতিবার ৯৯° ডিগ্রীর নীচে হইয়াছিল। শুক্র ও শনিবার জ্বর হয় নাই, কেবল রবিবার দুই ঘণ্টাকাল রাত্রি ৯টার পর ৯৯° ডিগ্রি হইয়াছিল।

১০ই শুক্রবার বাবাজী বলিলেন, "আরও ২।৩ মোড়া কানুকে খাওয়াইতে হইবে, কোন ভয় নাই—কোন ভাবনা নাই। কিন্তু এতদিন কি করিতেছিলে ?"

এক সময়ে বর্দ্ধমানে আমার দক্ষিণ পায়ের হাঁটু ধরিয়া গিয়াছিল। বাবাজীর কাছে খোঁড়াইতেছিলাম। বাবা বলিলেন, "এ দিকে আয় রে বাপু, দেখি।" যেমন কাছে গেলাম, আমার হাঁটুটা আঙ্গুল দিয়া ধরিলেন, একটা তৈল গড় গড় করিয়া পড়িতে লাগিল এবং স্থানটি সুগন্ধে ভরিয়া গেল। বাবা হাঁটুতে সেই হাতটা মাখাইয়া দিলেন এবং কতকগুলি নাগেশ্বরী চাঁপাফুলে বাকি তৈল লাগাইয়া রাখিলেন। বলিলেন, "কাল যদি ভাল না হয়, এই তৈল দিয়া মালিশ করিও।" কিন্তু ঐ স্থানে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই আমার একেবারে ভাল হইয়া গেল। 'এটা কি জিনিষ' জিজ্ঞাসা করায় বাবা বলিলেন, "বাতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ আহ্বান করিয়াছিলাম, এটা আসিয়াছে বিটেল অয়েল।" এক দিন কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বাবার বড় জ্বর, চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছেন। আমি পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে খুব দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "বলুন, কার অসুখ টেনে লইলেন।" বাবা বলিলেন, "পরশ্ব জানিতে পারিবে। এক বিধবার একমাত্র পুত্র—সে আজ আত্মহত্যা করিত। তাই এই কার্য্য করিয়াছি।" তার পর দিন প্রাতে আশ্রমে বসিয়া আছি, ডাক আসিল।

এমন সময় বাবাজী বলিলেন, "ঐ পত্রখানি খুলিয়া পড়।" পত্র পড়িয়া আশ্চর্য্য হইলাম। পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ— "বাবা, সাধ করিয়া কি লোকে আপনাকে স্নেহময় দয়াল পিতা বলে! আমার ছেলের এত জ্বর হইয়াছিল, গত পরশ্ব ঠিক করিয়াছিলাম যে যদি আপনি জ্বর না ছাড়ান, ভাল না করেন, তাহা হইলে আত্মহত্যা করিব। এমন সময় বেলা ৩টার সময় আমার ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মা, মা, গুরুদেব এসেছেন।' আমি ঘরে গিয়া দেখি, আপনার গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। সেই সময় হইতে ছেলে ঘামিতে আরম্ভ করিল, রাত্রি ৯টার সময় জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছে।" বাবাজী রাত্রি ৯টার সময় ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। এইরূপ কত যে দেখিয়াছি, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। বাবাজীর সবই অদ্ভুত, সবই আশ্চর্য্য, সবই অমানুষিক। যদি কেহ ভগবানের ক্ষমতার সীমানা দেখিতে চাহেন, একবার এই মানুষটিকে দেখিয়া যান।

একদিন বাবা ঘুমাইতেছিলেন, আমি ঘাড় হেঁট করিয়া পা টিপিতেছিলাম; এমন সময় বাবু রজনী কোঙার, রজনী মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া বাবার বিছানা হইতে আঙ্গুর লইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি একটু দূরে ছিলাম, উহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি চটপট কতক মুখে পুরিলাম, কতক হস্তগত করিলাম। আমাদের গোলমালে বাবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি বসিয়াই বলিলেন, "নরেন্দ্র,

মুখের ভিতর আঙ্গুর রহিয়াছে, নে নে।” আমি তৎক্ষণাৎ হাত পাতিয়া হস্তগত করিলাম। স্বপ্নাবস্থায় কেন এরূপ হইল, জিজ্ঞাসা করায় বাবাজী বলিলেন, “ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, রূপার গাছে সোনার আঙ্গুর ফলিয়াছে—আমি গাছতলায় বসিয়া পূজা করিতেছি এবং ঠাকুরদের আঙ্গুর নিবেদন করিতেছি।” একদিন সন্ধ্যার সময় নায়িকা শক্তির আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইতেছিলেন। বলিলেন, “তোমরা কাগজে কিছু লিখিয়া সেইটা আগুনে পোড়াইয়া ছাইগুলি জলে গুলিয়া ফেলিয়া দাও; তারপর সেই কাগজ আনিয়া দিব।” রজনী কোঙার উকিল বাবু লিখিলেন, “জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। (এই স্থানে ‘জানাম্যধর্ম্মং’ শব্দটি কাটাকুটি করিয়াছিলেন, তাহাতে কালী কাঁচা থাকায় কাগজ পাট করিতে এ ধারের কালী ওধারে লাগিয়াছিল) ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি”—সেই কাগজ আমাকে ও আরও ৮।১০ জন ভদ্রলোককে দেখাইলেন। আমি সেই কাগজ আগুনে পোড়াইয়া জলে গুলিয়া ঘরের নর্দ্দমা দিয়া বাহির করিয়া দিলাম। পরে বাবাজী আপন আসনে বসিয়া সেই কাগজখানি আনিয়া আমার হাতে দিলেন। দেখিলাম, সেই এ ধারের কালী ওধারে লাগা কাগজখানি। এই কাগজখানি আমার কাছে ছয় মাসের উপর ছিল। এক দিন বাবার বৈবাহিক জগৎবাবু (তুর্গার প্রথম পক্ষের

শ্বশুর) বলিলেন, “আমি ৪টা প্রশ্ন মনে মনে করি, তার উত্তর দিন।” কিছুক্ষণ পরে কলিকাতার ডাক আনিয়া বাবার তক্তার উপর রাখিলেন। তার মধ্যে একখানি খাম তুলিয়া বাবা জগৎবাবুকে বলিলেন, “এইখানি খুলিয়া পড়।” জগৎবাবু সেই খাম ছিঁড়িয়া খুলিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, তাঁর চারিটি প্রশ্ন রহিয়াছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে তার জবাব,—এইটি কাল কালীতে ছিল। আর একখানি খাম ছিঁড়িয়া দেখাইলেন, সেই ৪টি প্রশ্ন ও উত্তর লাল কালিতে এক টুকরা কাগজে লেখা রহিয়াছে। আমরা সকলে আশ্চর্য্য হইলাম। জগৎবাবু হতভম্ভ হইয়া গেলেন। কারণ তিনি ঠাট্টা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁরই বাড়ীতে বিবাহের সময় গোলাপ-জল হইয়াছিল।

একদিন প্রাতে গিয়া দেখি, বিছানায় সবুজ ছোব লাগিয়াছে ও আঙ্গুরের খোসা নেপ্‌টাইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, “স্বপ্নের মধ্যে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ হইয়াছিল।”

একদিন সন্ধ্যার সময় বলিলেন, “ইচ্ছা-শক্তির বলে ময়রার দোকানের থালা-শুদ্ধ জিনিষ আসে।” আমরা দেখিতে—কেহ কেহ বিশেষ খাইতে—উৎসুক হওয়াতে তিনি বলিলেন, “সন্ধ্যা-আহ্নিকের স্থানের কাছে জানালার উপর দেখ।” আমরা গিয়া দেখি, সত্যই এক থালা রসগোল্লা।

একদিন প্রাতে কাগজ পড়িবার জন্য চশ্‌মা আবশ্যক হইল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথাকার চশমা আনিব?” আমরা বলিলাম, “জেম্‌স মরের বাড়ীর চশমা।” তৎক্ষণাৎ সোনার

খাপের ভিতর সোনার চশমা আসিয়া হাজির। আমরা রাখিতে বলায় বলিলেন, "ঐটি বাদে সব পারিব। লোভ করিয়া রাখিলে, এমন কি ক্রিয়া পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া যাইবে।" একদিন সন্ধ্যার সময় দুইটি বাবু আসিলেন। একজন কেবল চুল-বুল করিতেছিলেন। বাবা বলিলেন, "আপনি বুঝি আফিঙ্গ সেবন করেন ?" তিনি বলিলেন, "দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" তখন বাবাজী তর্জ্জনী ও বুড়আঙ্গুল ঘষিতেছিলেন। সেই বাবুকে শুঁকিতে বলায় বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আফিঙ্গের গন্ধ কোথা হইতে আসিল।" তার পর বাবা বলিলেন, "যতটুকু দরকার, লও।" তিনি তাঁর মাত্রানুযায়ী লইলেন।

খাইবার পরে দুগ্ধ তরকারী ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাহির করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু ইহা বিজ্ঞান-বিরোধী, দুগ্ধ পেটে গেলে জমিয়া যায়, তরকারি চর্ব্বণের পর মিশিয়া যায়। যখন বাবাকে বলিয়াছি, "বাবা, একটু দুধ বাহির করিয়া দিন্." তখনই ওয়াক্ করিয়া দুধ বাহির করিয়া দিয়াছেন। সেইরূপ আলু ইত্যাদি বাহির করিয়া দিয়াছেন। কাঠের টবে বসিয়া একদিন স্নান করিতেছিলেন, আমি নাওয়াইতেছিলাম। দেখি, জল বহু কমিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "পেটের ভিতর পুরিয়াছি।" আবার বাহির করিতে বলায় টব জলে পুরিয়া গেল। ১৯১১।১২ সালে একদিন ডাক্তার চন্দ্রবাবু, নেপাল বাবু, দেবেন বাবু ও আমি বাবার সঙ্গে গিয়া গুস্করা হইতে

সমস্ত জিনিষ-পত্র উঠাইয়া লইয়া আসি। চোঙ্গদাররা গুষ্করার জমিদার ও বড়লোক—উঁহাদের ছোটবাবু তারাপ্রসন্ন বাবার বড় হিংসা করিতেন, বাবাকে খেলো করিবার চেষ্টা করিতেন, ভারি নিন্দা করিতেন, অথচ দরকারের সময় কিংবা পীড়ার সময় মিষ্ট কথা বলিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া লইতেন। তিনি ভূতের ভয় পাইতেন। একদিন বলিয়া কহিয়া বাবাজী চিন্তামূর্ত্তি সৃজন করিয়া শূন্যে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে দেখান। সেই দিন হইতে তিনি বাবাজীকে ভয় করিতে লাগিলেন এবং বলিতেন, "উঁহার দুইটা ভূত পোষা আছে, উঁহাকে ঘাঁটানো হইবে না।" যখন টাকা ধার করিবার আবশ্যক হইত, বাবার কাছে আসিয়া কত রকম বাহানা করিতেন। কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না সত্য, তথাপি স্বভাবতঃ যে সব গাঁট হয় সেই সব স্থান একটু কেমন-কেমন হয়। বর্দ্ধমান আশ্রম তৈয়ারী হইবার পূর্ব্বে তিনি কত কি রটনা করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, এ বাড়ীতে কড়ি উঠিবে না। যেদিন কড়ি তোলা হয়, তাঁকে হাতে-পায়ে ধরিয়া কড়ি উঠান দেখিতে আনিয়াছিলাম। তাঁর ছেলেরা এবং বড় বাবুর ছেলেরা—যজ্ঞেশ্বর বাবু প্রভৃতি—বাবাজীর খুব সম্মান করিতেন। গুষ্করায় থাকিবার সময়েও অনেক বড় বড় লোক—Chief Justice, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ইত্যাদি—বাবার কাছে যাইতেন। একদিন বাবা ডাক্তার সরকারকে বলেন যে, যদি একখানি সিল্কের চাদরে ঘি মাখাইয়া মুখ দিয়া পুরিয়া দেওয়া

হয়, তাহা নাভি দিয়া বাহির করা যায় এবং খুব চমৎকার ধৌতি হয়। ডাক্তার সরকার হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি সায়েন্সের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছেন।" তাতে বাবা বলেন, "যোগের দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমাদের শরীরে সব স্থানেই গর্ত্ত আছে।" এই বলিয়া একখানি সিল্কের চাদর লইয়া কোণাকুণি ভাবে পাকাইয়া ঘি মাখাইয়া মুখ দিয়া পুরিতে আরম্ভ করেন, পরে যখন কুণি নাভি দিয়া একটু বাহির হয়, তিনি টানিয়া লইতে বলেন ও চাদরখানি টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। সেই সময় লোমকূপ দিয়া স্ফটিক ঢোকাইয়া চালনা করিয়া ডাক্তার সরকারের নির্দ্দেশমত স্থান দিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

আমি ভাল করিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি, বাঁকুড়ায় থাকার সময়ে এক রাত্রে প্রমথবাবু, দেবেনবাবু প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। তখন বাবা তামাক খাইতেন। গভীর রাত্রে তামাক খাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু দেশলাই ছিল না, আগুন জ্বালিবার কোন সরঞ্জাম ছিল না। তখন বাবার আদেশ-মত প্রমথবাবু কতকগুলি নারিকেল ছোবড়া নূটি করিয়া বাবার মুখের সামনে ধরেন। বাবাজি সেই নূটিতে ফুঁ দেওয়াতে নূটিটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

একদিন দুপুর বেলা বসিয়া পা টিপিতেছি, হঠাৎ বলরামপুর থানার সবইন্‌স্পেক্টর আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "বাপু

হে, আসন কি মেয়েমানুষ ভাবিবার জন্য ?” তখন তিনি বলেন, “বাবা, এরূপ আর কখন হইবে না।” পরে আমি যখন বাহিরে যাই, তিনি আমাকে বলেন, “গত কল্য একটি স্থানীয় তদন্তে গিয়া একটি ১৭।১৮ বৎসরের বিধবাকে দেখিয়া মন বিচলিত হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় আহ্নিকের ঘরে যাইয়া আসনে বসিয়া সেই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ভাবিয়াছিলাম। সেই আসনের মাথার উপরে বাবাজীর একখানি ফটো ছিল। সেই দিকে নজর পড়িতে দেখি, ফটোখানি নড়িয়া উঠিল। আমি ভৌতিক কাণ্ড মনে করিয়া এদিক ওদিক দেখিতেছিলাম। সেই সময় ফটোর ভিতর হইতে আওয়াজ হইল, ‘থাম্ পাজি কোথাকার!’ সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল। তখন আমার আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তাই প্রাতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি গুরুদেবের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি।”

‘গেঁয়ো যোগী ভিক্ষা পায় না’,—বর্দ্ধমানে গুরুদেব সম্বন্ধে প্রথম প্রথম সেইরূপ হইয়াছিল। লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিতে করিতে প্রাণ বাহির হইত। যেদিন ১০।১৫টি বচসা ও ঝগড়া না হইত এমন দিনই ছিল না। নিন্দুক এবং অবিশ্বাসী লোকেরা গন্ধ লইতে ও খাবার খাইতে দলে দলে দৌড়িয়া যাইত; উপকারের জন্য সকলেই তাঁহার কাছে ছুটিত। বাবাজী যখন বাড়ীতে আসিতেন, শিশুদের সহিত মিলিয়া শিশু হইয়া খেলা করিতেন,—গন্ধ দিতেন, আঙ্গুর দিতেন এবং অন্যান্য ফলও

দিতেন। একদিন একজন শিষ্য (সম্ভবতঃ নীরদ বাবু) দীক্ষা লইবেন বলিয়া স্থির হয়। বাবা পুনঃপুনঃ বলিয়া দিয়াছিলেন, খুব ভোরে দীক্ষা দিবেন। খুব ভোরে উঠিয়া তাঁহার ঘরে ছেলেরা চ্যাঁ-ভ্যাঁ করিতেছিল। তিনি আশ্রমে আসিবেন বলিয়া ঠিক হইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, গুরুদেব ডাকচেন—দেরি করছ কেন?" তিনি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখেন, গুরুদেব বেঞ্চের উপর গেরুয়া কাপড় পরিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার গন্ধে স্থানটি ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু খিল খুলিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই, তবে তাঁহার সামনে সামনে গন্ধ যাইতেছে; এইরূপ অবস্থায় তিনি আশ্রম পর্য্যন্ত গেলেন। যাইবামাত্র বাবাজী বলিলেন, "কিগো, দেরি হইতেছিল, সময় উত্তীর্ণ হয় বলিয়া ডাকিতে গিয়াছিলাম।" তখন আর কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না।

বর্দ্ধমানে একজন সাহেব আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম এখন মনে হইতেছে না। তিনি বাবাজীর একজন বড় ভক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি এক দিন বাবাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তাঁহার মেম, ছেলে, মেয়ে, সব আসিয়া জুটিল। সাহেব ও তাঁহার মেম ভাইওলেট গন্ধের ভক্ত, কিন্তু বাবাজী পুরা পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে। ভাইওলেট ফুল কিরূপ অথবা ভাইওলেট গন্ধ কিরূপ, কখনও জানেন না। সাহেব ও মেম ফরমাইস করিলেন,

"আমাদের ভাইওলেট গন্ধ দিন।" যাঁহার অসীম শক্তি, যাঁহার যোগবল অমানুষিক, তাঁহার কাছে অসাধ্য অথবা আশ্চর্য্য কি আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ যোগবলে সব জানিয়া ও স্থির করিয়া বলিলেন, "তোমার লিখিবার টেবিল হইতে কাগজ-চাপাটি আন দেখি।" একটি মেয়ে সেটি আনিতে আনিতে গন্ধে মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। সাহেব আশ্চর্য্য! তার পর সেই ঘরের সব জিনিষে তাঁহারা ভাইওলেট গন্ধ পাইতে আরম্ভ করিলেন। ঘরটি ভাইওলেট গন্ধে ভরিয়া গেলে সাহেব ও মেম আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। সাহেব সব সময়ে যাইবার ও আসিবার সময় ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাদের মত প্রণিপাত করিতেন। মেম সাহেবের গর্ভ হইয়াছে বলিয়া অনেকগুলি ডাক্তার খুব ভুল করিয়াছিলেন। বাবাজী স্থির বলিয়া দেন যে, উহা গর্ভ নহে।

ক্ষেতুবাবু বনোয়ারিবাবুর পুত্র পঞ্চার মৃত্যু-কাল বড় ঠিক ও আশ্চর্য্য গণিয়াছিলেন। বনোয়ারিবাবু আমার সহিত আশ্রমে গিয়া গুরুদেবের পায়ের উপরে পড়েন। গুরুদেব বলেন, "পীড়া শিবের অসাধ্য। অমুকদিন ছেলেটি মরিবে। যাহা হউক, কার্য্য করিয়া দেখিব, কি করিতে পারি।" শিবরাত্রের আগের দিন বহু কষ্টে একটু গব্য ঘৃত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বগুলে তাঁহার স্থাপিত শিবের ঘরে ঢুকিবার আগে ঘৃতের দিকে পিছন করিয়া পা ধুইতেছিলেন, ইত্যবসরে

একটা কুকুর আসিয়া ঘৃতের বাটি মুখে করিয়া লইয়া যায়। তার পরে বাবা আমার কাছে লোক পাঠান যে, আর কিছু হইবে না, প্রতীকার শিবের অসাধ্য, অমুক দিন দুর্ঘটনা ঘটিবে। পরে ঠিক সেইদিনে পঞ্চুর মৃত্যু হয়।

একদিন সন্ধ্যার সময় কে আসিয়া আমাকে খবর দেয় যে, গুরুদেবের দাঁতের গোড়া দিয়া অজস্র রক্ত পড়িতেছে। দৌড়িয়া আশ্রমে গিয়া দেখি, গুরুদেব উপরে শুইয়া আছেন। তিনি আমাকে খবর দিতে বারণ করিয়াছিলেন। তখন ডাক্তার থার্সটন সাহেব বর্দ্ধমানে ছিলেন। আমি গিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। তখন বাবাজী আমায় বুঝাইলেন ও পত্র দেখাইলেন যে, পাঞ্জাবের উপরওয়ালাদের আদেশ-মত একটি শিষ্যের অকাল-মৃত্যু নিবারণের জন্য কাঁচা দাঁত তুলিতে হইয়াছিল। আদেশ আসিয়াছিল যে, তাঁহার কোন শিষ্যের অকাল-মৃত্যু হইবে, কিন্তু তিনি যদি কোন অঙ্গহানি করিতে পারেন, তাহা হইলে সে বাঁচিবে। সেই জন্য বাবাকে ঐরূপ করিতে হইয়াছিল। ডাক্তার দাঁত অর্দ্ধেক তোলার পর রক্ত দেখিয়া ভয় খাইয়া আর তুলিতে পারেন নাই। পরে বাবাজী নিজে তাহা তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। শিষ্যের জন্য গুরুর কিরূপ হয়, সকলের ভাবিবার বিষয়। শিষ্য তাঁহার প্রাণ—শিষ্য তাঁহার সব। শিষ্যের সদিচ্ছায় তিনি যাহা করেন, লোকের পিতামাতা তাহা

করিতে পারেন না। তাঁহাকে পাইয়া সংসারের সব ভুলিয়া যাইতে হয়।

যখন তিনি আঙ্গুলে করিয়া গন্ধ-দ্রব্য আনয়ন করেন, তখন আঙ্গুলের প্রতি দৃষ্টি করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আঙ্গুল দিয়া কোন তৈলাক্ত পদার্থ আসিতেছে। এক সঙ্গে এক সময়ে কেহ বলিতেছে পদ্ম-গন্ধ, কেহ বলিতেছে গোলাপের গন্ধ, কেহ খশের গন্ধ, কেহ ভাইওলেট গন্ধ, কেহ ফেনাইনের গন্ধ, এইরূপ যে যত গন্ধ বলিতেছে, তিনি পর পর দিয়া যাইতেছেন—হাত ধোওয়া নাই, পোঁচা নাই, কেবলই দিয়া যাইতেছেন। এইরূপ কতবার দেখিয়াছি, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

একদিন কয়েকটি শিষ্যসহ পুরুলিয়া হইতে বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, একটি লোক এক কাঁদি মর্ত্তমান কলা আনিতেছিল। সকলে বসিয়া সেই কলার প্রশংসা করিতেছিল। বাবাজী বলিলেন, "কলা দেখিয়া সকলের লোভ হইয়াছে। তোরা খাবি?" সকলে বলিয়া উঠিল, "খাইব, খাইব।" তৎক্ষণাৎ বাবাজী পর পর ৮।১০টি কলা বাহির করিয়া দিলেন, সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

এক রবিবারে আমার বড় ছেলের গলায় মস্ত একটা কাঁটা বিঁধিয়া গেল, কিছুতে বাহির হইল না। সেই সময় আমার ছেলে বিপক্ষবাদী। আমি তাহাকে আশ্রমে আসিতে বলিয়া নিজে আশ্রমে আসিয়া আগে বাবাকে বিপদের কথা বলিলাম।

পরে আমার ছেলে আসিল। বাবা বলিলেন, "নেড়ু, বাহিরে এস।" তাহার পর নেড়ুকে সূর্য্যের দিকে হাঁ করিয়া বসিতে বলিলেন। তিনি নিজে কাঁটাটি দেখিয়া সকলকে ডাকিয়া দেখাইলেন; পরে বলিলেন, "ঢোঁক গিলিয়া দেখ দেখি, নেড়ু।" নেড়ু ঢোঁক গিলিয়া বলিয়া উঠিল, "আর ও কাঁটা নাই।" তারপর আমরা দেখিলাম, যেস্থানে কাঁটা ছিল সেখানে আর কিছু নাই। যে কাঁটার জন্য এত চেষ্টা করা গেল—কিছুতে গেল না, সেই কাঁটা দৃষ্টি মাত্রে কোথায় চলিয়া গেল! সেই সময় আমার জানিতে ইচ্ছা হইল, নেড়ু বাবার নিকট দীক্ষা লইবে কিনা! বাবাজী বলিলেন, "আমার পায়ে মাথা মুড়াইবে, কিন্তু এখনও সময় হয় নাই। দেরি আছে, যখন সময় আসিবে, বলিব।" পরে ঠিক সময় আসিলে নেড়ুকে দীক্ষা দিয়াছেন। মেজ ও সেজ ছেলে নিজ হইতে দীক্ষা লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে এবং বাবা তাহাদের দীক্ষা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

বাবাজীকে বর্দ্ধমানে আনিয়া স্থাপনা করা হইতে বরাবর আমার যে কি সুখের, সৌভাগ্যের, তৃপ্তির ও আরামের দিন গিয়াছে তাহা আমি লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। সংসারের কোন খোঁজ রাখিতে হইত না। সব যেন গুরুদেব আপনা হইতে করিয়া যাইতেন, আমি কেবল দিবা-রাত্রি গুরু-সেবা করিয়া নিজ হাতে তামাক সাজিয়া গুরুদেবকে খাওয়াইয়া স্বর্গীয় সুখ ও তৃপ্তি লাভ

করিতাম। গুরুদেবের মধ্যে মধ্যে একটা সময় আসিত, যখন তিনি যে সিল্কের কাপড় ও চাদর পরিয়া আহ্নিক করিতেন তাহা পচিয়া গলিয়া যাইত, হাতে করিয়া তুলিতে গেলে খসিয়া আসিত। কাপড় ও চাদরে ঘাম লাগিয়া একটা সবুজ আভা (greenish) পড়িত ও পচিয়া গলিয়া যাইত। নূতন কাপড় চাদর ১৫ দিনের বেশী যাইত না। এই সময়ে গায়ে মাছি ইত্যাদি বসিলে পুড়িয়া মরিয়া যাইত। এক দিন বাবাকে লইয়া 'গোলাপ-বাগ' দেখিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় খুব বড় বড় বাঘ, সিংহ ও সিংহী ছিল। প্রথম দেখিলাম, যতগুলি ছোট বাঘ আছে, বাবার চক্ষের দিকে তাকায় আর দাঁত খিঁচাইয়া কোণে গিয়া বসে। বাবাজী বলিলেন, "বাঘেরা আমার তড়িৎ সহ্য করিতে পারে না, পলাইয়া যায়।" তখন একজোড়া বড় সুন্দরবনের বাঘের কাছে আসিলাম। এ দুইটি বাস্তবিক রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আমাদের দেখিয়া মহারাজেরা কত রকম গর্জ্জন করিতে লাগিল। যেমন বাবাজী সেই স্থানে আসিলেন, অমনি তাঁহার চক্ষের দিকে নজর করিয়া মাথা নীচু করিয়া দুইটা পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চক্ষু ঘষিতে আরম্ভ করিল। তারপর কোন রকমে মাথা তুলিলে বাবার চক্ষুর নজর পড়িতেই গাঁক্ করিয়া চীৎকার করিয়া লাফাইয়া গুরুদেবের দিকে পিছন করিয়া দরজার কাছে গিয়া বসিল, নড়িল না, উঠিল না। তারপর বাড়ী আসিয়া

কেহ কেহ কামাখ্যার ঘটনা বর্ণনা করিলেন। একবার ডাক্তার প্রতাপ বাবু, কালী ঘটক, বঙ্কুবাবু এবং আরও অনেক লোক বাবার সহিত কামাখ্যা গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পরে যখন লুচি ভাজা হইতেছিল, ঠিক উঁহাদের পিছনে একটি মহাপ্রভু আসিয়া পড়ে। গুরুদেব অন্যত্র ছিলেন, সকলে বাঘ, বাঘ, করিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠেন। তখন বাবা তাড়াতাড়ি আসিয়া সকলকে ঠেলিয়া দিয়া সাম্‌নে গিয়া পড়েন। বাঘটা বাবার চক্ষের দিকে দেখিয়া সাম্‌নের দিকে লাফাইতে ভুলিয়া গিয়া গাঁক্‌ করিয়া চীৎকার করিয়া পিছন দিকে লাফাইয়া পড়ে এবং অনেক নীচে গিয়া পড়িয়া ডাকিতে ডাকিতে পলাইয়া যায়। বর্ণনার সময় কামাখ্যার সাথী অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বাবাজীর সাক্ষাতে এই সব বলিয়াছিলেন। বাঘ যে বাবাকে দেখিয়া, বাবার খরদৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া, পলাইয়াছিল, সকলেই নানা রকমে বলিলেন। মহারাজের 'গোলাপ-বাগে' স্পষ্ট ভাবে সকলে দেখিয়াছি এবং প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঘ মহাপুরুষদের দৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। এই জন্যে বলে, বাঘ সন্ন্যাসী-যোগী-ঋষিদের হিংসা করে না, তাঁহাদের কাছে কুকুরের মত বেড়ায়। বাবাজীর এক গুরু-ভাইএর সুন্দরবনের দুইটি বড় বড় বাঘ আছে, তাহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়, লোকালয়ে গেলে দুইটিকে সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এ সব বাগবাজারের গল্প মনে

করিবেন না। এই সব মহাপুরুষদের কিছুই অসম্ভব নহে। ইহারা যে কত বড় দৈবশক্তি-সম্পন্ন, তাহা কেহ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিবেন না। যখন আমি এই সব দেখি নাই, তখন এ সব বাগবাজারের গল্প বলিয়া মনে করিতাম। ভোজবাজির দ্বারা যে-সব জিনিষ আসে বা হয়, তাহার স্থিতি নাই, সে-সব দৃষ্টিভ্রম-জনিত। কিন্তু যাহা লিখিলাম প্রায় সমস্ত বিষয় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, প্রায় সমস্তই আমার নিজের জ্ঞানের কথা।

বাবাজী যে কি জিনিষ, তাহা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিবেন না। একবার বাবাকে দেখিলে চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না। একবার কাছে গেলে মনে হয়, আবার যাই, আবার যাই। বাবা যেন জাতুকর, কাছে গেলে মনঃপ্রাণ যাহা কিছু আমার বলিতে আছে, সব কাড়িয়া লয়েন।

তাঁহার আহার অতি অল্প। তাঁহার দাদাগুরুদেব যখন যেরূপ আদেশ করেন, তাঁহাকে তখন সেইরূপ আহার করিতে হয়, স্নান করিতে হয়, জল পান করিতে হয়। তিনি কয়েক বৎসর একেবারে জল পান করেন নাই। দারুণ গ্রীষ্মে ও চৈত্র-বৈশাখ মাসেও জল পান করেন নাই। তিনি মাথা নাড়িলে, তাঁর কপালে হাত দিয়া থাকিলে, মাথার ভিতর অন্য জিনিষ আছে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বাহিরে উপর

উপর দেখিলে মনে হইবে তিনি একজন নিরীহ ভদ্র বাবুলোক। একদিকে বাবাজী অতি কোমল—অতি মিষ্ট, অপর দিকে বড় কঠোর-স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

বিনোদ মাকড়ের বি, এ পাশ হইয়া খেয়াল হইল যে, হিন্দুধর্ম্মে কিছু নাই—তিনি খৃষ্টান হইবেন। খৃষ্টান হইবার সব ঠিক। কি একটা কার্য্যে তিনি গুরুদেবের কাছে আসেন। বাবাজী তাঁহাকে বলিলেন, "বাপু, তুমি কর্ম্মী দেখ নাই; হিন্দুধর্ম্মের কি বা জান। এমন ধর্ম্ম কি আর আছে? তোমাকে সব দেখাইব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মতের পরিবর্ত্তন হইবে।" তিনি বলিলেন, "যদি কিছু প্রত্যক্ষ দেখান, আমি মাথা মুড়াইয়া আপনার কাছে দীক্ষা লইব।" ঠিক হইল, পরদিন প্রাতে বিনোদবাবু স্নান করিয়া পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া বণ্ডুলের শিবমন্দিরের রোয়াকে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তার পরে গুরুদেব বিনোদ বাবুকে লইয়া মন্দিরে ঢুকিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বিনোদ বাবু চীৎকার করিতে করিতে মন্দিরের খিল খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "হিন্দু-ধর্ম্মে সব আছে, এতদিন লোক দেখি নাই, আমি এ ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারি না।" বিনোদ বাবু বলিলেন, "বাবাজী আসনে বসিয়া ক্ষণিক ধ্যান করিলেন। তার পরে বাবাজীর গলা হইতে মস্তক ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া গেল, আসনে পা এবং কোমর পর্য্যন্ত রহিল এবং মধ্যে ধড়টা শূন্যে রহিল, পরে মস্তক এবং ধড় নামিয়া পায়ের সহিত এক হইয়া কূর্ম্মের

মত হইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই অবস্থায় আমি ভয়বশতঃ চীৎকার করিয়া বাহির হইয়া পড়ি।” এই ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই তিনি দীক্ষা লইলেন। এখনও তিনি জীবিত আছেন।

বণ্ডুলের মহাদেব এক অপূর্ব্ব জিনিষ! কত রকম রং পরিবর্ত্তন হয়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, সময় সময় দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রকট হয়। আমি নিজে তিন চারিবার বণ্ডুলে গিয়াছি। একবার পূজার ছুটিতে গিয়া আট দশ দিন ছিলাম। যে কয়দিন আমি তথায় ছিলাম, সেই কয়দিনই গুরুদেবের দয়ায় বেশ মনের আনন্দে ও শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলাম। তখন আমার মন কি এক ভক্তি-রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা অর্ব্বাচীনতা ও ধৃষ্টতা মাত্র। মূকব্যক্তি যেমন প্রকৃতির শোভা নয়নে দেখিয়া তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতে ও বুঝাইতে অক্ষম, আমি তদ্রূপ শ্রীগুরুর চরণ-শোভায় আপনা-আপনি মুগ্ধ হইয়া নিজে অনুভব ছাড়া তাহা অপরকে প্রকাশ করিয়া বলিতে অপারগ। উপরি-উক্ত ঐ ভদ্র ব্যক্তি যে অনায়াসে ভক্তি-রসাস্বাদনে বিগলিত হইয়াছেন, তাহা সকলে অবশ্য অতি সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি এখন অলৌকিক ভক্তিরসে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া, বাবার শ্রীচরণে একান্ত মনঃসংযোগে কৃতাঞ্জলিপুটে আপন প্রগাঢ় ভক্তি

নিবেদনে পরমানন্দে এই সংসার-মরুভূমিতে বিচরণ করিতেছেন।

একদিন প্রাতে আশ্রমে না গিয়া বাড়ীতে বৈঠকখানায় বসিয়া কাজ করিতেছিলাম। গুরুদেবের ছবি হইতে হঠাৎ তাঁহার অঙ্গগন্ধ বাহির হইতে লাগিল। ছেলেরা সকলে চেঁচাইয়া উঠিল, "বাবা, গুরুদেব আসিয়াছেন। না হয়, রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন।" আমার পুরাতন চাকর দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল—বাবাজী যাইতেছেন কি না দেখিবার জন্য। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ছবি হইতে গন্ধ বাহির হইতেছে। তৎক্ষণাৎ আমি আশ্রমে গিয়া বাবাকে দেখি এবং জিজ্ঞাসা করি, কি হইতেছিল। বাবাজী উত্তর করিলেন, "কি করিতেছিলে, তাই দেখিতেছিলাম।"

গুষ্করায় বাবাজীর তুইটি বড় বড় বিষধর সর্প ছিল। অনেকে সেই পোষা সাপ তুইটিকে ঘরে বেড়াইতে দেখিয়াছে, ঘরে তুধ ও কলা খাইতে দেখিয়াছে। এক সময়ে ঘরে অপর সাপ ঢুকিয়াছিল, বাবা মশারি খাটাইবার সময়ে তাঁহার পেটে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। পরে তিনি দেখিলেন যে, সাপটি কামড়াইয়া মরিয়া আছে, তাঁহার কিছুই হয় নাই, কেবল একটু নেশার মত হইয়াছিল। বাবাজীর তীব্র ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা ছিল। গুষ্করায় বহু দিন যাবৎ অনেক লীলা দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় এক দিন ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, এক ভদ্রলোক ধমক দিয়া বলিল, "অত বড়

বলিষ্ঠ দেহ, তুমি কোদাল পাড়িয়া খাইতে পার না ?” বাবা ইহা মস্তক পাতিয়া লইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া চলিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় রাগ করিতে নাই, তাহার উপর স্বভাবতঃ বাবাজীর রাগ নাই। এখন যদি সেই ভদ্রলোক বাবাজীকে দেখেন, তাঁহার যে কি অবস্থা হয়, তাহা দেখিতে ইচ্ছা করে। বাবাজীর কাছে শিব, বিষ্ণু ও শক্তিতে প্রভেদ নাই। তিনি ক্ষেত্র দেখিয়া বিচার করিয়া দীক্ষা দেন। তিনি যুগল মন্ত্র, শক্তি মন্ত্র, শিব মন্ত্র প্রভৃতি সবই দেন। তাঁহার আশ্রমে মহাদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কালী, গোপালজী সবই আছেন। বাবাজীর পুত্র দুর্গাদাদা একজন কর্ম্মী হইয়াছেন, বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, সব সময় যোগ-মার্গে বেড়ান, যোগ আলোচনা লইয়া আছেন। আমার বোধ হয় গুরুদেবের আসন তিনি বজায় রাখিতে পারিবেন।

আমার বর্দ্ধমানে এক-সঙ্গে সাড়ে পাঁচ বৎসর থাকার পর যেমন বদলীর কথা হইল, বাবাজীকে বলাতে তিনি দরখাস্ত দিতে বলিলেন। ছয় মাস ফুরাইবার পূর্ব্বে আবার থাকিবার জন্য দরখাস্ত দিলাম। তাহাতে হুকুম হইল, আর কিছু দিন থাকিতে পাইব, কিন্তু আর আমাকে ঐ স্থানে রাখা হইবে না। মুন্সেফ ও ডেপুটি বাবুরা তিন বৎসরের বেশী এক সঙ্গে এক স্থানে থাকিতে পায় না। আমার উপর হুকুম আসিল, “প্রস্তুত হও, শীঘ্র বদলী হইবে।” গুজব উঠিল, আমায় বদলী করিয়াছে। বাবাজীকে

বলিলাম। তিনি বলিলেন, "তোমার জন্য উপরওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" কয়েকদিন পরে বলিলেন, "দে রে দরখাস্ত, দেখি কার সাধ্য তোকে এখান হইতে নড়ায়।" দরখাস্তের জন্য একটি তারিখ বলিয়া দিলেন, আমি দরখাস্ত লিখিয়া বাবার পায়ে ঠেকাইয়া দিলাম। তাহার পর হুকুম হইল, "উহার বদ্‌লী রদ হইল, যে পর্য্যন্ত উহার স্ত্রী ভাল না হয় অথবা সে সবজজ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার বদ্‌লী হইবে না।" সেই অনুযায়ী সবজজ হওয়া পর্য্যন্ত আমি বর্দ্ধমানেই ছিলাম।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য

উকীল, বৰ্দ্ধমান।

১। শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ বাবু প্রভৃতি প্রায় ২০৷২২ জন গুরুভ্রাতার সহিত আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আশ্বিন মাসে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনে যাই। সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনের পর প্রত্যাগমন পথে মাতুরা, চিদম্বরম্, শ্রীরঙ্গম, ট্রিচিনাপলি প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া চিঙ্গলপুট ষ্টেশনে আসি এবং তথা হইতে পক্ষিতীর্থ দর্শনে যাওয়া হয়। পক্ষিতীর্থ দর্শন করিয়া পুনরায় চিঙ্গলপুটে ফেরত আসার পরেই শ্রীশ্রীগুরুদেব কাঞ্চীতীর্থে তখনি যাইতে হইবে বলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিকালের ট্রেণেই আমরা কাঞ্চী যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮টার সময় কাঞ্চীতে পহুঁছি এবং পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট একটি স্থানে উঠি। সেখানে জলের কল ছিল, কিন্তু সে সময় কলে আদৌ জল ছিল না এবং থাকিবার নিয়মও নহে, নিকটে কোন কূপ বা জলাশয় ছিল না। আমরা চাকর বামুনসহ প্রায় ২৪৷২৫ জন ছিলাম। সকলেরই মুখ-হাত ধুইতে এবং খাবার প্রস্তুত জন্য ও পানের জন্য জল দরকার হওয়ায়, জলের অভাবের বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করিলে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিলেন,

"দেখ, কলে জল আসিয়াছে। এক ঘণ্টাকাল জল পাইবে।" দেখি, সত্যই কলে জল আসিয়াছে এবং আমরা ইচ্ছামত এক ঘণ্টাকাল সেই জল ব্যবহার করি। সেই সময় ঐরূপ ভাবে জল না পাইলে আমাদের সকলের বিশেষ কষ্ট হইত।

২। আজ ১৮৷১৯ বৎসর হইল, যখন বর্দ্ধমান আশ্রমের বাড়ী প্রস্তুত হইতেছিল কিন্তু শেষ হয় নাই, সেই সময় বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জ বাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পূজ্যপাদ গুরুদেব সময়ে সময়ে থাকিতেন। সেই সময় বর্দ্ধমানে শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় মুন্সেফ ছিলেন,—তিনিও বাবার শিষ্য হইয়াছেন। ঐ বাড়ীতে গরমের সময় একদিন নরেন্দ্র বাবু বাবার পদ-সেবা করিতেছিলেন এবং আমি ও আরও কয়েকজন শিষ্য নিকটে বসিয়াছিলাম। সেই সময় নরেন বাবু বাবার পায়ের তলায় যখন হাত দিয়া রগ্‌ড়াইতেছেন, তখন দেখা গেল, পায়ের তলায় বিদ্যুৎ বাহির হইতেছে। তাহা দেখিয়া আমরা সকলেই বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম।

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দে

কোর্ট ডি, এস, পি, আলীপুর, ২৪ পরগণা।

বৰ্দ্ধমানে রাণীগঞ্জ বাজারের নিকট মিউনিসিপ্যাল স্কুলের পিছনে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তখন আমাদের আশ্রম ছিল। সেই সময় আমি বৰ্দ্ধমানে কোর্ট-ইনস্পেক্টর ছিলাম ও রাণীগঞ্জে একটি বাসায় থাকিতাম এবং প্রত্যহ দুইবেলা আশ্রমে গিয়া পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ-দর্শন-সুখ লাভ করিতাম। আমার স্ত্রী, ছোট ছেলে অমূল্য ও মেয়ে বিমলাও প্রায় প্রত্যহই আশ্রমে আসিয়া গুরুদেবকে দর্শন করিত।

সেই সময় বাবাজীর দেহ হইতে সৰ্ব্বদাই নানাবিধ স্বর্গীয় সুগন্ধ বাহির হইত। সেই গন্ধের মধ্যে খস ও চন্দনের গন্ধই প্রধান। তখন গুরুদেব চাহিবামাত্রই আমাদের সকলকেই আমাদের ইচ্ছানুসারে গন্ধ দিতেন। হাত বাড়াইলেই হাতের উপর নিজ অঙ্গুলি স্পর্শ করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে সেই গন্ধযুক্ত তরল পদার্থে হাত ভিজিয়া উঠিত। সেই গন্ধ বহুক্ষণ স্থায়ী হইত।

আমার ছেলে-মেয়ে বাবাজীর নিকট আব্দার করিয়া

সিল্কের রুমালে গন্ধ চাহিলেই বাবাজী সেই রুমাল মুঠার মধ্যে ধরিবামাত্র সমস্ত রুমাল সুগন্ধ আতরে ভরিয়া উঠিত। সেই গন্ধ বহুকাল স্থায়ী হইত।

বাবাজী আমার ছেলে ও মেয়েকে বড় আদর করিতেন। তাহারা বাবাজীর পাকা চুল ও দাড়ী তুলিয়া দেওয়ার অছিলায় রসগোল্লার আব্দার প্রায়ই করিত। আশ্চর্য্য, প্রত্যেকটি পাকা চুল বাছিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেদের হাতে রসগোল্লা আসিয়া পড়িত। ছেলেদের আনা সেই রসগোল্লা আমিও খাইয়াছি।

একদিন বৈকালে আমরা অনেকগুলি গুরু-ভাই বাবাজীর কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় বাবাজী বলিলেন, "এই যে রেলগাড়ী যাচ্চে, এতে একটি বাবু বড় সুন্দর এক কাঁদি পাকা মর্ত্তমান কলা লইয়া যাইতেছেন। এরূপ সুন্দর বড় কলা সচরাচর দেখা যায় না।" একথা শুনিয়াই আমরা আব্দার জুড়িয়া দিলাম, "বাবা, আমাদের ঐ কলা খাওয়াইতে হইবে।" বাবাজী বলিয়া উঠিলেন, "বাপু, বাবুটি অনেক কষ্ট করিয়া ছেলেদের জন্য ঐ কলা লইয়া যাইতেছেন, উহা লওয়া ঠিক নয়।" আমরাও নাছোড়বান্দা। তখন বাবাজী শূন্যে একবার হাত উঠাইয়া মুঠি ধরিলেন ও হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "সুন্দর কলা।" মুঠির বাহিরে একটি কলার কতক অংশ দেখা গেল। প্রত্যেকের কাছেই বাবাজী হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং প্রত্যেকেই বাবার হাত হইতে বড় বড় এক এক

খণ্ড কলা লইলেন। লইয়া ভাঙ্গিয়া খাইয়া দেখিলাম, অতি সুন্দর ও সুমিষ্ট কলা। এইরূপে প্রায় ১৫।২০ জনে সেই কলা লইয়া খাইলাম, কিন্তু সে হাতের কলা আর ফুরায় না। তাহার পর বাবাজী উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন। সেখানে মেয়েরা বাবাজীকে কলা খাওয়াইবার জন্য ধরিল। সেখানে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েও ছিল। তাহাদের সকলকেই বাবাজী এক একটি আস্ত কলা শূন্য হইতে ধরিয়া দিলেন। সেই কলার দুইটি বাসায় আনায় আমিও আবার কিছু খাইয়াছিলাম।

আর একদিন ছুটির দিনে আমরা বাবাজীর কাছে বসিয়া আছি। দুপুর বেলা বাবাজী তক্তাপোষের উপর শুইয়াছিলেন —দেখিলাম, ঘুমাইতেছেন। আমরা নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করিতেছিলাম। ঘরের মধ্যে আমরা প্রায় ২৫।৩০ জন গুরু-ভাই উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ দেখি, ঘরের মধ্যে আঙ্গুর বৃষ্টি হইতে লাগিল। আঙ্গুর বেশ বড় বড়, সুপক্ক ও সুমিষ্ট, চারিদিকে থোলো থোলো পড়িতে লাগিল। আমরা যে যত পারিলাম, কুড়াইয়া খাইলাম। কাড়া-কাড়িতে অনেকগুলি চট্‌কাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী তক্তাপোষের উপর পাশ ফিরিলেন। তক্তাপোষের উপর অনেক আঙ্গুর পড়িয়াছিল, সেগুলিতে আমরা হাত দিতে সাহস পাই নাই। বাবাজী পাশ ফেরায় অনেকগুলি চট্‌কাইয়া গেল। বাবাজী জাগিয়া উঠিয়া বলিয়া ফেলিলেন, “তাইতো এখানেও আঙ্গুরের ছড়াছড়ি দেখ্‌ছি।” আমরা

বাবাজীকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন বাবাজী বলিলেন, "বাপু, স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম যে লক্ষ্মী-নারায়ণজীকে আঙ্গুর খাওয়াচ্ছিলাম। তাঁহারা আঙ্গুর সেবায় বড়ই পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। দেখ্‌ছি এখানেও আঙ্গুর বৃষ্টি হয়েছে।" তখন আমরা বলিলাম, "লক্ষ্মীনারায়ণজী যত না খান, আমরা সকলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইয়াছি।"

একদিন আমার স্ত্রী আশ্রমে আসিয়া দেখেন, বাবাজী ঘরের ভিতর হইতে বাহির হন নাই। ঘরের দরজা ঠেলিয়া দেখেন, দরজা ভেজান। দরজা ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখেন, কোথাও বাবাজী নাই—তক্তাপোষের উপর চাদর-ঢাকা একটি শিশু শুইয়া আছে। ইহা দেখিয়া ভয় পাইয়া আমার স্ত্রী বাহির হইয়া আসিয়া চন্দ্র-দা প্রভৃতি দাদাদের ডাকিয়া বলেন। বাবাজী তাহার কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া আমার স্ত্রীকে ডাকিয়া হাস্যমুখে তিরস্কার করেন।

একদিন রাত্রে বাবাজী সেবা করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাবা, আজকের ঘী-টা বড় খারাপ, এটা তুলিয়া ফেলা দরকার; নচেৎ অম্বল হইতে পারে।" এই বলিয়া একটি বাটি আনিতে বলিলেন। বাটি আসিলে যেটুকু ঘী উদরস্থ করিয়াছিলেন, সেইটুকু মাত্র মুখ দিয়া বাহির করিয়া বাটিতে ফেলিলেন। বাবাজী সেদিন রাত্রে কয়েকখানা লুচী, কিছু তরকারি ও অল্প দুধ খাইয়াছিলেন। বাহির করিলেন শুধু ঘীটুকু, আর কিছুই নয়।

বাবাজী সন্ধ্যা করিয়া সকাল ৭ টা, ৭॥ টার সময় ঘর হইতে বাহির হইতেন। আমরা বাহিরে বারান্দায় অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম। বাহির হইলেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পরে কাছে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতাম। একদিন এইরূপ প্রণাম করিয়া যেমন উঠিয়াছি, অমনি বাবাজী আমায় বলিলেন, "প্রিয়, এবার আইন (বি, এল,) পরীক্ষাটা দাও না। তবে দেখো, পরীক্ষায় পাশ হবে বটে, কিন্তু চাকরিটা ছেড়ো না।" আমিও বলিয়া ফেলিলাম, "আচ্ছা, এবার বি, এল, পরীক্ষাটা দেব।" বহুদিন পূর্ব্বে যখন আমি হুগলী কলেজে পড়িতাম, তখন আমার বি, এল, ক্লাশের লেক্‌চার (বক্তৃতা) শুনা শেষ করা ছিল। এ সময় আমি বর্দ্ধমানের কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টর ছিলাম। খাটুনি খুব বেশী ছিল। বাবার আদেশে কয়েকখানা বইয়ের জোগাড় দেখিতে লাগিলাম। টাকা জমার দিন আসিয়া পড়ায় পোষ্ট অফিস হইতে টাকা বাহির করিয়া টাকা জমা দিলাম। একটি উকিল বন্ধু কয়েক দিন পরেই ৪।৫ খানা আইনের বই পড়িতে দিলেন। পরীক্ষার আর বেশী দিন নাই দেখিয়া কয়েক দিনের ছুটি লইয়া পড়া সুরু করিয়া দিলাম। ৫।৭ দিন একটু চাপিয়া পড়ার পর মাথার অসুখ হইল, স্মরণশক্তিও লোপ পাইল, ঘুম হয় না। এরূপ অবস্থায় একদিন বাহিরের ঘরে বসিয়া বৃথা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় উপেন-দা (উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী) আসিয়া বলিলেন, "কি করছিস্, বই-পত্র ফেলিয়া

দে।” এই বলিয়া বই ও কাগজগুলি জড় করিয়া বাঁধিয়া যাহার জিনিষ তাহাকে ফেরত পাঠাইলেন। তখন পরীক্ষার ৫।৭ দিন মাত্র বাকী। পরীক্ষার তুদিন আগে গুস্করায় বাবাজীর নিকট গেলাম। (তখন কয়েক দিনের জন্য তিনি গুস্করায় ছিলেন) তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, পরীক্ষা দিতে কলিকাতা যাইব কি না। তিনি বলিলেন, “যাও, পরীক্ষায় পাশ হইবার ভাবনা কি?”

তুদিন পরে কলিকাতায় এক গুরু-ভাইয়ের বাড়ীতে থাকিয়া পরীক্ষা দিতে লাগিলাম। পরীক্ষা-মন্দিরে প্রত্যেক দিন সকাল ও বিকালের প্রশ্ন-পত্রে দেখি, সব প্রশ্নগুলিই আমার অজানা। কাজেই, প্রশ্ন বাছিয়া লিখিবার আমার কোন আবশ্যকতা হয় নাই। আমি প্রত্যেক দিন প্রত্যেক বেলায় প্রশ্ন-পত্রের প্রশ্নের ক্রমাবলি ধরিয়া সকল প্রশ্নগুলির উত্তর সাধারণ বুদ্ধিতে যতদূর জোগায়, গড়িয়া লিখিয়া দিলাম। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে ২।৪ পাতা লিখিয়া গেলাম। কি লিখিলাম, তাহা আজ পর্য্যন্ত জানি না। আমি পরীক্ষা-মন্দিরে পরীক্ষা দিতেছি, আর এদিকে বাবাজী আমার গুরু-ভাইদের নিকট বলিতেন, “প্রিয় পরীক্ষায় ভালই লিখ্‌চে!” এইরূপে পরীক্ষা দেওয়ার পর যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তখন দেখা গেল, সে বৎসর যতগুলি ছেলে বি, এল, পরীক্ষায় পাশ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আমিও একজনা ও আমার নাম পাঁচজনার নীচে ও অনেক জনার উপরে। বাবাজী

পরীক্ষার ফল দেখিয়া আবার বলিলেন, "প্রিয়, পাশ হলে, কিন্তু চাকরি ছেড়ো না।"

ইনস্পেক্টর জেনারেল (পুলিসের) সাহেব বৰ্দ্ধমান সদর কোর্ট অফিসের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া গেলেন, "প্রিয়বাবু বহুদিন কোর্টে আছে। উহাকে এইবার সারকেলের কাজে দেওয়া হোক।" তার পরেই পুলিস সাহেব আমায় কোর্ট হইতে সরাইয়া সদর সারকেল ইন্‌স্পেক্টর করিয়া দিলেন। সারকেল ইন্‌স্পেক্টর হইয়াই প্রথম যেদিন এলাকায় ঘুরিতে বাহির হইলাম, সেই দিনই সে বৎসরের বর্ষার প্রথম বৃষ্টি-ধারা নামিল। সেই দিন ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সুধু পায়ে জল-কাদার মধ্য দিয়া গলসী থানার এলাকায় দামোদর নদের তটস্থ কয়েকখানি গ্রামে যাইতেছি— পথে রাত্রি হইল। রাত্রে অন্ধকারে মাঠের উপর আইল পথ ধরিয়া যাইতেছি। সঙ্গে ৫।৭ জন লোক—২টা হ্যারিকেন আলোও আছে। সঙ্গে দুই জন আলো লইয়া যাইতেছে। তাহারা একটা সরু জোল পার হইয়া গেল। পশ্চাৎ আমি যেমন উহা পার হইবার জন্য একটা পা মাটীতে পাতিয়াছি, অমনি মনে হইল যেন একটা মোটা সাপের পেটে পা দিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ফোঁস শব্দে ছোবল পড়িল—ছোবল আমার পা ডিঙ্গাইয়া মাটীতে পড়িল। তখনই লাফ দিয়া পা সরাইয়া লইলাম। তখন হ্যারিকেনের আলো পড়ায় দেখিলাম, একটা বৃহৎ কৃষ্ণ গোখুরা সাপ

লাফাইয়া পার্শ্বের জলাশয়ে পড়িল। সঙ্গের লোক সকল ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ খুব বাঁচিয়া গিয়াছেন।" এইরূপে দিনরাত জল-কাদায় বৃষ্টির মধ্যে কাটিয়া গেল। পর দিনও ঐরূপে গেল। সন্ধ্যার আগে যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় ব্যথা ও নাক-মুখ দিয়া অনবরত কাঁচা সর্দ্দি ঝরিতেছে—চলৎশক্তি প্রায় রহিত। এমত অবস্থায় বাবাজীকে প্রণাম করিবার জন্য আশ্রমে গেলাম। বাসায় বলিয়া গেলাম—কিছুই খাইব না, রাঁধবার দরকার নাই। তখন রেলষ্টেশনের নিকট বিশুদ্ধাশ্রম বলিয়া নূতন আশ্রম হইয়াছে। বাবাজীকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। তখন বাবাজীর সন্ধ্যার জন্য উঠিবার প্রায় সময় হইয়াছে। আমি বসিলে বাবাজী বলিয়া উঠিলেন, "কিগো, সর্দ্দিটা খুবই হয়েচে—সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছিলে, কামড়ায়নি তো ? কামড়ালে আমাকেই বেগ পেতে হ'তো। অনেক দিন কোর্টের চাকরি ব'সে ব'সে করে শরীরটা খুবই অপটু হয়েছিল—কয়েক দিন বাহিরে ঘুরে ফিরে একটু শক্ত হোক"। এই বলিয়া উঠিয়া একবার উপরে গিয়া তখনই আবার নামিয়া আসিলেন। আমার দিকে চাহিয়া তখন বলিলেন, "কি গো, সর্দ্দিটা একটু কমেছে ?" শরীরের ব্যথা ও সর্দ্দি তখন একেবারে দূর হইয়াছে। শরীরে দ্বিগুণ বল পাইয়াছি। বাবাজীকে তাহা জানাইলাম। তখন "উঠি গো" বলিয়া উপরে গেলেন। বাসায় আসিয়া তখনই

আমার স্ত্রীকে কিছু খাবার করিতে বলিলাম। সন্ধ্যা করিয়াই অন্য দিন যাহা খাই, তাহার দ্বিগুণ খাইলাম। পরদিন ভোরেই আবার জল-বৃষ্টির মধ্যে কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে যাইতে হইল। এইরূপ জল-কাদা ও বৃষ্টির মধ্যে দিনকয়েক কাটিল। সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পরিণামে ১০।১২ দিন পরেই বর্দ্ধমান-বাঁকুড়ার দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভীষণ বন্যা হইল। সেই বন্যার শেষেই আমার বর্দ্ধমানের সারকেল ইন্‌স্পেক্টরি করা ঘুচিল। আমি সারদা পুলিসট্রেণিং কলেজে শিক্ষকের পদে বদলি হইলাম।

যখন আমি বসিরহাট-বারাসতের ডি-এস-পি, তখন একদিন সন্ধ্যার আগে আমি ও বসিরহাটের ইন্‌স্পেক্টর সাইকেল চড়িয়া স্বরূপনগর থানা হইতে বসিরহাটে ফিরিতেছি। মাঠের মধ্যদিয়া কাঁচা রাস্তা; দুইধারে গভীর খানা। পথের ধারে গরু বাঁধা চরিতেছে। এরূপ অনেক গরুর দড়ির উপর দিয়া সাইকেল চালাইয়া আসিয়াছি। একটা গরু পথের একধারে চরিতেছিল, তাহার খোঁটা অপর ধারে। রাস্তার উপর দড়ি পড়িয়া আছে। যেমন উহার উপর দিয়া সাইকেল লইয়া যাইব, অমনি গরুটা লাফ দিয়া অপর পারে দৌড়িল। অমনি সাইকেল সমেত আমি বামদিকের দুমানুষ ভোর গর্ত্তে পড়িলাম। যখন শূন্যে পড়িতেছি তখন গুরু-পাদপদ্ম স্মরণ করিলাম। আশ্চর্য্য, সাইকেলটা পড়িয়া একটু বাঁকিয়া গেল মাত্র, কিন্তু আমায় যেন কেউ কোলে

করিয়া গর্ত্তের নীচে বসাইয়া দিল। শরীরের কোন স্থানে কোন চোট লাগিল না। সঙ্গী ইন্‌স্পেক্টর দৌড়িয়া গর্ত্তে নামিয়া আসিয়া ধরিয়া তুলিল। ভাবিল, আমার দফা রফা। কিন্তু যখন আমি সহজভাবে উঠিলাম ও কোন স্থানে গুরুতর জখম হয় নাই দেখিলেন, তখন তিনি অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। সাইকেলটা টানিয়া তুলিয়া একটু ঠুকিয়া সোজা করিয়া লইয়া আবার চড়িয়া বাসায় ফিরিলাম।

যখন আমি আলিপুর কোর্টের ডি-এস-পি, তখন একদিন সদর সবডিভিসনের ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে তাঁহার মোটর গাড়ীতে একটা মামলার জন্য মফঃস্বলে যাই। ফিরিবার সময় বাক্‌ড়ার হাট পার হইয়া পথের ধারে একটা পুলের থাম্বায় গাড়ী লাগিয়া সাম্‌নের একটা চাকা ফাটিয়া যায়। গাড়ী বেগে আসিতেছিল; সেই বেগে পুলের পরেই একটা বৃহৎ খানার গা দিয়া গিয়া একটা গভীর পুকুরের পাড়ের নীচ দিয়া উঠিয়া উপরে রাস্তায় গাড়ী থামিল। গাড়ীর কল খারাপ হইয়া গেল। আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অনেক লোক জড় হইল। দেখা গেল, গাড়ীর বাঁ দিকের চাকা পথের ধারের খানা ও পুকুরের ঢালু দিয়া গিয়াছে ও ডানদিকের চাকা ঐ ঢালুর উপরে পথের ধার দিয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রায় বিশ হাত গিয়াছে। যেরূপ কাত হইয়া গাড়ী গিয়াছে তাহাতে স্বভাবতঃ গাড়ী উল্টাইয়া পুকুরের নীচে জলের মধ্যে গিয়া আমাদের পুঁতিয়া রাখিবার

কথা। বেশ বুঝা গেল, গুরু-কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি। অলক্ষিতে তিনি গাড়ী টানিয়া ধরিয়া রাখিয়া উপরে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। নচেৎ রক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সকলেই এই অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল। গাড়ীর চালক অনেক টানাটানি করিয়া গাড়ী আর চালাইতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরেই সাম্‌নের দিকে দুইখানি ট্যাক্সি আসিয়া পড়িল। ঐ ট্যাক্সির লোকেরা তাহাদের যন্ত্র-পাতি দিয়া আমাদের গাড়ী অল্পক্ষণের মধ্যেই ঠিক করিয়া দিল। ঐ সময় বাবাজী কলিকাতায় ভবানীপুর আশ্রমে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়াই তথায় গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। বাবাজী বলিলেন, "কি গো, কোথা থেকে। পথে গাড়ীর কোন গোলযোগ হয়নি তো ?" আমি তখন বলিলাম, "বাবা, এই মৃত্যু-মুখ থেকে ফিরে আসছি।" বাবাজী তখন বলিলেন, "গাড়ী ওল্টাবার যো কিরে, বাপু।" তখন উপস্থিত গুরু-ভাই সকল জানিতে উৎসুক হওয়ায়, সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম।

বর্দ্ধমানে বাবাজী যখন পুরাতন আশ্রমে ছিলেন, সেই সময় একদিন আমার রাণীগঞ্জের বাসায় বসিয়া আমার ছোট ছেলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল ; বাবাজীর সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। আমার স্ত্রী পুত্রকে কথায় কথায় বলে, "কিরে, তুই সাহেব হবি, না যোগী হবি।" আমার ছেলে বলে, "আমি যোগী হব"। এই কথার কয়েক দিন পরে বাবাজী

একদিন আমাদের বাসায় আসেন। বাসায় প্রবেশ করিয়াই হাসিতে হাসিতে আমার ছেলেকে বলেন, "কিহে, তুমি যোগী হ'বে বলেছ, না? যোগী হওয়া বড় সোজা নয়।" পরে বাবাজী আমার স্ত্রীকে বলেন, "মিণ্টু ছেলে ভাল, বেশ লেখাপড়া শিখবে ও উন্নতি করবে।" আমার ছেলে (মিণ্টু) এখন ইন্‌কম্‌ট্যাক্স অফিসের একজন একজামিনার অব্‌ একাউণ্টস্‌।

এই সময় আমার স্ত্রী ও ছোট ভাই বাসায় নানারূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত ও মধ্যে মধ্যে বাবাজীকে ও গুরু-ভাইদের খাওয়াইতে ভালবাসিত। একদিন বাবাজীর জন্য সন্দেশ ও পান্তুয়া তৈয়ারি করিয়া ইচ্ছা করে, বাসায় বাবাজীকে আনিয়া খাওয়াইবে। আমায় বাবাজীকে বলিবার জন্য অনুরোধ করায়, আমি আশ্রমে যাই ও অনেকক্ষণ বসিয়া থাকি, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। মনে করিলাম, বাবাজী তো সবই জান্‌চেন—যে জন্য এসেছি তা আর কথায় বলার দরকার কি? অনেকক্ষণ বসার পর যখন বাবাজী আমাদের বাসায় আসিবার কোন ভাব দেখাইলেন না, তখন আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বাবাজী না আসায় আমি ও আমার স্ত্রী দুজনেই কিছু না খাইয়া বসিয়া থাকিলাম। বেলা প্রায় যায় যায়, আর আসার আশা নাই দেখিয়া, আমরা সদর দরজা বন্ধ করিয়া না খাইয়া শুইয়া পড়িব মনে করিতেছি, এমন

সময় সদর দরজা ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে "মিণ্টু, মিণ্টু" বলিয়া ডাক শুনিয়া আমার ছেলে দৌড়িয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাবাজী বাসায় ঢুকিয়াই হাসিতে হাসিতে আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "কিগো, কত সন্দেশ পান্তুয়া করেছ যে বাবা এলোনা—খেলোনা বলে এত বড় রাগ করে বসে আছ ? কই কি করেছ নিয়ে এস, বাপু" বলিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। আমার স্ত্রী ও আমি তখন আনন্দে গদগদ হইয়া পদধূলি লইয়া বাবাজীকে সন্দেশ পান্তুয়া খাইতে দিলাম।

বাবাজী তখন সন্দেশ পান্তুয়া দেখিয়া বলিলেন, "ওগো, এ যে দেখছি বেশ হয়েছে। বেশ, ঠাকুরের পূজা দিয়া আমিও খাইব ও ছেলেরাও খাইবে—আশ্রমে পাঠাইয়া দিও"। তখন আমরা বাবাজীর কথা-মত ঐ মিষ্টান্ন আশ্রমে লইয়া গেলাম। পূজা দেওয়া পর, বাবাজী খাইয়া ছেলেমেয়েদের সকলকে প্রসাদ দিলেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ দে

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ

পোঃ ও গ্রাম অণ্ডাল,

জেলা—বর্দ্ধমান।

১। আমি সন ১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে শ্রীশ্রী৺দুর্গা-পূজার পরই ত্রয়োদশীতে বহুপুণ্যফলে শ্রীশ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করি। সন ১৩১৬ সাল হইতে কয়লা কুঠীর ডাক্তারের কার্য্য করিতেছিলাম এবং ঐ সময়ের মধ্যে আমার যাবতীয় পান-দোষ, আচার-দোষ ও চরিত্র-দোষ ঘটে। বিশেষ অত্যাচারের ফলেই হউক, আর পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলেই হউক, সদ্‌গুরু লাভের জন্য ব্যাকুলতা জন্মে এবং কোন প্রকারে শ্রীশ্রীচরণে আশ্রয় পাই। দীক্ষা গ্রহণের কালে আমার মানসিক প্রার্থনা ছিল,—ঐ সমস্ত দোষ যাহাতে আর আমার নিকট স্থান না পায়। প্রার্থনানুয়ায়ী ফলও পাইয়াছিলাম, তবে তিনি কেমন ভাবে আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন বা আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহারই একটা বিবরণ লিখিতেছি।

১৩২০ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসে আমি আমার কোন গুরু-ভ্রাতার নিকট ঝরিয়ার অধীন বড়াগড় কয়লা কুঠীতে চাকরীর চেষ্টায় ছিলাম। একদিন বৈকালে উক্ত কুঠী হইতে

আমাদের গুরু-ভাই পূজনীয় শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপ্রসাদ রায়-চৌধুরীর নিকট সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলাম। মধ্যে একটা ডাঙ্গায় একটা দুষ্টা স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাহার অঙ্গভঙ্গী ও চালচলনে আমার কুসংস্কার জাগিয়া উঠিল এবং আমি সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার নাগাল পাইবার জন্য দ্রুত চলিতে লাগিলাম। সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে দ্রুত আসিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। তাহাকে ধরিতে আর বেশী দেরী নাই। মধ্যে মাত্র বিঘা কয়েক জায়গা—নীচের কয়লা কাটিয়া লওয়ায় বসিয়া গিয়াছে। সেইটি পার হইব, হঠাৎ সেখানে শ্রীশ্রী৺বাবার গায়ের সৌরভ পাইলাম। সৌরভ এত বেশী হইল যে, সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। মনে মনে সভয়ে প্রণাম করিলাম। গন্ধ প্রায় ১০।১৫ মিনিট অনুভব করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া শ্রীশ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ গন্ধ অন্তর্হিত হইল। আমি উঠিয়া পূজনীয় দক্ষিণা দাদার নিকট আসিলাম ও শ্রীশ্রীগুরুপদ স্মরণ করিতে করিতে ঝরিয়া থানায় উপস্থিত হইলাম। এই ভাবে কতবার—প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া বাবাজী আমার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তাহা আমি বেশ অনুভব করিয়াছি।

২। সন ১৩২২ সাল—আমি তখন ইছাপুরে থাকি। পূজ্যপাদ বাবাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু মাসাবধিকাল অপেক্ষা করিয়াও কোন উত্তর পাই নাই।

আরও কিছুদিন পরে একটা সাংসারিক চিন্তায় আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি। আহ্নিক করিবার সময়ে আসনে বসিয়া কেবল ঐ চিন্তা এবং তাহার নানাবিধ উপায় বিধান কল্পনা করি। মন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা নূতন করিয়া আরম্ভ করি। এইরূপে পুনর্ব্বার বিকল হই এবং বড় অশান্তিতে থাকি। চতুর্থ দিবসে একখানা অভয় লিপি পাইলাম—"বাবাজীবন, কোন বিষয়েই চিন্তা করিবে না। উপদেশ-মত কার্য্য ঠিকভাবে করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে চিন্তার কোন কারণই থাকিবে না।" পোষ্টকার্ডখানি পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। পত্রখানি মাথায় রাখিয়া কৃপার কথা ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম। তৎক্ষণাৎ চিন্তার কারণ দূর হইল। এইভাবে দয়া না করিলে, এমন পাষণ্ডকে এমন কৃপা না করিলে, কি করুণাময় বলে?

৩। কোন সময় (সন তারিখ দিলাম না, বেশ মনে আছে) আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ীতে চুরি হয়। আমি কোন কোন আত্মীয়কে সন্দেহ করি এবং পুলিশে সংবাদ দিই। বেশী টাকার তালিকার জন্য সেই আত্মীয়ের খানাতল্লাস করা হয়, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব এবং আমার মেজো মেয়েটির সমস্ত অলঙ্কার চুরি যায়। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রী৺বাবাকে পত্র লিখি—"আমাদের যাহা গিয়াছে, না গিয়াছে, তাহার জন্য বিশেষ দুঃখ করি না, কিন্তু মেজো মেয়েটির অলঙ্কার আমি জীবনে দিতে পারিব কি না

সন্দেহ এবং শ্রীশ্রীচরণ-কৃপায় দিতে পারিলেও চির কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে", ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে—কেবল পঁহুছিতে মাত্র দেরী—উত্তর পাই—"চিন্তার কারণ দেখি না", ইত্যাদি। নয় দিন পরে রাত্রে হঠাৎ সেই আত্মীয়ার পুত্রের হাতে কিসে কামড়াইল। হাতটা চড় চড় করিয়া ফুলিয়া উঠিল। ছেলে জ্বালায় অস্থির হইল, সে তার স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইল। স্বামী সেই সব দেখিয়া বলিল, "কি করলি, ছেলেটাকে ঘুচাতে বসেছিস। মুনীন্দ্রের গুরুদেব সাক্ষাৎ ঈশ্বর, শুনেছি আবার চিঠিও লিখেছেন, কোন চিন্তা নাই।" এই সব কথা-বার্ত্তা স্ত্রী-পুরুষে হইতেই স্ত্রী বলিয়া ফেলিল, "এই নাও, দিয়ে এসো। যেন আমার ছেলেটির কিছু না হয়, আর আমরা কোন বিপদে না পড়ি, এর জন্য বলো এবং স্বীকার কোরো!" কি আর বলিব! সেই অলঙ্কারের পোঁটলা আমার অন্য আত্মীয়কে দিয়ে এসে দেখে, ছেলের হাতের ফুলাও সারিয়াছে, জ্বালা-যন্ত্রণাও নাই—ছেলে বেশ হেসে-খেলে কথা কহিতেছে। স্ত্রী-পুরুষে শান্তি পাইল। আমিও আমার আত্মীয়ের নিকট সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলাম এবং মনে মনে শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম এবং তাঁর করুণার কথা স্মরণ করিয়া কি পর্য্যন্ত যে নিজেকে ধন্য মনে করিলাম তাহা আর কি বলিব। শ্রীশ্রীচরণ দর্শন জন্য ধানবাদে গেলাম। দেখেই বল্লেন, "কিরে বাপু, মেজো মেয়ের অলঙ্কার গুলি তো পেয়েছিস্?" বলেই হাসিতে লাগিলেন।

৪। বেশী দিনের কথা নয়, গত জ্যৈষ্ঠ মাসেই মনে হয়, সন্ধ্যায় ইছাপুর হইতে ফিরিতেছি; মধ্য রাস্তায় আরতি গ্রামের একটা পুকুরের মধ্য দিয়া রাস্তা। আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হইতেছে, তজ্জন্য তাড়াতাড়ি দ্রুত হাঁটিতেছিলাম। ঐ পুকুরের রাস্তায় একটা সাপ পড়িয়াছিল, তার উপর পা দিতেই সাপটা আমার গোড়ালীর উপর কামড়াইয়া দেয়, একটি দাঁত বেশ ঢোকে, একটি মাত্র দাগ পড়ে। অন্ধকারে সাপটা দেখিলাম না,—তাড়াতাড়ি হইয়াছিল, আহ্নিক হয় নাই। মনে করিলাম ঢোঁড়া বা মেটেলি। সঙ্গে ঔষধের বাক্‌স ছিল, নামাইতে বলিয়া তাহা হইতে আইয়োডিন বাহির করিয়া বেশ করিয়া লাগাইয়া লইয়া আবার রাস্তা চলিতে সুরু করিলাম। মুটেটা ইছাপুর ফিরিয়া রোজাদের নিকট যাইতে বলিতেছিল। না শোনায় চুপ রহিল ; কামড়ের জায়গায় প্রথমতঃ চিন চিন, পরে জ্বালা, বোধ হইতে লাগিল। বাড়ী পৌঁছিলাম ; মুটেটা আমার স্ত্রীকে সকল কথা বলিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে দুইজন রোজা আসিয়া উপস্থিত। তাদের ঝাড়তে ফুঁকতে দিলাম, কিন্তু তাদের ঔষধ খাইলাম না। আমার স্ত্রীর অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবার নিকট যে ঔষধ শেখা ছিল এবং যাহা বাড়ীতে তোলা ছিল, তাহা একমাত্রা খাইলাম এবং আহ্নিক করিতে বসিলাম। ইত্যবসরে রোজারা আহার ও নিদ্রা বন্ধ করিবার উপদেশ দিয়া গেল। আহ্নিক করিয়া উঠিয়া খাবার চাহিলাম। স্ত্রী রোজাদের উপদেশ

শুনাইয়া দিল। কোন প্রকারে বুঝাইয়া এবং অতিরিক্ত ক্ষুধা জানাইয়া স্বল্প খাবার ও দুগ্ধ পাইলাম। তামাক খাইতে নিষেধ ছিল, তাহাও মানিলাম না। নানা প্রকার কথায় আমারও মনে সঙ্কীর্ণতা আসিল। যেন জ্বালার বৃদ্ধি মনে হইতে লাগিল, কাজেই নিদ্রা যাইতেও ভয় হইতে লাগিল। তখনই সাহস হইল, কারণ শ্রীশ্রীবাবা কতবার বলিয়াছেন, দুই সন্ধ্যা আহ্নিকে অবহেলা না করিলে তাহার অপমান বা অপমৃত্যু হইতে পারে না। কিন্তু সঙ্কীর্ণতার জন্য দৃঢ় হইতে পারিলাম না। যাহা হউক, "নিদ্রা যাইব না, বিশ্রাম করিগে" বলিয়া বিছানায় যাইয়া শুইলাম। আমার স্ত্রী মধ্যে মধ্যে ডাক দিয়া জাগাইতেছিল। রাত্রি ১২৷৷০টার সময় একটু তন্দ্রা আসিয়াছে মনে হইল। উত্তর দিকের জানালা কে খুলিল। আলোটা হঠাৎ কমিয়া গেল, চোখ মেলিয়া চাহিলাম— অন্ধকার। হঠাৎ দেখি একটা জ্যোতিঃ, যেন ঘরে শতসহস্র সার্চ্চলাইট জ্বলিয়াছে; দেখিবামাত্র চোক বুজিলাম। আনন্দে ও ভয়ে, শ্রীশ্রীবাবাকে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। এমন আনন্দ অনুভব হইল যে তাহা আর প্রকাশ করিতে পারি না। আমার স্ত্রীও সেই শব্দ অনুভব করিয়া নীচে হইতে আমাকে ডাক দিয়া, "কিসের শব্দ" জিজ্ঞাসা করিয়া সাড়া পাইল। উঠিয়া দেখি, জানালাও বন্ধ, আলোও পূর্ব্ববৎ জ্বলিতেছে, কিন্তু ঘরে শ্রীশ্রীবাবার গায়ের সৌরভ বেশ রহিয়াছে। আমি স্ত্রীকে জাগাইলাম, অভয়দাতার অভয়

পাইয়া সকলে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেলাম। জ্বালা-যন্ত্রণা সব জুড়াইল।

৫। সরপী নিবাসী আমাদের গুরুভাই শ্রীযুক্ত দক্ষিণা-প্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার চোখের অসুখ। বাঁকুড়া ও বালেশ্বরের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও সিভিল সার্জ্জনের ব্যবস্থা-পত্রানুয়ায়ী ঔষধে কোন ফল না হওয়ায় শ্রীশ্রী৺বাবাকে তাঁহারা জানান। তিনি বলেন, "তোমাদের বাড়ীতে কে চিকিৎসা করে জান কি? সে ভাল চিকিৎসক। তাহাকে দেখাইয়া ঔষধ লইবে, তাহাতেই আরোগ্য হইবে।" আমাকে তাঁহারা ডাকিয়া পাঠান এবং সমস্ত কথা বলেন। আমি সেই কথা শুনিয়া ভাবিলাম, খেলোয়াড় ঠাকুরের নূতন খেলা। বুঝিলাল পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাইবেন। তখন সামান্যমাত্র ঔষধ দিলাম, ঠিক রোগানুযায়ী নহে। তবে সেই ঔষধেই ৩।৪ দিনের মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন বা আরোগ্য বোধ হইল। উচ্চ-শিক্ষিত চিকিৎসক দ্বারা অনেক দিন ধরিয়া চিকিৎসায় কোন ফল লাভ হয় নাই, অথচ আমার মত একজন সামান্য চিকিৎসকের ঔষধে শীঘ্রই রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। রোগিণী আমাদের গুরু-ভগিণী। গুরুদেব কত প্রকারে যে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাহা অন্যে কি জানিবে বা বুঝিবে? এমন বহু ঘটনা হইয়াছে—তার মধ্যে এই কয়টা সম্প্রতি দিলাম।

শ্রীমুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ

শ্রীযুক্তকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়

প্যারিচাঁদ মিত্র লেন, বর্দ্ধমান।

১। এক দিন বিশুদ্ধাশ্রমে দেখিলাম, বালক-বালিকাগণ আসিয়া বাবাজীকে "গোলাপ-জল দিন" বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। পরে বাবাজী বলিলেন—"আচ্ছা, জল নিয়ে এস।" তাহারা গ্লাসে করিয়া জল আনিয়া নিকটে ধরিল। বাবাজী ঐ জলে অঙ্গুলি ডুবাইয়া দিলেন, অমনি সেই জল উত্তম গোলাপ-গন্ধময় হইল। আমরা অনেকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এরূপ একবার নয়, অনেক-বার দেখিয়াছি।

২। একদিন বাবাজীর নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "গন্ধ কি যখন তখন আসিতে পারে?" বাবাজী বলিলেন, "দেখিবে? এই দেখ।" তখন তিনি দক্ষিণ হস্তের তালু দেখাইলেন। আমি ঐ হস্তের আঘ্রাণ লইয়া দেখিলাম, ঠিক পদ্ম ফুলের গন্ধ ছুটিতেছে। আবার তিনি বাম হস্তের তালু দেখাইলেন। উহাতেও ঐরূপ গন্ধ পাইলাম। পরে দক্ষিণ হস্তের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পরে তিনি দক্ষিণ পদের তালু ও বাম পদের তালু দেখাইলেন, তাহাতেও অতি মনোহর সুগন্ধ পাইয়া বিস্মিত হইলাম। তখনও আমার

মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু পুনরায় তিনি হস্ত-পদের ঘ্রাণ লইতে বলিলেন। তখন আমি ঘ্রাণ লইয়া দেখিলাম, সেই উৎকৃষ্ট গন্ধের লেশমাত্রও আর পাইলাম না। সেই গন্ধ কোথা হইতে আসিল ও কোথায় গেল ভাবিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। আর সন্দেহ রহিল না।

৩। কোন কোন সময় বাবাজী আমার হাতে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিয়া দিয়াছেন, কখন কখন বস্ত্রে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই হস্তে ও বস্ত্রে সুন্দর গোলাপ-গন্ধ, কখন কখন বা বেল ফুলের গন্ধ, কখন চম্পক-গন্ধ হইয়াছে। একবার নয়, এরূপ অনেক সময় দেখিয়াছি।

৪। বিশুদ্ধাশ্রমে যাইবার পথে একটা ফুলের গাছে শাদা থোপা থোপা ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া আমি এক থোপা ফুল তুলিয়া আনিয়া আশ্রমে গিয়া বসিলাম। বাবাজীকে দিলাম। বাবাজী বলিলেন, "ইহাতে কোন গন্ধ নাই।" আমরা অনেকে ফুল লইয়া শুঁকিয়া দেখিলাম, সে ফুলে কোনই গন্ধ নাই। পরে বাবাজী ফুলটি হাতে লইয়া পুনরায় আমাদিগকে দিলেন। তখন আমরা দেখিলাম, সেই ফুল উৎকৃষ্ট সুগন্ধময় হইয়াছে।

৫। একদিন বাবাজীর নিকটে অনেকে বসিয়া আছি, একটু দূরে একটি ঘড়ী রহিয়াছে। বাবাজী বলিলেন, "ঘড়ীতে কত বাজিয়াছে, দেখ।" আমরা দেখিলাম, পাঁচটা

কয়েক মিনিট হইয়াছে। বাবাজী বলিলেন, "ঐ ঘড়ী আর চলিবে না, এখনই বন্ধ হইবে।" কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা দেখিলাম, ঘড়ী চলিতেছে না, বন্ধ হইয়া আছে। তারপরে তিনি বলিলেন, "এখন দেখ দেখি ঘড়ী চলে কি না।" আমরা দেখিলাম, তখনই ঘড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

৬। একদিন আমরা আশ্রমের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছি, সকলেই দেখিলাম, একটা কাঠবিড়ালী আশ্রমের কার্ণিসের ধারে ধারে যাইতেছে। বাবাজী তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন, অমনি কাঠবিড়ালীটি স্থির হইল। একটু পরে দেখা গেল, কাঠবিড়ালীটি মরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি বাবাজীর তীব্র দৃষ্টিপাতে অনেক সময় সর্প স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পরে মরিয়া গিয়াছে।

৭। অনেকবার দেখিয়াছি, মাছি বাবাজীর গায়ে বসিয়াছে। আমি মাছি উড়াইতে গিয়া দেখি মাছিটা পড়িয়া গেল, সে মরিয়া গিয়াছে। আশ্রমের গাভী ও বৎসের নিকট বাবাজী দাঁড়াইয়া আছেন, আমরা নিকটে আছি, একটা বড় ডাঁশ মাছি বাবাজীর পৃষ্ঠে বসিয়া আছে, দেখিয়া আমরা বলিলাম, "একটা বড় ডাঁশ আপনার পৃষ্ঠে বসিয়াছে।" বাবাজী বলিলেন, "উহাকে আর তাড়াইতে হইবে না, ওখানেই উহার শেষ হইবে।" পরে আমরা দেখিলাম, ডাঁশমাছি আর উড়িল না, সেইখানেই মরিয়া পড়িয়া গেল।

৮। আমরা অনেক দেখিয়াছি, বাবাজী একটা বাটীতে

ঘৃত মাখাইয়া মুখ বাঁধিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিলেন। কয়েক ঘণ্টার পরে দেখা গেল, সেই বাটীর মধ্যে সন্দেশ প্রস্তুত হইয়া আছে। সকলেই তাহা মুখে দিয়া দেখিলাম, অতি সুমিষ্ট সুঘ্রাণযুক্ত সন্দেশ হইয়াছে।

৯। একটা রৌপ্য কৌটা বাবাজীর কাছে ছিল। আমরা দেখিলাম, তিনি সেই কৌটার উপরে বারে বারে অঙ্গুলি দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "এই দেখ।" বাবাজী কৌটার মাথায় অঙ্গুলি দিলেন এবং অঙ্গুলি উচ্চে তুলিলেন, কিন্তু কৌটা পড়িল না, অঙ্গুলিতে লাগিয়াই রহিল।

১০। একদিন প্রাতে আমি ও একটি উকিল বাবু বসিয়া আছি। বাবাজী বলিলেন, "একটা তামাসা দেখিবে?" আমরা বলিলাম, "হাঁ।" তিনি বলিলেন, "একটা কাগজে কিছু লেখ।" আমরা একটু কাগজ লইয়া যুক্তি করিয়া একখানি পত্র লিখিলাম। প্রথমেই 'My Dear' লেখা হইল। পরে তাহা একটি কালির দাগ দিয়া কাটা হইল। তৎপরে বাঙ্গলাতে পত্র লেখা হইল। দশ বার লাইন লিখিয়া উহা জড়াইয়া ভাঁজ করিয়া বাবাজীর হস্তে দেওয়া হইল। তিনি উহা কলিকার আগুনে নিক্ষেপ করিলেন। কাগজ পুড়িয়া গেল। পরে ৫ মিনিটকাল বাবাজী চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন,—"চিঠিখানিতে প্রথমেই 'My Dear' লিখিয়া আবার কাটিয়া দিয়াছ।" আমরা আশ্চর্য্যান্বিত

হইলাম। পরে তিনি সমস্ত পত্রখানির লেখা বলিতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম, যাহা লেখা হইয়াছিল, অবিকল তাহাই তিনি বলিয়াছেন।

১১। আমি একদিন একটু কাগজ হাতে করিয়া জড়াইতেছি। বাবাজী বলিলেন, "ওটা কি ?" আমি বলিলাম, "একটু ছেঁড়া কাগজ।" বাবাজী বলিলেন, "দেখি।" আমি দিলাম। কাগজটুকু লইয়া বাবাজী বলিলেন, "গাঁদা ফুল।" আমি বলিলাম, "সে কি ?" তিনি কাগজটুকু হাতে রগ্‌ড়াইয়া আমাকে বলিলেন, "দেখ দেখি কিসের গন্ধ ?" আমি শুকিয়া দেখি, ঠিক গাঁদা ফুলের গন্ধ সেই কাগজে মাখা। তখন বলিলাম, "এই ত গাঁদা ফুলের গন্ধ বাহির হইতেছে।" বাবাজী বলিলেন, "দেও।" কাগজটুকু তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি হাতের অঙ্গুলিতে রগ্‌ড়াইয়া আমার হাতে দিলেন, আমি দেখিলাম, কাগজ নাই। সেটা একটা গাঁদা ফুল হইয়াছে।

১২। আশ্রমে অনেকে বসিয়া আছি। জিলাপীর মত পেঁচ দেওয়া এক রকম মশার ঔষধ একজন আনিলেন। বাবাজীকে দেখিতে দেওয়া হইল। বাবাজী তাহার এক অংশ ভাঙ্গিয়া হাতে লইয়া অঙ্গুলিতে টিপিতে লাগিলেন। সেই পেঁচগুলি সরু সরু ছিল। বাবাজীর হস্তস্থিত সরু অংশ ক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত হইল। আমরা হাতে করিয়া দেখিলাম, সেই সরু অংশ চতুর্গুণ মোটা হইয়াছে। এক মিনিটের মধ্যে এত দূর মোটা কিরূপে হইল, ভাবিয়া

আমরা অবাক্ হইলাম। দেখিয়া দেখিয়া এই সব সম্বন্ধে আর আমার কোন সন্দেহ রহিল না। আমি বুঝিলাম, বাবাজীর অলৌকিক শক্তিতেই এসকল সম্ভব হয়। ভগবানের শক্তিতে কি না হইতে পারে! বাবাজী ভগবৎ-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।